চেনা জানার বাইরে নয়

চেনা জানার বাইরে নয়

দণ্ডী মুখোপাধ্যায়

দি নিউ বুক ষ্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
মহেন্দ্রনাথ পাল
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭

চার টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আমার কথা

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে গিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তারই কয়েকটিকে একসংগে জড়ো করেছি বইখানিতে। ফল কি দাঁড়িয়েছে ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয় বইখানি ভ্রমণকাহিনী হয়ে ওঠে নি। একে আবার ছোট গল্পের বইও বোধহয় বলা যায় না, ঠিক রম্য রচনার পর্যায়ভুক্তও কিনা তাও বলা শক্ত। সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় 'যা বল তাই বলো'।

বইখানির কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়—সবই বাস্তব। ঘটনাগুলোও বাস্তব —সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এমনকি যে সংলাপ সন্নিবিষ্ট করেছি তাও মোটামুটি বাস্তব—চরিত্র ও ঘটনার মত পুরোনো ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত করা। আপনার মনের মাধুরী কিছু কিছু মিশে গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায় কতটুকু তা ঠিক নিজেই জানি না।

আত্মতৃপ্তি ছাড়া বইখানা লেখার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। প্রকাশিত হওয়ার পর ক-জন পাঠকের হাতে পৌছুবে এবং তাঁরা কি পরিমাণ আনন্দ লাভ করবেন জানি না। তবুও আত্মতৃপ্তির দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে ছাপার ব্যবস্থা করতে পেরে আমি যে খুশি তা না বললেও চলে।

অবশ্য এই ব্যবস্থা করতে আমাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় নি। কোন প্রকাশকই নতুন লেখককে আমল দিতে চান না। একজনের সংগে অন্য সূত্রে পরিচয় ছিল। তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি হেসে বললেন, আপনি আবার এ-লাইনে কেন! যাক্ ছেপে দেব—তা কাগজের দামটা দেবেন ত?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছাপা হল, আর কাগজের দামও আমাকে দিতে হয় নি। এজন্য আমি প্রকাশক শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার পুরোনো ডায়েরীগুলোতে আরও অনেক চরিত্র ও ঘটনা ধরা আছে। যদি বইখানার ছাপার খরচও উঠে আসে তবে হয়ত এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পারি।

বইখানা লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দু-জনের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এঁরা হলেন আমার আত্মীয় শ্রীঅনাদিনাথ ভট্টাচার্য এবং আমার সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীকান্তিপ্রসাদ

চৌধুরী। আর যিনি 'পোকায় কাটবে' বলে আমায় নিরুৎসাহিত করেছিলেন তাঁর নামও উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি হলেন আমার সহধর্মিণী এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শিনী—শ্রীমতী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। ভদ্রমহিলার মুখের কথা বেদবাক্যের মত খাটে—অন্তত আমার ক্ষেত্রে। কিন্তু লোকে বলে যে দুঃস্বপ্নের মত অমংগলবাণীও প্রচার করলে তার দোষ কেটে যায়। তাই পরিচয়সহ তাঁর উক্তিরও উল্লেখ করলাম।

ডায়েরী থেকে হিন্দি সংলাপ উদ্ধৃতির কিছু কিছু দেখিয়ে নিয়েছিলাম শ্রীমোহনলাল সারাওগী ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। তবুও মনে হয় কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। তবে সে ত্রুটি ওঁদের নয়, আমার।

ইতি—

দণ্ডী মুখোপাধ্যায়

রাজদর্শন ১

দরজায় টোকার প্রত্যুত্তরে ভিতরে আসবার অনুমতি পেয়ে ঢুকল দৌবারিক। যথাযোগ্য অভিবাদন করে বলল, হেলিকপ্‌টার আ গিয়া।

তৈরি হয়েই ছিলাম, কিন্তু 'হেলিকপ্‌টার আ গিয়া' শুনে ঘাবড়ে গেলাম। হেলিকপ্‌টারে চড়ে রাজদর্শনে যেতে হবে নাকি? প্লেনে চাপার অভ্যাস থাকলেও হেলিকপ্‌টার এখনও চাপি নি। এই নতুন (অন্তত আমার কাছে) আকাশযান চাপতে কেমন, আর চালকই বা কি রকম কে জানে! তবে বলা ত যায় না যে এতে আমি যাব না, আমার জন্যে সেই পরিচিত চতুশ্চক্রযানই নিয়ে এস। আবার হাতে সময়ও বেশী নেই, মাত্র আধঘণ্টা পরেই রাজদর্শন—যাকে ওখানকার ইংরেজী-জানা লোকে বলে, audience with His Majesty.

মনের ভাব গোপন করে দৌবারিকের অনুবর্তী হলাম। অতিথিভবনের দ্বারে এসে চত্বরের চারদিকে দৃষ্টিপাত করলাম—কোথায় হেলিকপ্‌টার?—দেখতে পেলাম না। দেখলাম হেলিকপ্‌টারের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ল্যাণ্ড রোভার। আমাকে দেখে চালক গাড়ী থেকে নেমে এল। চালক না বলে রাজসারথিই বলা উচিত, কারণ সে রাজদরবারের পোশাকেই সজ্জিত। অভিবাদন করে সারথি বলল, আইয়ে।

যাব ত নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে—ল্যাণ্ড রোভারেই কি? কোন রকমে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, দৌবারিক যে বলল হেলিকপ্‌টার এসেছে?

সারথির কাছ থেকে উত্তর পেলাম কিন্তু ইংরেজীতে: They call me Helicopter, Sir,—তারপর একটু থেমে, because I drive pretty fast.

হেলিকপ্‌টার-রহস্যের মীমাংসা হল, কিন্তু আর-একটা কৌতূহল জেগে উঠল: সারথি ইংরেজী শিখল কোথা থেকে? এখানকার সাধারণ লোক ত ইংরেজী জানে না! সে কৌতূহলও নিবৃত্ত হল ল্যাণ্ড রোভারে বসেই। হেলিকপ্‌টার কালিম্পং-এর সাহেবী স্কুলে 'আপটু সেকেণ্ড স্টাণ্ডার্ড' পড়েছে। অর্থাভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। সেখানেই ড্রাইভিং শেখে। পরে রাজদরবারে চাকরি পায়। বর্তমানে সে অর্থমন্ত্রীর সারথি।

ভূটানের রাজ অতিথিভবন মুথীথাং থেকে থিম্পুর রাজদরবার জং মাইল ছ-সাত হবে। পাহাড়ী পথ তাই ঘুরে আসতে হয়। সোজা যাওয়া গেলে—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে as the crow flies—মাইল-দুয়েকের বেশী হবে না। মুথীথাং-এর উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুটের মত, আর রাজধানী থিম্পুর সাত হাজার ফুটের কিছু বেশী। অর্থাৎ আমাদের হাজার ফুটের মত নামতে হবে এবং ছ-সাত মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে।

হেলিকপ্টার প্রেটি ফাস্টই চালাচ্ছিল। ঘাবড়ে গেলাম। তবে একটু আস্তে চালাতে অনুরোধ করতেও কেমন যেন সম্মানে বাধল। মনে পড়ল ফুন্টশলিং থেকে থিম্পু আসার পথের কথা। আসছিলাম উন্নয়ন-মন্ত্রীর সংগে, তিনিই চালাচ্ছিলেন। গাড়ীতে আর-কেউ ছিল না মন্ত্রী মহাশয়ের চমৎকার হাত, পাহাড়ী রাস্তায় অতি সতর্কভাবে চালান, কিন্তু অভ্যাস হল চালাতে চালাতে পথের কোথায় কবে কি দুর্ঘটনা হয়েছিল তার পুংখানুপুংখ বিবরণ দেওয়া :

—গত মাসে ঠিক এইখানেই ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের দু-জন অফিসারসহ একটা জীপ একেবারে তলিয়ে যায়...... জীপটার আর-কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি, অফিসার দু-জনের দেহও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। এইখানে, বুঝলেন, একটা মিলিটারী ট্রাকের সংগে একটা ল্যাণ্ড রোভারের ধাক্কা লাগে মাস-তিনেক আগে। ড্রাইভারের পাশে বসে ছিলেন আমারই একজন আত্মীয়। তিনি ছিটকে পড়েন, তলিয়ে না গিয়ে একটা গাছে আটকে কোন রকমে বেঁচে যান ··তিনি এখনও হাসপাতালে··· · ঐ যে যায়গাটা পেরিয়ে এলাম, যেখানে বড় বড় পাথর ঝুলছে, গত আগস্ট মাসে ঐ রকম একটা পাথর একটা জীপের ওপর পড়ে। জীপের চালক ও আরোহী দু-জনেই সংগে সংগে মারা যান......ও। সেই বীভৎস দৃশ্যটি যদি দেখতেন···, ইত্যাদি।

মান্যবর মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করা সম্ভব হয় নি যে গল্পগুলো আপাতত মুলতবী রাখুন, সুযোগ হলে পরেই শুনব। এর কারণ হল, ফুন্টশলিং-এ গাড়ীতে চাপবার আগে মন্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পাহাড়ী রাস্তায় ভয় করবে না ত ?

উত্তর দিয়েছিলাম, অনেক পাহাড়ী রাস্তাতেই গেছি, ভয় ত কখনও করে নি।

—মাথা ঘোরে না ত ?

—না। মাথাও কখনো ঘোরে নি।

—মাথা হয়ত ঘুরবে না—মন্ত্রী মহাশয় আশ্বাস দেন, তবে কি জানেন— এ-রাস্তা ঠিক দার্জিলিং-শিলং-এর মত নয়……ভয় কিছুটা আছে। সেজন্যে আমি কোন ড্রাইভারকে বিশ্বাস করি না, নিজেই চালাই ··ঐ যে মিলিটারী ট্রাক-ড্রাইভারগুলো, ওরা এত বেপরোয়া চালায় যে ওদের সামনে পড়লে অনেক সময় নিজের ওপরও আস্থা রাখতে পারি না।···

মন্ত্রী মহাশয় বিরামবিহীন ধূমপায়ী—একটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ থেকে আর-একটা ধরান। প্রতিবারেই তিনি আমার দিকেও একটা করে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। অত ধূমপানে অভ্যস্ত আমি নই। কয়েক বারের পর সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললাম, এখন আর নয়, পরে।

মন্ত্রী মহাশয় যেন একটু অবাক হলেন, কি ব্যাপার, পরে কেন? কতকটা জ্ঞান দেবার মত উত্তর দিলাম, ওরা বলে—অর্থাৎ আধুনিক ধারণা হল যে বেশী ধূমপান করলে ক্যান্‌সার হতে পারে, তাই ঐ বদ অভ্যাসটা যতটা পারা যায় সীমিত রাখবার চেষ্টা করি।

একটু হেসে মন্ত্রী মহাশয় উক্তি করলেন, There are thousands of ways of dying But why should you deprive yourself of the pleasure?—তারপর একটু থেমে, এই যে আমরা যাচ্ছি, থিম্পু পৌছুব কি-না কে জানে! কত লোকেই ত এই পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে!……

তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল পথের দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়া। মধ্যে নিজের সম্পর্কে আর-একটা কথাও বলেছিলেন: বুঝলেন, আমাকে প্রায়ই প্লেনে ট্রাভেল করতে হয়। প্লেন অ্যাক্সিডেন্টের কথা হামেশাই কাগজে পড়ি। প্রথম প্রথম ভয় হত, এখন হয় না। প্রতি ফ্লাইটেই হেভী ইন্সিওরেন্স করে উঠি। যদি আমার কিছু হয়ই, আমার ফ্যামিলি ত স্ট্রাণ্ডেড্ হয়ে পড়বে না।···

মন্ত্রী মহাশয়কে ঠিক বুঝতে পারি নি। জীবন-মৃত্যুকে সত্যিই কি তিনি পায়ের ভৃত্য করে নিতে পেরেছেন, না মৃত্যু তাঁকে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করছে বলেই মৃত্যুদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁর কাছে অন্যতম বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, ফুন্টশিলং থেকে দেড়-শ মাইলের ওপর আট ঘণ্টার রাস্তায় যদি ভয়কে জয় করে থাকি, তবে এখন পনের-কুড়ি মিনিটের রাস্তায় ভয় পাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাই হেলিকপ্‌টার প্রেটি ফাস্ট চালালেও চুপ করেই রইলাম।

জং-এর প্রায় একশ গজ দূরে হেলিকপ্‌টার গাড়ী থামিয়ে বলল, 'From here on foot.—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে যা ব্যাখ্যা শুনলাম তা হল এই

রকম : জং শুধু রাজদরবার নয়—একাধারে গোম্ফা, দপ্তর এবং রাজদরবার। গোম্ফা বলেই পায়দল যেতে হয়—ধর্মস্থানে ত আর গাড়ী চেপে যাওয়া চলে না!

নেমে পড়লাম। হেলিকপ্টার বললে, আপনি ঐ গেটে অপেক্ষা করুন। গাড়ীটা পার্ক করে আমি আসছি।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, হেলিকপ্টারের দেখা নেই। হাতঘড়িতে দেখলাম, রাজদর্শনের সময় হয়ে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে জং-এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অদৃষ্টপূর্ব পোশাকে সজ্জিত দু-জন রক্ষী পথরোধ করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলে। অনুমানে বুঝলাম, কি চাই? বা কোথায় যাবেন? —এই ধরনের কোন প্রশ্ন। বুঝতে পারবে ধরে নিয়ে মাত্র দুটি শব্দে উত্তর দিলাম, ফিনান্স মিনিস্টার। যেন শব্দ-দুটির সংগে পরিচিত অথচ পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারছে না এমনভাবে রক্ষী দু-জনেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একজন যেন রহস্যের কিনারা করতে পেরেছে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল, ফাইন্যান্স মিনিস্টার? উত্তরে সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করতেই সে অ্যাবাউট টার্ন হয়ে আমাকে তার অনুসরণ করতে ইংগিত করলে।

রক্ষী দোতালার লম্বা বারান্দার একটা কোণের ঘরের সামনে এনে হাজির করলে। সেখানেও অনুরূপ পোশাকে সজ্জিত দু-জন রক্ষী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার পথপ্রদর্শক রক্ষী তাদের নিজস্ব ভাষায় কি বললে। ইংগিতে আমাকে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে দৌবারিকদের একজন ভিতরে ঢুকে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এসে দরজার পর্দাটা খানিকটা সরিয়ে অ্যাটেন্সন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম ভিতরে যাবার ইংগিত।

ভিতরে ঢুকে দেখি সাহেবী-পোশাকে সজ্জিত একজন অবাঙালী ভারতীয় (চেহারায় দক্ষিণ ভারতীয় বলে মনে হয়েছিল) একটা টেবিলে বসে কাগজপত্র দেখছেন। আমাকে দেখে একটু সম্ভ্রমসূচক গাত্রোত্থানের প্রচেষ্টা করে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পশ্চাৎ দিকে নির্দেশ করলেন—অর্থাৎ, হেথা নয়, পরবর্তী প্রকোষ্ঠে যাও।

পরবর্তী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দেখি এক বিরাট টেবিলের ওধারে বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত শালপ্রাংশু এক রাজপুরুষ দরজার দিকেই চেয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, মুখার্জী সাব্, সাড়ে আট বাজনেকো আউর্ দো তিন

মিনিট হাত।—সাড়ে আটটায় রাজদর্শন। অতএব, বিলম্ব না করে রাজদরবারের দিকেই যাবার নির্দেশ।

ইতিমধ্যে কখন যে একজন রক্ষী পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করি নি। অর্থমন্ত্রীর ইংগিতে রক্ষীকে অনুসরণ করে এসে হাজির হলাম দোতালারই বিপরীত দিকের কোণের একটি ঘরে। সেখানে একজন ইংরেজী-জানা রাজপুরুষ অভ্যর্থনা করলেন, Come in, Mr. Mukherji। ভিতরে প্রবেশের পর বসতে না বলে রাজপুরুষ নির্দেশ দিলেন, Get ready please. Hardly a minute left for the audience.

উত্তর দিলাম, তৈরি হয়েই ত আছি। কোন্ দিকে যেতে হবে বলুন।

You can't go there unescorted, রাজদর্শনের একটা অনুষ্ঠান আছে। মনে হল, আরও কিছু বলতে গিয়ে রাজপুরুষ যেন নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর আদেশ দিলেন: এই স্কার্ফটা ধরুন। ঘরে ঢুকেই হিজ ম্যাজেস্টিকে স্কার্ফটা দিয়ে অভিবাদন করবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সিল্কের স্কার্ফটা হাতের মধ্যে নিলাম।

—ওভাবে নয়, ওভাবে নয়—এইভাবে ধরুন, বলে কিভাবে স্কার্ফ ধরে মহারাজের হাতে দিতে হয় দেখিয়ে দিলেন। সেইভাবেই স্কার্ফটা ধরে অনুবর্তী হলাম সেই রাজপুরুষের। মনে পড়ল ছেলেবেলায় দেখা রবি বর্মা না কার আঁকা স্বয়ম্বর-সভায় জনক রাজার পশ্চাতে জানকী দেবীর আগমনের একখানা চিত্রের কথা।

স্কার্ফখানা সেইভাবেই ধরে দাঁড়াতে বলে রাজপুরুষ একটা ঘরের পর্দা একটু সরিয়ে উঁকি দিয়ে কি দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, Those people are still there. Let's go back to the waiting room. বুঝলাম আমার আগে যাঁরা রাজদর্শনে এসেছিলেন তাঁরা এখনও দর্শন সমাপ্ত করেন নি। এবার স্কার্ফটা কাঁধে ফেলেই ওয়েটিং রুমে ফিরে এলাম।

বসে বসে ভাবছিলাম আর-এক রাজদর্শন-প্রচেষ্টার কথা।

অনেক দিন আগে উদয়পুর বেড়াতে গেছি। আজমীড়ে সদানন্দজী বলে দিয়েছিলেন, উদয়পুর যাচ্ছেন, মহারাণাকে একবার দর্শন করবেন।

সদানন্দজী আজমীড় রেল-স্টেশনের কাছে বাঙালী হোটেলের মালিক।

হোটেল বলতে পাইস্ হোটেল। বাইরে সাইনবোর্ড টাঙানো: মাত্র দেড় টাকায় বাঙালী আহার—আমিষ ও নিরামিষ। তাই দেখেই ঢুকেছিলাম।

বাঙালী হলেও সদানন্দজী রাজপুত শৌর্যবীর্যের একজন পরম ভক্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ তাঁর মুখস্থ। তাঁর মতে, রাজস্থানে এসে মহারাণাকে দর্শন না করা, কাশীতে গিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন না করারই সামিল।

সদানন্দজীর কথা শুনে রাণা প্রতাপের বংশধরকে দর্শন করবার আধা-ইচ্ছে নিয়েই উদয়পুব গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম মহারাণাব দর্শনপ্রার্থীদের আগের দিন প্রাসাদে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে হয় এবং দর্শন-বিভাগের নির্দেশানুযায়ী পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হতে হয়।

নাম লেখার পর খাতাটা এগিয়ে দিলে নাম-দুটির (আমার ও আমার সংগী জ্ঞাতিভ্রাতাব) প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেই দর্শন-সচিব জিজ্ঞাসা করলেন, You are Brahmins Aren't you?—উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন

—কে শোনে নি? তাছাডাও আমি জানি মুখার্জি, ব্যানার্জি ইত্যাদি সবই ব্রাহ্মণ। যাক সে কথা, দর্শন হবে না।

বিশেষ অবাক হলাম। দর্শন হবে না, কেন? ব্রাহ্মণ বলে, না বাঙালী ব্রাহ্মণ বলে? জানতাম খাদ্যাখাদ্য বিচারবিহীন বলে অনেকেই বাঙালী ব্রাহ্মণদের হেয় চক্ষে দ্যাখে।

আমাদের মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক কি ভেবে বললেন, আচ্ছা, আপনাবা মহারাণাকে দর্শন করতে চান কেন?

উত্তর দিলাম, বিশেষ কোন কারণ নেই, তবে রাণা প্রতাপের বংশধরের দর্শন পেতে ইচ্ছা করে না কি?

উত্তব মনোমত হয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কারণ সচিব এবার জিজ্ঞাসা করলেন, নজরানা দিয়ে মহারাণাকে দর্শন করতে হয়, জানেন ত?

নজরানা? না, তা ঠিক জানতাম না। তবে জানতাম যে রিক্তপাণি রাজদর্শন ঠিক রীতি নয়। রাজাবাজড়ার দিনে আমাদের দেশেও এ-নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাজাদের দেখাদেখি জমিদাররাও নিয়মটি প্রবর্তন করেছিলেন। এখন রাজারা যখন নেই তখন আর অতীত দিনের রীতি কেন? উদয়পুরে এসেছি, সদানন্দজীর কথায় মহারাণাকে দেখবার ইচ্ছে হয়েছে। ফাঁকতালে যদি একবার দর্শন পাওয়া যায় ত মন্দ কি? ফিরে গিয়ে গল্প করা যাবে—

এই ছিল মনোভাব। কিন্তু যদি দর্শনী লাগে বলে জানতাম তাহলে দর্শন-প্রত্যাশী হিসাবে নিশ্চয়ই নাম লেখাতে আসতাম না।

অবশ্য সচিবের কাছে মনের ভাব গোপন করেই বললাম, আমরা ট্যুরিস্ট, নজরানা কি আর দিতে পারি? কয়েকটা টাকা দিয়েই মহারাণাকে দর্শন করে যাবার ইচ্ছে ছিল।

—সেইখানেই ত আপত্তি। সচিবের উক্তির তাৎপর্য মোটেই অনুধাবন করতে পারলাম না। তারপর ব্যাপারটা শুনলাম। দরবারের নিয়ম হচ্ছে কোন ব্রাহ্মণ নজরানা হিসাবে যে টাকা দেন তাঁকে দ্বিগুণ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বা বিদেশীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবশ্য প্রযোজ্য নয়। তাঁরা নজরানা হিসাবে যা প্রদান করেন মহারাণা তা গ্রহণ করেন—প্রত্যর্পণের কোন প্রশ্ন নেই। এই প্রথার সুযোগ নিয়ে অনেক ব্রাহ্মণ মহারাণাকে মোটা মোটা টাকা নজরানা দিয়ে দর্শন করতে আসেন, অনেকে আবার ব্রাহ্মণ সেজেও আসেন। সেইজন্য দরবার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেক দর্শনপ্রার্থীর পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করা।

বিবরণের শেষাংশটুকু শ্রুতিমধুর লাগল না। সচিব মহাশয়কে বলে এলাম যে দর্শনের ইচ্ছে আর নেই, কারণ রাজকোষের অর্থের অপব্যয় ঘটুক তা আমরা চাই না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমার জ্ঞাতিভ্রাতা বললে, আসল কথা হল বখরা চায়। আমরা মহারাণার কাছে যা পেতুম তা থেকে কিছু ছাড়তে বলছিল।

হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে—এ নিয়ে কোন অনুসন্ধানকার্য চালাই নি। এমন কি নজরানা ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে সচিবের উক্তি কতটা সত্য, তাও যাচাই করে দেখবার ইচ্ছে হয় নি। মনে একটা বিরক্তির ভাব নিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যায় চিতোরগড়ের ট্রেনে চেপে বসেছিলাম।

রাজদরবারের ওয়েটিং রুমে বসে মনে মনে ভাবছিলাম যে ভূটানের নিয়মই ভাল। টাকাকড়ি নয়, উপঢৌকন হিসাবে শুধু স্কার্ফ দিয়ে রাজদর্শন করতে হয়, আর নিজে স্কার্ফ না আনলে দরবারই তার ব্যবস্থা করে। কোন বখরার প্রশ্ন নেই।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, একবার প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিলে মন্দ হত না। রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, টয়লেটটা কোন্ দিকে?

উত্তর পেলাম, এখানে টয়লেটের কোন ব্যবস্থা নেই। সংগে সংগে মনে পড়ল যে জং ধর্মমন্দিরও বটে, সুতরাং আবশ্যিক দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর স্থান নয়। প্রকৃতির আহ্বান উপেক্ষা করেই বসে রইলাম। কৌতূহল হল জানতে যে আহ্বান যদি উপেক্ষণীয় না হয়, তবে দরবারের লোকেরা কি করে? ধর্মস্থানে নিশ্চয় অধর্মের কাজ করে না!

আগের দিনের তুটো ঘটনা মনে পড়ল। সেদিন ছিল রবিবার। একটা জীপ চেয়ে নিয়ে মুথীথাং অতিথিভবন থেকে শহর দেখতে বেরিয়েছি। জং-এর কাছাকাছি এক যায়গায় এসে আঁতকে উঠলাম। পথের ওপর মস্তক-বিচ্যুত ডজন খানেক পাহাড়ী গরু পড়ে। ড্রাইভারের কাছ থেকে জানলাম যে পাশেই সরকারী কসাইখানা, এবং বিভিন্ন গোম্ফায় পাঠাবার জন্যে ঐ গৃহপালিত পশুগুলিকে হত্যা করা হয়েছে। গো-মাংস ভোজন অন্যায় বা পাপ বলে মনে করি না, তবুও কেন যেন সেদিন মনে হয়েছিল কসাইখানাটা ধর্মস্থান বা গোম্ফার অত কাছাকাছি না হলেই বরং ভাল হত।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ছিল একটু অন্য ধরনের। সেদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল বলে একটা ছাতা চেয়ে নিয়েছিলাম। জং-এর পাশে থিম্পু নদীর ধারে* মহারাজার কটেজ। সেখানে একটা চমৎকার ফুলের বাগান আছে। বাগানটা ভাল করে দেখবার জন্যে জীপ থেকে নামলাম। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পডতে শুরু করেছে। পেছনের সীট থেকে ছাতাটি নেবার উপক্রম করতে ড্রাইভার 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে উঠল। কি ব্যাপার? ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে যা বলল তা হল ঐ অঞ্চলের একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে ছাতা খোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু ভাষার অসুবিধার দরুন উত্তরটা ঠিক বুঝতে পারি নি। পরে আর-কাউকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এখন আবার সেই কৌতূহলের পুনরুদ্রেক ঘটল: জং-এর কাছাকাছি বলেই কি ছাতা খোলা নিষেধ, না মহারাজার কটেজের কাছাকাছি বলে?

প্রায় আধ ঘটা পরে একজন রক্ষী এসে দেশীয় ভাষায় রাজপুরুষকে কি বলতে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন যাওয়া যাক্, তাঁরা চলে গেছেন।

* নদীর নামও থিম্পু।

এবারও স্বয়ম্বরা কন্যার মত স্কার্ফটা ধরে অগ্রসর হলাম। রাজপুরুষের ইংগিতে সেই আগের ঘরে ঢুকে দেখি একজন পুরুষ সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরে আর-কেউ নেই দেখে বুঝলাম ইনিই মহারাজ। মহারাজের ফোটো কয়েকখানা দেখেছি—ফুন্টশিলং সার্কিট হাউসে, থিম্পু-এর গেস্ট হাউসে, রাজদর্শনে আসবার আগে ওয়েটিং রুমে। ফোটোর সঙ্গে চেহারার খুব মিল নেই, তাই চিনতে দেরী হয়েছিল। ফোটো নিশ্চয়ই অনেক আগের তোলা।

বোঝবার আগেই মহারাজা হাত বাড়িয়ে স্কার্ফখানা নিয়েছেন, তারপর আমার হাত ধরে একখানা পৃষ্ঠবিহীন সোফায় এনে বসিয়েছেন এবং নিজে বসেছেন পাশেই। একবার চকিতে দেওয়ানী খাসের চারিদিক পর্যবেক্ষণ কবলাম। সম্পূর্ণ দেশী, অর্থাৎ ভূটানী কায়দায় সাজানো, আসবাবপত্রও সব দেশী।

বসতে না বসতে একজন বাজভৃত্য চাযের সরঞ্জাম এনে হাজির, আর ওদিকে মহারাজ তাঁর সিগারেটের বাক্স আমার সামনে খুলে ধরেছেন।

মহারাজ দিনে ক পেয়ালা চা পান করেন এবং কটি সিগারেট ধ্বংস করেন জানি না, তবে আমি যে ঘণ্টাখানেক ছিলাম তার মধ্যে তিন পেয়ালা চা এবং অন্তত দশটি সিগারেট শেষ করেছিলেন।

কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে শীতে একটু কেঁপে উঠছিলাম। তা লক্ষ্য করে মহারাজ বললেন, I find you are shivering. Like to have some strong drink ?

সবিনয়ে জানালাম যে স্ট্রং ড্রিংকে মোটেই অভ্যস্ত নই।

—তবে একটা পান খাও।

শীত ভাঙাবার জন্যে পান ?—ব্যাপারটা তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। বুঝলাম পানটা মুখে দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শরীর গরম হয়ে এল এবং মাথা ঘুরতে লাগল। মহারাজ দু-একটা প্রশ্ন করেছিলেন, ভাল করে কানেই ঢোকে নি। আমি তখন মুখের পানটা ফেলবার জন্যে ছটফট করছি, কিন্তু কোথায় ফেলি তাই সমস্যা।

লক্ষ্য করে মহারাজ বললেন, You can use the ash tray for the purpose. I find it's much too strong for you.

ছাইদানিতে অর্ধচর্বিত তাম্বূল বর্জন করে যখন সুস্থ হবার চেষ্টা করছি তখন মহারাজ তাম্বূলের গুণ ব্যাখ্যা করলেন। তাম্বূলের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, আছে গুবাকের। এই গুবাককে খাঁটি অ্যালকোহলে অনেক দিন ভিজিয়ে রাখা হয়,

ফলে শরীরে তাপসঞ্চারে মদের মতই কাজ করে। তবে আমার মত যারা অনভ্যস্ত তাদের কারও কারও একটু অসুবিধা হতে পারে।

আমি ভূটানে গিয়েছিলাম মহারাজেরই আমন্ত্রণে কোন বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য। অডিয়েন্স শেষ হলে উঠে আসছি, মহারাজ বলে উঠলেন, তুমি যাই বল, রাজতন্ত্রের দিন শেষ হতে চলেছে। আমার মনে হয় ফারুকের কথাই ঠিক : শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ ও তাসের রাজা ছাড়া পৃথিবীতে আর-কোন রাজাই থাকবে না।

কলকাতায় ফেরবার পথে ভূটানের দ্বিতীয় শহর পারোতে গেছি, সেখান থেকেই জাম-এয়ারের প্লেন ধরব। শহরটা দেখব বলে একদিন আগেই গেছি, আছি এখানকার রাজ অতিথিভবনে। অতিথিভবন বললে ভুল ধারণা হতে পারে। একটা পাহাড়ের টিলার ওপর কয়েকটি বাংলো। তাদের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর, নিশ্চয়ই অতিথিদের মর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়।

অতিথিভবনের পরিচালক রেজিস্টার এনে সামনে রাখলেন। পূরণ করতে গিয়ে দেখলাম নামের তালিকা শেষ হয়েছে সিকিমের এক রাজকুমারীতে এসে। তাঁর আগমনের সময় তারিখ আছে, কিন্তু নির্গমনের তারিখ নেই। সুতরাং তিনি এখনও আছেন। মন্তব্য করলাম, দেখছি, একজন রাজকুমারী এখানে আছেন। উত্তর হল, হঁ্যা, সিকিমের। হার ম্যাজেষ্টীস্ গেস্ট। ঐ ১নং বাংলোয় আছেন। পরিচালক বদ্ধ ঘরের মধ্য থেকেই একটা দিক নির্দেশ করলেন—সেটা পূর্ব না পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণ জানি না।

এমন সময় বাইরে একটা জীপ গাড়ীর মত শব্দ হল। রেজেস্ট্রীখানা ফেলে রেখেই পরিচালক বাইরে ছুটে গেলেন। ফিরে এলেন প্রায় পনের মিনিট পরে। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ফিরে এসেছেন। চা চাইলেন, ব্যবস্থা করে এলাম। পরিচালকের মুখে একটা শংকা ও বিরক্তির মিশ্র ভাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, রাজকুমারী ক-দিন আছেন?

—মাত্র দু-দিন। তারপর পরিচালক তাঁর আধা-হিন্দিতে বলে চললেন, দু-দিন হলে কি হয়, মনে হয় যেন দু-সপ্তাহ। ওঃ! ওই রাজারাজড়ারা এলে কি তটস্থ হয়েই না থাকতে হয়।

—কেন উনি কি খুব জ্বালাতন করেন ?

—না, মোটেই না, মহিলা ভালই। তবে কি জানেন, ওঁদের সংগে আমাদের সাধারণ লোকের মেলে না. আমি লামা, হিজ হোলিনেসের শিষ্য, কিন্তু চাকরি করি হিজ হাইনেসের—পেটের দায়ে! আপনাদের মত লোক এলে কোন অসুবিধা হয় না, সাধ্যমত সেবা করি। কিন্তু ওঁরা এলেই সর্বদা ভয় করে কোথায় কি ত্রুটি হল···সবচেয়ে বড় অসুবিধা সেলাম দিতে হয়—হিজ হোলিনেসের শিষ্যকে মাথা নোয়াতে হয়। তাই মাঝে মাঝে ভাবি আপনাদের দেশের মত রাজারাজড়া না থাকাই ভাল।

দেখেছিলাম ভুটানে লামাদের জীবন-পদ্ধতিতে বাইরের জগতের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। আগে সংসারত্যাগী লামারা বাস করতেন জনপদ থেকে বহু দূরে, বার হাজার পনের ফুট উঁচু গোম্ফায়। রাজদরবার থেকে সারা সপ্তাহের জন্য খাদ্য পাঠানো হত, এখনও হয়। খাদ্য বলতে গোমাংস এবং গোধূম। থিম্পু থেকে বেশী দূরে নয় এমন একটা গোম্ফায় দেখেছিলাম অগ্নিতে গোমাংসের এক অতি বৃহৎ খণ্ড ঝলসানো হচ্ছে, আর অদূরে বসে জন-দুয়েক লামা উপাসনা করছেন। বোধহয় ঐ মাংস রাজদরবার থেকেই এসেছিল।

ধর্মের মৌল তত্ত্ব ও নীতিতে হয়ত কোন ভেদ নেই, কিন্তু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান দেশ ও কালের আপেক্ষিক। ঊষর পার্বত্য অঞ্চলে—যেখানে কৃষি-কার্যের বিশেষ সুযোগ সুবিধা বেশী নেই, সেখানে—নিরামিষাশী হওয়া অসম্ভব। অতএব, অহিংসাকে পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করলেও প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে প্রাণি-হত্যা থেকে বিরত থাকা যায় না। আর প্রাণিহত্যা বলতে ত আর শুধু পশুহত্যা বোঝায় না। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জেষ্টিং পাইলেট* স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্র-প্রদর্শিত উদ্ভিদজীবন-প্রক্রিয়া দেখে মন্তব্য করেছিলেন: এখানে এলে নিরামিষাশীকে নিরামিষ ভোজন ছাড়তে হবে; ফলে জীবনধারণের জন্য খাদ্য-নির্বাচনই হয়ে দাঁড়াবে তার সমস্যা। অতএব, বৌদ্ধ লামাদের গোমাংস ভোজন কেমন কেমন লাগলেও আদৌ অযৌক্তিক নয়।

এইভাবে গোম্ফায় বসে রাজদরবার থেকে প্রেরিত খাদ্য গ্রহণ করে আর কালজয়ী মহাপুরুষ-নির্দেশিত পথে নির্বাণ লক্ষ্যাভিমুখী সাধনা করে লামারা

* অ্যালডুস্ হাক্সলি

কাল কাটাচ্ছিলেন। মুশকিল বাধল ভারতের সংগে সংযোগস্থাপনকারী সড়ক নির্মাণের পর। বাধল বাইরের সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত। কোন কোন লামা গোম্ফা ছেড়ে রাজদরবারে চাকরি নিলেন, শুনেছি কেউ কেউ থিম্পু-পারোতে দোকানও দিয়েছেন।

ভূটানের লামাদের জীবন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তর কি? তাঁরা কি সম্পূর্ণভাবে বাইরের জগতের সংগে সামিল হবার পক্ষপাতী? পারোর অতিথি-ভবনের পরিচালক লামা যে উক্তি 'রাজারাজড়া না থাকাই ভালো'—এটা কি অন্য লামাদেরও মনোভাব? লামারা ছাড়া অপরেও কি তাই ভাবে?—জানি না।

তবে কেন যেন মনে হয়েছিল মহারাজ এই তলস্রোতের ইংগিত পেয়েছিলেন। তাই আমার সংগে মোলাকাতের সময় ইজিপ্টের শেষ রাজা ফারুকের খেদোক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন যে পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত দু-জন রাজাই থাকবে—ব্রিটিশরাজ ও তাসের রাজা।

রাজদর্শন ২

সকালে এই স্যুইটে উঠেছি আর সন্ধ্যাবেলাতেই ছেড়ে দেবার নোটিশ। মেজাজ খিঁচড়ে গেল, অন্য দিকে আবার জিদও চেপে গেল—না, কিছুতেই নয়। সন্ধ্যাবেলা এই স্যুইট ছেড়ে অন্য স্থানে যেতে হবে এমন ত কোন কথা ছিল না। ঢোকবার সময় ম্যানেজারের মুখে ভাষা ছিল অন্য রকম: হোটেলের বেস্ট স্যুইট, আপনাদের দিতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। এরকম স্যুইট প্যালেস হোটেলেও বেশী নেই।

ভাষা ব্যবসাসুলভ হলেও তাতে অত্যুক্তি বোধহয় বিশেষ ছিল না। সত্যিই এরকম স্যুইটে জীবনে থাকি নি। শয়নকক্ষের ত তুলনা নেই, স্নানাগার-সহ অন্যান্য কক্ষও কম নয়। চার কামরার স্যুইট, আর প্রত্যেকটি কামরা নিখুঁতভাবে সাজানো, কেবল তোয়ালে চাদর ইত্যাদি—অর্থাৎ লিনেন—একটু খেলো ধরনের। বেমানানটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না, তবুও কিন্তু সব মিলে যেন রাজকীয় ব্যাপার।

চারটে কামরার মধ্যে একটা ভোজনকক্ষ। এখানেই ভোজন করব, না সাধারণ ভোজনকক্ষে যাব—জিজ্ঞাসা করা হলে সংগী বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ জানালাম, এখানেই। সার্ভিস চার্জ লাগবে কিনা, সে বিষয়ে চিন্তাই করলাম না।

মধ্যাহ্নভোজনের জন্য প্রেরিত ভোজ্য অবশ্য আমাদের আদৌ মনঃপূত হয় নি। ভোজ্য তালিকায় বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, রন্ধনকৌশলের তারিফ করবার মতও কিছু নেই। মনকে বোঝালাম এত কম ব্যয়ে এরকম স্যুইটে থেকে রাজভোগ আশা করা উচিত নয়। তাছাড়া এই আধা-মরুভূমির দেশে অনেক জিনিস আবার পাওয়াই যায় না।

বৈকালিক চাও তদ্রূপ বা আরও নিকৃষ্ট। চায়ের সঙ্গে মাত্র কয়েকখানা করে নোনতা বিস্কুট। প্রতিবাদ করি নি। মাথাপিছু দৈনিক কুড়ি টাকায় এরকম স্যুইটে থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করা অযৌক্তিক।

এই রাজকীয় স্যুইট ছেড়েই অন্যত্র—অন্য কোন হোটেলে নয়, অন্য এক স্যুইটে যেতে বলা হয় সন্ধ্যাবেলায়।

আবু রোড থেকে ট্যাক্সিওয়ালা সটান এখানে এনে তুলেছিল। বলেছিল, এত সস্তায় এত ভাল হোটেল আবু পাহাড়ে আর নেই। এসে স্যুইট দেখে এবং চার্জের কথা শুনে দেখলাম ট্যাক্সিওয়ালা কোন অতিশয়োক্তি করে নি। হোটেলের সংগে তার বন্দোবস্ত থাকলেও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমাদের সে ভাল জায়গাতেই তুলেছে।

বোধহয় ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে ম্যানেজার নিজেই এসেছিলেন অনুরোধ নিয়ে। অনুরোধে আমরা গরম হয়ে উঠলেও ঠাণ্ডা হতে দেরী লাগল না। শুধু গ্রহণ নয় অর্পণের প্রস্তাবও ছিল।—I shall charge half the rate from you—ম্যানেজারের মুখ থেকে নির্গত হতে না হতে আমার বন্ধুটি বলে বসলেন, No objection। বন্ধুটি আমার একজন চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট; নিশ্চয়ই আমার আগে হিসাবকার্য সমাধা করে ফেলেছিলেন। ম্যানেজারের দিক থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট অফ্‌, বুঝলে?—মানে টেন রুপিজ পাব হেড। চল যে ঘরে যেতে বলে সেই ঘরেই যাওয়া যাক্‌।

খিচুড়ি ভাষায় বলা হলেও ইংরেজী শব্দগুলির অর্থ উপলব্ধি করতে ম্যানেজারের দেরী হয় নি। বন্ধুর ব্যাখ্যার সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন, Yes, it comes to that—ten rupees per head. ..And no service charge.

আর দ্বিরুক্তি নয়, সংগে সংগে স্যুইট পরিবর্তন। বন্ধুর উল্লাসের আর শেষ নেই। নতুন স্যুইটে ঢুকে কোন দিকে না তাকিয়েই মন্তব্য করেন, Ten rupees per head! যাকে বলে ড্যাঙ্কি—নয়?

এইবার নতুন স্যুইটের দিকে দৃষ্টিপাতের অবকাশ পেলাম। কিছু কিছু দামী আসবাবপত্র থাকলেও সাজসজ্জা অতি সাধারণ। স্নানাগার ছাড়া ঘর মোটে দুটো। ছেড়ে-আসা স্যুইটের সংগে তুলনাই হয় না। তবুও কোথাও যেন রাজকীয় আভিজাত্যের ছাপ বহন করছে। Ten rupees per head—আমাদের হোটেল-সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, ফলে পরিবর্তনজনিত অধঃপতনের দুঃখ বিশেষ পীড়া দিতে পারে নি।

পরদিন সকালে প্রাতর্ভোজনের পর হোটেলের সামনে ছোট লনের দিকে যাচ্ছি এমন সময় হোটেলের একজন বেয়ারা 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে ছুটে এল: উধার

মৎ যাইয়ে,—তার চোখে মুখে আতংকের ভাব। এবার আমাদের দু-জনেরই মেজাজ একসংগে মস্তকে চড়ল: ব্যাপার কি? টেন রুপিজ পার হেড বলে কি লনে বসবারও অধিকার নেই? বন্ধু তীব্রস্বরে, কেঁও নেই যায়েগা?—শেষ করবার আগেই লন থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে এল, রোকো মৎ। তারপর আমাদেরই উদ্দেশ্য করে, Come along gentlemen। 'রোকো মৎ' শুনেই সেদিকে তাকিয়েছিলাম, এখন দেখলাম লনে এক বৃহৎ ছত্রের তলায় একটি বেতের চেয়ার অধিকার করে সাহেবী পোশাকে সজ্জিত চুরুট মুখে এক ভদ্রলোক। আর চেয়ারগুলো সম্পূর্ণ খালি।

আহ্বানের জন্য নয়, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এগিয়ে গেলাম। খালি চেয়ারগুলির দিকে অংগুলি সংকেত করে ভদ্রলোক বসতে বললেন। অধিকার-সচেতন আমরা বসতে না বললেও হয়ত বসতাম। বসার সংগে সংগে প্রশ্ন, It is you I dispossesed last afternoon?

মেজাজ শান্ত হয়ে আসছিল, শুনে আবার খিঁচড়ে গেল। উত্তরে যা বললুম তা হল: হ্যাঁ, আমরাই সেই অভাজন ব্যক্তিদ্বয়। কিন্তু কেন বলতে পারেন আমাদের ঐ স্যুইট থেকে বিতাড়িত করা হল?

ভদ্রলোক কোন উত্তর দেবার আগেই আমার বন্ধু শুরু করলেন, আপনিই কি এই হোটেলের মালিক? যদি হন ত জেনে রাখুন আপনার ম্যানেজার কাজটা ভাল করেন নি···নেহাৎ ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট··।—বন্ধু থেমে গেলেন, বোধহয় ভাবলেন, ফিফ্‌টি পার্সেণ্টের কথা মালিককে না জানানোই ভাল।

ভদ্রলোকও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হল, ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা করছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে কোথায় যেন বাধছে। তাই বন্ধু থামার বেশ খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, না, আমি এই হোটেলের মালিক নই·· এই বাড়ীর মালিক।

চমকে গেলাম। এইরকম বাড়ীর মালিক! ইনি কে?

ভদ্রলোকই কৌতূহলের অবসান করলেন, এটা ছিল আমারই গ্রীষ্মাবাস—শিরোহীরাজের গ্রীষ্মাবাস।

বাড়ীটা যে কোন রাজারাজড়ার হবে তা অনুমান করেছিলাম, তবে ইনিই যে নৃপতি তা কল্পনাও করি নি। অভিবাদন নয়, একটু সম্ভ্রমসূচক গাত্রোত্থানের প্রচেষ্টা করে বললাম, What a pleasant surprise, Your Highness!

বন্ধুও ঐ রকম কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মহারাজ বলে

উঠলেন, I am no less happy,—তারপর হেসে একটু অন্য সুরে, আপনাদের (ইংরেজী 'you') কাছে ক্ষমা না চাইলে আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটত।

ঠিক বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছি দেখে মহারাজ বিষয়টির ব্যাখ্যা করলেন : কাল সন্ধ্যায় আপনাদের ঐ স্যুইট থেকে বিতাড়ন করার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছিল না। দোষ অবশ্য আমার নয়, হোটেলের ঐ ম্যানেজারের, কিন্তু আমার জন্তেই ত হল। তাই ভাবছিলাম আপনাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা আমার কর্তব্য···ভালই হল এখানে দেখা হয়ে গেল।

উক্তির উহ্য অংশটুকু অনুমান করে নিলাম। দুঃখপ্রকাশের জন্য মহারাজ আমাদের ডেকে পাঠাতে পারছিলেন না, আবার ওঁর পক্ষেও স্বয়ং আমাদের কাছে আসা ছিল অসম্ভব। তাই লনে দেখা হয়ে ভালই হল। কিন্তু আমাদের চিনলেন কি করে?

কৌতূহল অনুমান করে কি-না জানি না, মহারাজই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন, শুনলাম দু-জন বাঙালী ভদ্রলোককে আমার ঐ স্যুইট দেওয়া হয়েছে,—মহারাজ 'আমার ঐ স্যুইট' অংশটির ওপর বেশ জোর দিলেন,—আর এখন দেখলাম দু-জন বাঙালী বলেই মনে হয় ভদ্রলোক এইদিকে আসছেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

বন্ধু এবার প্রশ্ন করলেন, ইওর হাইনেস্। স্যুইটটা কি আপনার জন্য রিজার্ভ করা ছিল?

—না, রিজার্ভ করা ছিল বললে ভুল হবে, সব সময়ই রিজার্ভ করা থাকে।

চুপ করে রইলাম। মনের অবস্থা অনুধাবন করেই মহারাজ বললেন, মনে হচ্ছে আপনাদের এখনও কিছু কৌতূহল আছে। আচ্ছা, সেই গল্পই করা যাক্। জানি না আপনাদের ভাল লাগবে কি-না।

শুরু করতে শিরোহীরাজের বেশ কিছুক্ষণ লাগল, একবার মনে হল যেন অতীতে চলে গেছেন, আর-একবার মনে হল কতটুকু বলবেন তা ভেবে নিচ্ছেন। তবে শুরু যখন করলেন তখন আর থামলেন না, তাঁকে মন উজাড করে দিতেই আগ্রহী বলে মনে হল। হেমন্তের সকালের মনোরম আবহাওয়ায় আবু হোটেলের লনে বসে একদা রাজপুতানার ('রাজস্থান' নামকরণ হয় পরে) এক দেশীয় নৃপতির যে কাহিনী শুনেছিলাম তা এই জনগণতান্ত্রিক যুগের মূল্যায়নে উদ্ধৃত বা মুদ্রিত হবার দাবি নিশ্চয়ই রাখে না। আমার কাছে কিন্তু তা অব্যক্ত বেদনারই দ্যোতক বলে মনে হয়েছিল। তাই কাহিনীটি উদ্ধৃত করলাম।

আবুতে এই গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করেছিলেন মহারাজের পিতামহ। প্রচলিত প্রথা অনুসারে এর নাম ছিল শিরোহীরাজ প্রাসাদ। এখানে রাজস্থানের অনেক নৃপতিরই গ্রীষ্মাবাস আছে। আবুতে গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করা তদানীন্তন রাজপুতানার রাজাদের ছিল একটা রীতি বা ফ্যাসন। তবে অনেকের আবার আবুর সংগে মুসুরী সিমলাতেও গ্রীষ্মাবাস ছিল। শিরোহীরাজবংশ কিন্তু একেশ্বরীবাদী। অন্তত তিন পুরুষ ধরে কোন মহারাজা একটির বেশী নারীকে রাণীর মর্যাদা দেন নি, আর আবু ছাড়া অন্য কোন পাহাড়ে গ্রীষ্মাবাস নির্মাণের কল্পনাও করেন নি। সমতলভূমির গর্মি যখন পাখার হাওয়ায় ও শরবতে কমত না তখন তাঁরা ঠাণ্ডা হতে আবু পাহাড়েই ছুটে আসতেন। যে স্যুইটে আমরা প্রথমে উঠেছিলাম সেইটেই ছিল মহারাজের নিজস্ব স্যুইট বা খাসমহল। ছেলেবেলায় পিতামহের সংগে বর্তমান মহারাজ যখন আবুতে আসতেন তখন তাঁকে থাকতে হত মাত্র একটা ঘরে, ভৃত্যতন্ত্রের অধীনে।

তারপর তাঁর পিতা যখন গদিতে বসলেন তখন বিবাহিত ও যুবরাজ হিসাবে অভিষিক্ত বর্তমান মহারাজ একটা স্যুইট পেলেন, এবং নৃপতি হিসাবে তাঁর পিতার জন্য নির্দিষ্ট হল ঐ খাসমহল, যা কালক্রমে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে, আমাদের মহারাজের দখলে এল।

ছেলেবেলা থেকে আবুতে যাতায়াত অভ্যাস, ফলে এই শৈলাবাসের সংগে মহারাজের কেমন একটা ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছিল। একটু একঘেয়ে লাগলেই তিনি এখানে চলে আসতেন—অধিকাংশ সময় মহারাণী সহ, কখনও বা একাই। সেইজন্যে এই গ্রীষ্মাবাসের সকলেই সব সময়েই তৈরি থাকত।

বিশেষ উপলক্ষে অন্যান্য নৃপতিরাও সদলবলে আসতেন। পোলো টুর্নামেন্টের সময় আবু পাহাড় রাজারাজড়ায় ভরে যেত। এখন যেখানে পুলিস প্যারেড্-গ্রাউণ্ড সেখানেই হত পোলো টুর্নামেণ্ট। র্যাম্পার্টের ওপর বসতেন যোধপুর বিকানীর ইত্যাদি, আর তাঁদের পাশেই আসন ছিল আমাদের শিরোহী-মহারাজের। সম্মানে তোপধ্বনির সংখ্যা কম হলেও আভিজাত্যে শিরোহীবংশ কোন অংশে ন্যূন নয়। টুর্নামেণ্ট ইত্যাদিতে শিরোহী-মহারাণী বসতেন জয়পুর-যোধপুরের মহারাণীদের পাশেই।

মহারাজ নিজে ভাল খেলোয়াড় নন, তবে জয়পুর দলে বারকয়েক খেলেছেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জয়পুর-মহারাজা টুর্নামেণ্টের অধিকাংশ সময় থাকতেন স্যাড্ল্-এ, না-হয় ম্যালেট্ হাতে মাঠের চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন।

আবুতে শিরোহী-মহারাজ মোটরের চেয়ে ঘোড়া চড়াই বেশী পছন্দ করতেন। ঘোড়ায় চেপে সারাদিন চলে যেতেন সান্‌সেট-পয়েণ্টে, কোন দিন বা নাকী লেকে, কোন দিন বা অচলগড়ের ধারে।

তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য নৃপতিরাও অশ্বারোহণ শুরু করতেন—পোলোর জন্য ঘোড়া ত ছিলই। সকালে নাকি লেকের চারধারে চক্কর দেয়া সকলের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। একবার ভাইস্‌রয় লর্ড লিনলিথ্‌গো এসেছিলেন বিকানীরের অতিথি হিসাবে। শিরোহী এবং অন্যান্য মহারাজ দেখেন যে তিনি আর বিকানীর ঘোড়ায় চেপে নাকীতে এসে হাজির। ভাইস্‌রয়ের পেছনে এড্‌-ই-কং প্রভৃতিরাও অশ্বপৃষ্ঠে। সে এক দৃশ্য!

উদয়পুরের মহারাণারা কখনও দিল্লী যেতেন না, রাণা প্রতাপের সময় থেকে তা নিষেধ, কিন্তু তাঁরা আবুতে আসতেন। মহারাণা এলে আবুতে উৎসবের জোয়ার বয়ে যেত। আমাদের শিরোহীরাজ কয়েক বার এই উৎসবের সময় আবুতে উপস্থিত ছিলেন।

তারপর একদিন ভারত হল স্বাধীন, মহারাজদের রাজ্যপাট গেল। সংগে সংগে অনেকেই আবুর পাট তুলে ফেললেন। কেউ বা প্রাসাদ বিক্রি করলেন, কেউ বা দিলেন ভাড়া। অংশীদারী ভিত্তিতে কয়েকটি প্রাসাদে হোটেলও খোলা হল।

শিরোহী-মহারাজের কিন্তু এই বানিয়াবৃত্তি মোটেই ভাল লাগল না, রাজপুত-নৃপতি হয়ে হোটেল চালানোর চিন্তাও তাঁর কাছে পীড়াদায়ক ছিল। অপর দিকে আবার এই প্যালেস নিয়ে কি করবেন, তাও ভাবনা। বিক্রি হয়ত করা যেত, তদ্বির করে সরকারকে গছিয়ে দিয়ে ভাল দামও হয়ত পাওয়া যেত, কিন্তু আবুর গ্রীষ্মাবাসের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে বড়ই কঠিন হল। সরকারের কাছ থেকে ভাড়া নেবার প্রস্তাবও এসেছিল, তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। সরকারী অফিস করলে প্যালেসের আর কিছুই থাকবে না। অনেক ভেবেচিন্তে হোটেলের জন্যই লীজ দেওয়া ঠিক করলেন। লেসিও জুটে গেল। চুক্তি হল মহারাজের খাসমহল মহারাজের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে, সেখানে কোন বোর্ডার ঢোকানো চলবে না। এর জন্যে মহারাজ অনেক কম ভাড়াই নেবেন।

স্যুইট রিজার্ভ থাকলেও মহারাজের আসা অনেক কমে গেছে, মহারাণী ত আদতেই চান না। মহারাজ যখন আসেন আগে থেকে খবর দেন, ঝাড়ামোছা

হয়ে স্যুইট তৈরি থাকে। এবারও টেলিগ্রাম করেছিলেন ; ম্যানেজার বলে এখনও পৌছোয় নি—বোধহয় ডাক-বিভাগের কৃপায়। না পৌছোন বোধহয় ভালই হয়েছে। সন্দেহ ছিল হোটেলওয়ালা লুকিয়ে তাঁর স্যুইটখানা বোর্ডারদের দিয়ে থাকে। এখন দেখলেন সন্দেহ অমূলক নয়। এবার থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। · তবে আমাদের যখন কোন দোষ নেই, আমাদের বিতাড়িত করায় মহারাজ দুঃখিত। ·

কাহিনী শেষ করে মহারাজ থামলেন, আমরাও নির্বাক। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আবাব শুরু করলেন। এবার কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আমাদের মুখের দিকে নয়, উঁচুতে জয়পুর প্যালেসের দিকে। অনেকটা যেন স্বগতোক্তি করে চলেছেন : একবার ভাবছি কেন এই মিথ্যা মোহ · সবই ত গেছে···প্যালেস হয়েছে হোটেল ···এই আবুতেও আসতে হয় একরকম ছদ্মবেশে···শিরোহী-নেমপ্লেটওয়ালা গাড়ীতে আসতে চাই না, পাছে লোকে চিনে ফেলে। ··পুরোনো লোক অবশ্য বেশী নেই, তবুও আতংক কার সংগে কখন দেখা হয়···ভয়ে বেড়াতেই বেরোই না ···তাই ভাবছি স্যুইটা ছেড়ে দেব—পুরোপুরি বানিয়া বনে যাব···। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহারাজ শেষ করলেন।

আবহাওয়াটা অস্বস্তিকর লাগছিল, কাটাবার জন্যেই জিজ্ঞাসা করলাম, এবার ক-দিন আছেন, ইওর হাইনেস্ ?

জবাব না দিয়েই অন্যমনস্কভাবে মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও সম্ভ্রমসূচক গাত্রোত্থান না করে পারলাম না। আমাদের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে অভিভূতের মত মহারাজ হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন।

বিকালে বেড়াতে যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমেই দেখি গাড়ীবারান্দার তলায় একখানা আধ-পুরোনো প্রাইভেট গাড়ীতে মহারাজ বসে, গাড়ীর ছাদে কিছু মালপত্র তোলা। সামনে একজন খাঁকি পোশাক-পরা লোক। বোধহয় নিজস্ব ভৃত্য—রক্ষীও হতে পারে। বুঝলাম মহারাজ চলে যাচ্ছেন। আমরা গাড়ীবারান্দায় পৌছোবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

পথেই আবার মহারাজের দেখা পেলাম। দেখলাম আমাদের হোটেলের

রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক্-পুলিস মহারাজের গাড়ী রুকেছে। আবুতেও ট্রাফিক্-পুলিস আছে নাকি? আর গাড়ীর ভিড় যখন নেই—তখন এতক্ষণ রোকা কেন?

ব্যাপারটা বুঝলাম অল্পক্ষণ পরেই। জাতীয় পতাকা উড়িয়ে একখানা গাড়ী, আর তার পেছনে পেছনে অনেকগুলো গাড়ী নিচে থেকে এসে গেল পুলিস প্যারেড্-গ্রাউণ্ডের দিকে। তারপর ট্রাফিক্-পুলিসটি মহারাজের গাড়ীকে যাবার ইংগিত দিলে।

পুলিসটির কাছেই জানলাম, রাজস্থানের পুলিস-মন্ত্রী এসেছেন কোন এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে, তাই ছিল এই ট্রাফিক্ রেগুলেশনের ব্যবস্থা।

অদূরে পুলিস প্যারেড্-গ্রাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে মহারাজের মুখে শোনা বিগত দিনের সেই পোলো টুর্নামেণ্টের কথা কানে বাজতে লাগল···যোধপুর বিকানীর, ম্যাড্ল্-এ জয়পুর······।

অতীত থেকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করতে হল। দেখলাম পুলিস-মন্ত্রীর গাড়ী মাঠের মাঝখানে এসে থেমেছে, আর গাড়ী থেকে অভ্যর্থনা করে নামাবার জন্যে কর্মকর্তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেই দিকে ছুটছেন।
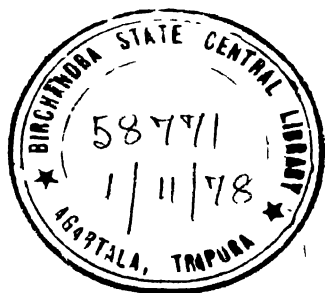
অথ পানীয়ঘটিত ১

মাতৃবন্দনার এক নূতন রূপের সংগে পরিচয় ঘটল শিলং-এর সেণ্ট্রাল হোটেলে। পূজারী হলেন দত্তসাহেব। তিনি আমাদের কাছে দত্তসাহেব নামেই পরিচিত, পুরো নাম—এমনকি আদ্যক্ষরও—সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। দত্তসাহেবের রজন এবং তার্পিন তেলের কারবার। আসাম সরকারের কাছ থেকে তিনি পাইন বাগান জমা নিয়ে থাকেন। এজন্যে প্রায়ই তাঁকে শিলং আসতে হয়।

আমাদের কাছে অবশ্য দত্তসাহেবের পরিচয় সম্পূর্ণ পানীয়ঘটিত এবং এই পরিচয় পেয়েছিলাম প্রথম সাক্ষাতেই।

শিলং-এ পৌঁছেছিলাম বিকেলবেলা। অক্টোবর মাস হলেও সেদিন সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই সামান্য একটু ঘুরে এসেই দুই বন্ধুতে খাটে শুয়ে দুখানা সাহিত্য-পত্রিকা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ শুনলাম পর্দা-ফেলা দরজার বাইরে টোকা, আর সংগে সংগে অনুমতি প্রার্থনা : ভেতরে আসতে পারি?

অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকলেন পাজামা-পাঞ্জাবীর ওপর চাদর-জড়ানো এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। ঢুকে ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করে 'স'-প্রধান খাঁটি কলকাতার ভাষায় বললেন, স্তনলাম আপনারা দু-জনে সিলং বেড়াতে এসেছেন।

উক্তির কোন তাৎপর্য বুঝলাম না। ভদ্রলোক কি কোন কিছু যাচাই করতে চান? হলে কি যাচাই করতে চান—সত্যিই দু-জনে এসেছি কিনা, না বেড়াবার উদ্দেশ্যে শিলং এসেছি কিনা? পুলিসের লোক নাকি?

মনে এইসব প্রশ্ন উদয় হলেও ভদ্রতার খাতিরে ঘরের একমাত্র চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসুন।

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, আপনারাই আমার ঘরে আসুন না কেন, গপ্পসপ্প করা যাবে। আমি আপনাদের ডাকতেই এসেছি, বুঝলেন না।

এইবার আমার বন্ধু কথা বললেন, আপনি কত নম্বর ঘরে থাকেন ?

—এই পাসের ঘরেই—সোল নম্বর।

তাহলে ষোল নম্বর ঘরের বাসিন্দা, পুলিসের লোক বোধহয় নয়—আশ্বস্ত বোধ করলাম।

—তাহলে আপনারা আসুন, বলে ভদ্রলোক নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

কোন অভিজাত হোটেল নয়, সুতরাং পোশাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে সতর্ক হবার কিছু নেই। আমরাও একটা করে র‍্যাপার জড়িয়ে ভদ্রলোকের ঘরে গেলাম। দরজায় টোকা দিতেই সেই পরিচিত কলকাতার ভাষায় সাদর অভ্যর্থনা শুনতে পেলাম, আসুন, আসুন ··।

ভদ্রলোকের ঘরের সজ্জা আমাদের ঘরের সজ্জা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আয়তনে সমান হলেও ঘরে দুখানিব পরিবর্তে একখানি খাট। ফলে যে জায়গা বেঁচেছে সেখানে একখানি গোলটেবিল ঘিরে চারখানা চেয়ার। এককোণে ড্রেসিং টেবিল, অপর কোণে একটি আলমারি—ওয়ার্ডরোব্ নিশ্চয়। তার ওপর আবার সারা মেঝেয় পশমের কার্পেট পাতা। মোটকথা, একজনের জন্য বেশ সুসজ্জিত ঘর।

আমাদের ঘরে দুখানি খাট ঢোকার জন্যে গোলটেবিল ও ওয়ার্ডরোবের স্থান হয় নি। তবে স্থানাভাবের দরুন ঘরে নয়, লাগোয়া বাথরুমে অপরিহার্য একখানা ড্রেসিং টেবিলও রাখা আছে। ঘরে অবশ্য কার্পেট আছে, তবে তা দড়ির।

ভদ্রলোক তাঁর বিছানায় বসেছিলেন। আমরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন একেবারে টেবিলে গিয়েই বসা যাক্।

'একেবারে' শব্দটির অর্থ বুঝলাম না। ভদ্রলোক কি তাস খেলার কথা বলছেন ? খানিকক্ষণ তাস খেললে মন্দ হত না, সময়টা কাটত। তবে তিন জনে কি খেলা ? তিন হাতের কোন জুয়াখেলা নাকি ?

চিন্তায় ছেদ পডল ভদ্রলোকের কথায়—বসুন, আরও একজন আসছেন, একুস নং ঘরে থাকেন।

তবে জুয়াখেলা নাও হতে পারে। বোধহয় চার জনের অক্‌সান বা কনট্রাক্‌ট্ ব্রীজ। আমাদের দু-জনের কেউই খুব পারদর্শী নই, তবে চালিয়ে দিতে পারব।

হঠাৎ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ঘরে তালা দিয়ে এসেছেন ত ? এখানকার সালারা যা চোর !

—বলেন কি মশাই, কারা চোর ?—আমার বন্ধুর প্রশ্ন।

—কে চোর নয় মসাই ?—ভদ্রলোকের প্রতিপ্রশ্ন।

চৌর্যপ্রসংগ আপাতত চাপা পড়ল ২১নং ঘরের ভদ্রলোকের আবির্ভাবে। নতুন ভদ্রলোক পুরো সাহেবী-পোশাকে সজ্জিত। আমাদের চার জনের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় হল। ১৬ নম্বরের ভদ্রলোক যাঁর ঘরে আমরা উপস্থিত—হলেন মিঃ দত্ত, আর ২১ নম্বর থেকে আগত ভদ্রলোক হলেন ডাঃ কুণ্ডু। দত্তের সঙ্গে ডাক্তার কুণ্ডুর পরিচয় দেখলাম বেশ ঘনিষ্ঠ। ডাঃ কুণ্ডু দত্তকে 'দত্তসাহেব' বলে ডাকেন, আর ডাক্তার কুণ্ডুকে দত্ত ডাকেন শুধু 'ডাক্তার' বলে। তবে সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' পরিণত হয় নি। দত্তসাহেব এসেছেন কলকাতা থেকে, আর ডাঃ কুণ্ডু সীলেট থেকে। ডাক্তার ভদ্রলোক বেশ রসিক ; বললেন, পাসপোর্ট-ভিসা লইয়া ফরেন টুর-এ আইচি, বুঝল্যান ?

পরিচয়পর্ব সমাপ্ত হবার আগেই দত্তসাহেব বলে উঠলেন, এবার শুরু করা যাক্, কি বলুন ডাক্তার ?

—নিচ্চয়, সাত্‌ডা ত বাজে, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার উত্তর দিলেন।

ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না, তাসখেলা কি কোন বিশেষ ক্ষণে শুরু করতে হয় ! তবে বুঝতেও দেরী হল না।

ডাক্তারের সম্মতি পেয়ে দত্তসাহেব উঠে ওয়ার্ডরোব্ খুললেন। হ্যাঁ, ওয়ার্ডরোব্ সন্দেহ নেই, আবার পানীয়াধারও বটে—তার তলায় ঝুলছে জামাকাপড়, আর ওপরের তাকে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন আকারের শিশিবোতল। একবার দৃষ্টিপাত করেই বুঝলাম যে দত্তসাহেবকে বলা যায় keeps a good cellar। তাকিয়ে দেখি আমার বন্ধু মুখব্যাদান করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। ইংগিতে তাঁকে সহজ হতে বলে আমিও নিজের বিস্ময়ের ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করলাম—দেখা যাক্, ব্যাপার কতদূর গড়ায়।

ধীরে ধীরে দত্তসাহেব টেবিলের ওপর চারটে চ্যাপ্টা শিশি, চারটে গ্লাস এবং একটা জুটো বোতল রাখলেন। তারপর চেয়ারস্থ হয়ে মন্তব্য করলেন : এ হোটেলে বার নেই কিনা, তাই সব বন্দোবস্ত নিজেকেই করতে হয়। আর কি জানেন, বার-এর চেয়ে ঘরে বসে ড্রিংক করা অনেক বেসি মজার, তবে দু-জন বন্ধুবান্ধব না থাকলে ঠিক যাকে বলে জমে না, সেইজন্তেই ত আপনাদের ডেকে আনলুম···একা ডাক্তার আর আমি রোজ রোজ মুখোমুখি বসে·· nasty ! —দত্তসাহেবের মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠল।

এই অবস্থায় কি বলা যায় যে আমরা ও রসে সম্পূর্ণ বঞ্চিত? তাই চুপ করে বসে রইলাম।

একটা শিশি হাতে নিয়ে দত্তসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, বিচিত্র কৌশলে হাত দিয়ে ঘুরিয়েই তার ছিপি খুললেন। তারপর বিশেষ দিকে মুখ করে শিশি থেকে মেঝেয় একফোঁটা করে পানীয় ফেলে 'মা' বলে চীৎকার করতে লাগলেন। মোট তিন বার—মেঝেয় তিন ফোঁটা পানীয় ফেলা আর তিন বার 'মা' বলে ডাকা।

নিবেদনকার্য সমাপ্ত করে চেয়ারে এসে বসে দত্তসাহেব বললেন, আরম্ভ করুন। ইতিমধ্যে তিনি গেলাসে পানীয় ঢেলে দ্রবণ মেশাতে শুরু করেছেন এবং ডাক্তারও ছিপি খুলে তৈরি হয়েছেন।

হঠাৎ দত্তসাহেবের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়ল: আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দত্তসাহেবের প্রশ্ন। এবার ব্যাপারটা জানাতে হল। দত্তসাহেব বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। সামলে নিয়ে ক্ষোভের সংগে বললেন, তবে স্যার, আপনারা এলেন কেন?

উত্তরে আমার বন্ধু চটেই বললেন, আপনি ত বলেন নি যে এইজন্যে ডাকছেন, বললেন গল্পসল্প করা যাবে, তাই এসেছিলাম। যাহোক চলে যাচ্ছি।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে দত্তসাহেবের অনুতাপের সীমা নেই। বারবার বলতে লাগলেন, সরি, ভেরী সরি। আমারই দোস, আমারই দোস!—অনুতাপের পালা শেষ হলে সমস্যা উত্থাপন করলেন, কি করা যায় বলুন`ত? সফ্ট্ ত আমার কাছে কিছু নেই, ভদ্রলোকদের ত ফর্ নাথিং সোডা খেতে বলা যায় না।

সমাধান অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই খুঁজে পেলেন: আপনারা তাহলে চা বা কফি খান। সুধুসুধু বসে থাকা কি ভাল দেখায়?

সম্মতি দিলে দত্তসাহেব উঠে কলিং বেল টিপলেন। তাঁর ঘরে কলিং বেলও আছে দেখলাম।

আমাদের চা তখনও আসে নি কিন্তু ওঁদের উদরে খানিকটা পড়েছে এহেন সময় দত্তসাহেব বলে উঠলেন, বুঝলেন ডাক্তার, এইসব নিরিমিস ভদ্দরলোকদের দেখলে আমার এক আসীর্বাদের নেমন্তন্নের কথা মনে পড়ে। আমারা সবাই চপ-কাটলেট-ফ্রাই ওড়াচ্ছি, আর ওধারে পুরুতমসায় বসে কলা-সাঁকালু চিবোচ্ছে। —তারপর আমাদের দিকে চেয়ে, আমি মসাই, পুরোপুরি নন্‌ভেজ......বে-থা করি নি কিন্তু তাই বলে ত আর স্বামী বিবেকানন্দ নই...।

বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকতে দত্তসাহেবের আত্মবিশ্লেষণে ছেদ পড়ল। সে চলে গেলে কিন্তু তাঁর পরিবর্তে ডাক্তারই মুখ খুললেন: হোটেলটা বালো, বেশ তাড়াতাড়ি সার্ব করে, —সিলেটি ভাষাতেই মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

—ভালো ?—দত্তসাহেবের প্রতিবাদ, ভালো কোথায় দেখলেন মশায় ? এক নম্বরের চোর।

—চুর ?—ডাক্তার প্রতিবাদ মেনে নিতে রাজী নন। শিলং-এর বেইস্ট হোটেল, বেশ জোরের সংগেই বলেন।

—বেইস্ট হোটেল !—দত্তসাহেব বিদ্রূপ ঢেকে রাখবার কোন চেষ্টাই করলেন না, সিলং-এর সব হোটেলই তুমি দেখেছ নাকি ডাক্তার ?—অজান্তে দত্তসাহেব আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছেন।

উত্তরে ডাক্তারের সম্পূর্ণ সমর্পনের স্বর, তা আর দ্যাখলাম কোথায় বলেন ? এই ত পেরথম্ বারই আইলাম।—মনে হল হঠাৎ যেন ডাক্তার বুঝতে পেরেছেন যে দত্তসাহেবের সংগে চটাচটি করা ঠিক হবে না।

দত্তসাহেবের স্বরও নরম, বললেন, স্বীকার করলেন ত ?···আমি সালা ফি মাসেই সিলং আসি, আর আমাকে চেনাচ্ছেন এখানকার হোটেল ? মার কাছে মাসীর বাড়ীর গল্প !—এবার ডাক্তার একেবারে চুপ। লক্ষ্য করেছিলাম যে দত্তসাহেব আবার 'আপনি'তে উঠে গেছেন।

গ্লাসের অর্ধেকটুকু খালি করার পর দত্তসাহেব যেন সচেতন হলেন যে আমরা নীরব দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে বসে আছি। দুঃখ প্রকাশ করলেন, আপনাদের সংগে ভাল করে আলাপ করাই হল না। ডাক্তার যা এঁড়ে তক্ক জুড়ে দিলে !

এবারও ডাক্তারের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ নেই—তিনি গ্লাসেই মগ্ন।

রসিয়ে একটা চুমুক দিয়ে দত্তসাহেবই শুরু করলেন: ডাক্তার এসেছে পাকিস্থান থেকে সিলং বেড়াতে, আর আমাকে ফি মাসেই সিলং আসতে হয়। আমি আসাম গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাইন গাছ জমা নিই। আমার ব্যবসা হল রেজিন আর টারপেন্টাইনের অয়েলের। সোয়ালো লেনে আমার অফিস। প্লেনে যাই আসি মসাই, আর ডাক্তার হয়ত কখনো প্লেনেই চাপে নি। এখানকার সব হোটেলেই থেকেছি, আর ডাক্তার বলে কিনা এটা বেস্ট হোটেল। এক নম্বরের চোর মসায়। সেবার আমার একজোড়া নতুন জুতোই হাওয়া।

এবার কিন্তু ডাক্তারের দত্তসাহেবকে পুরো সমর্থন, তা যা কইছেন, দত্তসাহেব। পনের টাকা কইরা নেয়, আর কিই বা খাইতে দেয়!

—আর কি খেতে দেবে?—দত্তসাহেবের প্রতিবাদ, তারপর মন্তব্য, এ ত আর দানছত্তর নয় মসাই—ব্যবসা!

—যাই বলেন কিন্তু এক নম্বরের চুর,—ডাক্তারের স্বর বেশ জড়ানো। আরও এক চুমুক দিয়ে দত্তসাহেব তাকালেন ডাক্তারের দিকে, যেন কিছু বোঝবার চেষ্টা করছেন। তারপর ভূয়োদর্শীর মত বললেন, চোর কে নয় ডাক্তার! প্রত্যেক বিজনেস্ম্যান্ই চোর,·· আপনি আমি সবাই চোর।···আপনি মিক্সচারের দাম বেশী করে ধরেন না, একটা ওষুধ লাগলে তিনটে প্রেস্ক্রাইব করেন না?

ডাক্তার কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাঁর গ্লাস ও শিশি দুইই খালি হয়ে গিয়েছিল, তা লক্ষ্য করে দত্তসাহেব বললেন, নিরিমিস ভদ্রলোকদের সিসি-দুটো ত টেবিলেই রয়েছে, একটা খুলুন। লজ্জা কিসের?

ডাক্তার যেন অনুমতিরই অপেক্ষা করছিলেন। বলার সংগে সংগেই একটা শিশি খুলে নিজের গ্লাসে খানিকটা ঢাললেন। দত্তসাহেবের গ্লাসে তখনও খানিকটা আছে। ইংগিতে লাগবে কিনা, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ইংগিতেই না করলেন।

আর-এক চুমুক দিয়ে দত্তসাহেব প্রসংগান্তরে উপনীত হলেন: আচ্ছা ডাক্তার, আপনি কত জমিয়েছেন জানতে পারি?—অসংগত প্রশ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু ডাক্তারের কোন বিরক্তির ভাব দেখা গেল না। ঐ অবস্থায় যতটা স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব ততটা স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন, জমাইলাম আর কৈ? কিছু ইন্সিওরেন্স আছে মাত্তর। তা ও কথা জিগাইলেন ক্যান?

—যে রেটে চালাচ্ছেন, সেইজন্যেই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—বুঝি না, ডাক্তারের উক্তি।

—বোঝবার কি আছে? ঐ রেটে মাল টানলে কত দিন এই ধরাধামে টিকবেন? তা, ইন্সিওরেন্সের টাকাটা কে পাবে শুনি—মানে নমিনি কে?

ডাক্তার শুধু শেষ প্রশ্নটির উত্তরই দিলেন, নোমিনিটোমিনি নাই, টাকা পাইব আমার ওয়াইফ্ আর পোলাপান।

—আমার ওয়াইফ্ও নেই, পোলাপানও নেই, দত্তসাহেবের সহাস্য উক্তি,—আর আমার জমানো টাকাও নেই, লাইফ ইন্সিওরেন্সও নেই। তবে কি জানেন, প্রত্যেক বারই ফ্লাইট ইন্সিওরেন্স করি, আর প্রত্যেক বারই করি নতুন নতুন নমিনি

—ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্‌নে, ভাগ্‌নী, দেখি কার ভাগ্যে লাগে। এবার ভাবছি ডাক্তারের নামেই করব।···ডাক্তার আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন ত।

ডাক্তারের তখন তুরীয় অবস্থা, তবুও কিছুটা জ্ঞান আছে, হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, আটটা বাইজ্যা গ্যাছে, খাবার ত লইয়া আইল না।—ডাক্তার বোধহয় রাত্রে দত্তসাহেবের সংগেই খান।

দত্তসাহেব দেখলাম খাবারের প্রসংগ ভোলেন নি, বললেন, কি আর খাবেন ডাক্তার? যা খেতে দেয়!

জড়িতকণ্ঠে ডাক্তার বলেন, না, বালোই দেয়। পনের টাকায় কি আর রাজভোগ দিব?

কেমন একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। রোজই সন্ধ্যায় দত্তসাহেবের ঘরে বসে দু-জনের অভিনয় দেখি। দিন চারেক পরে ডাক্তার কুণ্ডু চলে গেলেন। সেদিন আমরা তিন জন বসে আছি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে দত্তসাহেব বললেন, ডাক্তার চলে গেল। আমাকে আরও দু-তিন দিন থাকতে হবে, কিন্তু আর ভাল লাগছে না।

আমরা চুপ করে রইলাম। নীরবতা ভংগ করে দত্তসাহেব বলে উঠলেন, আপনাদের ঠিকানাটা দেবেন ত।

—ঠিকানা নিয়ে কি করবেন?—বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন।

—ভাবছি ফ্লাইট ইন্সিওরেন্সের নমিনি আপনাদেরই করব। এই ক-দিনে আপনাদের ওপর কেমন একটা মায়া জম্মে গেছে। চুপ করে বসে ড্রিংক করা দেখেন।···অদ্ভুত লোক মাইরি আপনারা।

—কিন্তু আত্মীয়স্বজন থাকতে আমাদের নমিনি করবার কথা ভাবছেন কেন? —আমি জিজ্ঞাসা করি।

—আর মসাই, ভাইপো ভাইঝি ভাগ্‌নে কোন বেটাবেটীর ভাগ্যেই ত লাগল না। প্রত্যেক বারই দিব্যি সেফলি ল্যাণ্ড করি। দেখি যদি আপনাদের ভাগ্যে লাগে······না ডাক্তারটা চলে গেল।—এবার দত্তসাহেব মাটিতে ফোঁটা না ফেলেই 'মা' 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে উঠলেন।

অথ পানীয়ঘটিত ২

লামা বসেছিল আমাদের সামনে জানলার ধারের সীটে—অর্থাৎ ঠিক আমার সামনের সীটে। তার সীটটা আবার ড্রাইভারের ঠিক পেছনে। সে যে হিন্দি বোঝে তা আমরা ধারণাই করতে পারি নি। নাথুলার রাস্তা তখনও খোলা, তবে তিব্বত-ভারত বাণিজ্য শেষ হতে চলেছে। কোথা থেকে সে আসছে, এইটুকুই জানবার জন্যে লামার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলাম গ্যাংটকের বাস্‌স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু হিন্দিতে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে দুর্বোধ্য তিব্বতী ভাষা ব্যবহার করার সংগে সংগেই প্রচেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়েছিলাম। এইটুকু মাত্র বুঝেছিলাম যে সে দার্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলের লামা নয়, খাঁটি তিব্বতী লামা—হয়ত নাথুলার পথেই তিব্বত থেকে এসেছে।

বাস্‌স্ট্যাণ্ডে লামা বারবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন কিছু সন্দেহ করছে। আমরা আলাপের চেষ্টা করাতে মনে হল সেই সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। বাসে মালপত্র তুলে উঠে বসবার পর সেও এল। তার সীটে বসবার সময় একজন পেছন ফিরে আমাদের দিকে তাকাল। তখন তার দৃষ্টিতে আর সেই সন্দেহের ছায়া নেই বলেই মনে হল।

আসবার সময় এই পথেই এসেছি; সুতরাং অপরিচিত পথের সৌন্দর্য উপভোগ করবার কোন আকর্ষণ নেই। মধ্যাহ্নভোজনের পর বাসের ঝাঁকানিতে চোখ দুটো জড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ধমকানির মত কানে আসতে তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। দেখি আমাদের সামনের সীটে লামার পাশে বসা লোকটি লামাকে ঠেলছে আর বলছে, এ কেয়া বাৎ? সিধা হোকে বৈঠো, লামা সা'ব্।

ঠেলা খেয়ে লামা সোজা হয়েই বসল। ভাবটা দেখালে যে নিদ্রাকর্ষণের ফলে পার্শ্বযাত্রীর ওপর পতিত হওয়াতে সে লজ্জিত। লজ্জার ভাব অবশ্য

বেশীক্ষণ রইল না। এবার আমি তাকিয়েই ছিলাম—তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়েছিল। দেখলাম কিছুক্ষণ ধরে লামার মস্তকসহ স্কন্দদেশ এদিক ওদিক সঞ্চালিত হতে হতে আবার লোকটির স্কন্দদেশে স্থাপিত হল। এবার লোকটি বেশ চটে উঠে 'ফিন' বলে লামাকে সজোরে ঠেলে দিলে। আবার চোখ তাকিয়ে মৃদুস্বরে লামা তার তিব্বতী ভাষায় কি বললে—বোধহয় দুঃখপ্রকাশ বা ক্ষমাপ্রার্থনা করলে। লামার পার্শ্বযাত্রী অবশ্য ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট হল না, সে সতর্ক করে দিলে লামা যেন আর ঢলামি না করে। তারপর স্মরণ করিয়ে দিতেও ভুলল না যে 'বস্‌' শয়নের জন্য নয়, গন্তব্যস্থানে পৌঁছুবার জন্য।

মনে মনে হাসলাম—লামা কি তার ভাষা কিছু বুঝতে পারলে? তবে মনে হল ভাবভংগি থেকে কিছু অনুমান করেছে। অনুমান যে করেছে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না যখন দেখলাম যে লামা পার্শ্বযাত্রীর পরিবর্তে বিপরীত দিকে জানলাতেই মস্তক রক্ষার প্রচেষ্টা করছে।

দু-একবার কাষ্ঠের সঙ্গে মস্তকের সংঘর্ষও হল, একবার বেশ জোরে। নিদ্রোত্থিত লামাকে মস্তকে হাত বোলাতেও দেখলাম। কিন্তু কি ঘুম তাকে পেয়েছিল জানি না, সে এবার বাতায়নকে উপাধান করে রীতিমত নিদ্রায় মগ্ন হল।

অদ্ভুত ক্ষমতা! বাসের ঝাঁকানিতে কাষ্ঠ থেকে মস্তক বারবার বিচ্যুত হলেও লামার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে হল না—সে যেন এতেই অভ্যস্ত। ফুটপাতে যারা ঘুমোয় তারা ত বটেই, এমনকি অনেক কৃচ্ছ্রসাধনকারীও লামাকে এ অবস্থায় দেখে রীতিমত ঈর্ষাবোধ করবেন। মনে একটা কৌতুহল জাগল: এই অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন-পদ্ধতিতে লামা অভ্যস্ত হল কি করে? সে কি নিয়মিত বাসে যাতায়াত করে?

বাস এসে থামল সিংটাম বাজারে। কমলালেবু ছাড়াও আর-একটা জিনিসের জন্য সিংটাম বিখ্যাত। সেটা হল কোহল। বাজারের অনেক দোকানে ইংরেজীতে-লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো: Famous Sikkim Brandy এবং তার তলার লাইনে: Not for sale in West Bengal। যাবার পথেও এইসব সাইনবোর্ড দেখেছি।

বাস থামতেই লামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। নামবার জন্যে সে কি ব্যস্ততা! লক্ষ্য করলাম সে একটা সাইনবোর্ড-লাগানো দোকানে গিয়ে ঢুকল। দেখলাম শুধু লামা নয়, আমাদের বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টারসহ আরও অনেকে অনুরূপ এ-দোকানে ও-দোকানে হাজির হল। আমরাও বাস থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। বাস এখানে মিনিট পাঁচেক থামে।

একে একে সবাই ফিরে এল। ড্রাইভার এল মুখ মুছতে মুছতে এবং লামা এল সবার পরে। লামার হাতে সিকিম ব্রাণ্ডির দুটো ভর্তি শিশি—দুটোকেই পাশাপাশি চেপে রেখেছে লামার লম্বা আঙুল। বুঝলাম যতটা পারা যায় উদরস্থ করার পরও সে পথের রসদ নিয়ে চলেছে।

লামার সীট ঠিক ড্রাইভারের পেছনে। সকলে ঠিক উঠেছে কিনা, কণ্ডাক্টারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে যেন ঠিক নিশ্চিন্ত হতে না পেরে ব্যাপারটি তদন্ত করবার জন্যে ড্রাইভার পশ্চাতে মুখ ফেরালে। দৃষ্টি কিন্তু পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে নিবদ্ধ হয়ে গেল লামার ওপর। লামার ডান হাত জানলার ওপর রাখা, আর সেই হাতে ভর্তি শিশি দুটো ধরা। ড্রাইভার ধমকে উঠল, তুম কা করতে হো, লামা। লে যানেসে রংপোমে পকড যাযগা। মেরে পাশ রাখ দো, উধার যাকে লেগা।—রংপো সিকিম ভারত সীমান্ত, অতএব উধার মানে ভারতে প্রবেশ করে।

—পকড যায়গা?—হিন্দিতেই প্রশ্নের আকারে পুনরুক্তি করে লামা হো হো করে হেসে উঠল,—তুম বড়া হুঁশিয়ার হো ডেরাইবর।

তবে ত লামা হিন্দি জানে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে না-বোঝার ভান করল কেন? সে কি···

চিন্তায় ছেদ পড়ল ড্রাইভারের প্রতিবাদে, হুঁসিয়ারিকি বাৎ কেয়া হ্যায়? হিঁয়াসে লে যানেসে বর্ডার মে জরুর পকড় যাও গে—হামি লোগ নিস্‌পেক্টরকো বাতায় দেংগে।

—তুমি লোগ বাতায় দেগা?—লামার অট্টহাসি চারপাশের পাহাড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হল।

অট্টহাসির রেশ মেলাতে না মেলাতে লামা একটা শিশি কোলের ওপর রেখে দাঁত দিয়ে অপরটার ছিপি খুলে ফেলল। তারপর 'পকড় যায়গা' বলে একবার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সবটা পানীয়ই একেবারে গলায় ঢেলে দিলে।

গলাধঃকরণ সমাপ্ত হলে সেই শিশিটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শোয়ানোটি তুলে নিলে। সেটারও অনুরূপ ব্যবস্থার পর ড্রাইভারকে 'ক্যা, বর্ডারমে বাতায় দেংগে?'—বলে শ্লেষোক্তি করে মেরুদণ্ডের ওপর সোজা হয়ে বসল।

ড্রাইভারের বিস্ময়ের পরিমাণ বোধহয় ছিল সবচেয়ে বেশী। সে বাস ছাড়তেই ভুলে গিয়েছিল। এইবার সে মুখ ফিরিয়ে স্টার্ট দিলে। মনে হল, মুখ ফেরাবার সংগে সংগে তার যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এবার লামার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোথায় সেই নিদ্রার ভাব? মেরুদণ্ডের ওপর ভর দিয়েই সে গুন্‌গুন্ করে গাইতে শুরু করলে। হয় হিন্দি, না-হয় নেপালী গান—ঠিক বুঝতে পারি নি।

ড্রাইভারকে কিন্তু যেন একটু বেসামাল বলেই মনে হল। পাহাড়ী রাস্তা। ড্রাইভারের অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতি বন্ধুব দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। দেখলাম সেও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। তবে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

লামাকে দু-একবার ড্রাইভারের দিকে তাকাতে দেখলাম। সেও কিছু সন্দেহ করেছে নাকি? সন্দেহ করবার ক্ষমতা কি তার আছে? যাহোক ভালয় ভালয় রংপো পৌছানো গেল। তখন বিকেল শেষ হতে চলেছে।

নদী পেরিয়ে ভারতীয় চেকপোস্টে নামধাম ইত্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়ে আমরা আবার বাসে চাপলাম। এবারও লামা এল সকলের পরে। বোধহয় তাকে কাগজপত্র দেখাতে হয়েছিল। সে তিব্বতের লোক নিশ্চয়। কিন্তু এই পথে যে ভারতে যাতায়াত করে তাতেও সন্দেহ নেই।

চেক্‌পোস্ট ছেড়ে বাস প্রথম বাঁক নেবার পরই লামা বলে উঠল, এ ডেরাইবর, ঠার্‌রো।

ড্রাইভার যেন ক্ষেপে গেল,—কেঁও? কেঁও ঠারেংগে? তুমরা নোকর হ্যায়? সিধা তিস্তা ব্রীজকা পাশ যা কর ঠারেংগে।

লামার সুর কিন্তু মধুমাখা—আউর থোড়া পি লেও ভেইয়া। তুমারা পুরি নেই হুয়া। উসি লিয়ে হাঁত কাঁপতা হ্যায়।'

সাধু প্রস্তাব। তবে ড্রাইভার ওর মধ্যে ফাঁক খুঁজে পায়, প্রশ্ন করে, হিঁয়া মিলেগা কাঁহা?

অপরিচ্ছন্ন দন্ত বিকশিত করে লামা আশ্বাস দেয়, মিলেগা।

বাস থামে। লামা তার লম্বা পরিচ্ছদ বা বাকুর মধ্যে হস্ত সঞ্চালন করে একটা শিশি বের করে ড্রাইভারের হস্তে সমর্পণ করে। মেঘলা কেটে গিয়ে ড্রাইভারের মুখে রৌদ্রোজ্জ্বল ভাব আর গোপন থাকে না। হাত তুলে সে একটা সেলামের ভংগি করে। তারপর লামার মতই দন্তের সাহায্যে ছিপিটা খুলে এক সংগে সমস্তটাই মুখে ঢেলে দেয়। খালি শিশিটা পাহাড়ের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে, স্টীয়ারিং-এ হাত দেবার আগে লামাকে জিজ্ঞাসা করে, আউর হ্যায়?—লামা ইতিবাচক ইংগিতই করে। তারপর সেও প্রশ্ন করে, পুরি নেহি হুয়া? একটু ইতস্তত করে ড্রাইভার বলে, বহুৎ মেহেরবানি, পুরি হো গিয়া। এইসি পুছা আউর হ্যায় কি নেহি হ্যায়।

—তব ঠিক হ্যায়। আভি ঠিকসে চালাও, বস্ গিরাও মৎ।— লামা নির্দেশ দেয়।

—গিরায়গা কেঁও লামা সাব?—হামরা বারা সাল হো গিয়া।—ড্রাইভার স্টার্ট দেয়।

আমরা কিন্তু এদিকে উত্তরোত্তর আতংকিত হচ্ছিলাম। সিংটামে সামান্য টেনেই ড্রাইভারের যদি ঐ অবস্থা হয়ে থাকে, তবে এখন আরও চড়ানোর ফল কি হবে কে জানে? তার ওপর সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এবার অন্ধকারে বাস চালাতে হবে!

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখলাম যে লামার অনুমানই ঠিক। লামা-প্রদত্ত দ্বিতীয় ডোজ পেটে পড়ার পর ড্রাইভার যেন আপনার সত্তা ফিরে পেয়েছে। অন্ধকারে সে এমন চালাতে লাগল যা তার পক্ষে দিনের বেলাতেও সম্ভব হয় নি।

অথ পানীয়ঘটিত ৩

মেহ্‌তা সাহেব আলাপী ভদ্রলোক, আর তাঁর ভদ্রতাও খানদানী। আসছিলাম ১২নং ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসে দিল্লী থেকে। একটা কুপের আপার বার্থ পেয়েছিলাম, লোয়ার বার্থটি সহযাত্রী আগে থেকেই অধিকার করেছিলেন। রেল-কর্মচারীর হাতের রিজার্ভেশন লিস্ট-এ এক চকিতে নামটা আগেই দেখে নিয়েছিলাম: কে একজন মেহ্‌তা। মালপত্র নিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক 'আইয়ে, আইয়ে' বলে অভ্যর্থনা করলেন। যেন কতকালের চেনা। মালপত্র গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে সহায়তা করার পর নিজেই আমার হোল্ড্‌অল খুলে বিছানা পাততে এগিয়ে এলেন। আমি নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা করাতে 'উসমে কেয়া হ্যায়?' বলে আমাকেই নিবৃত্ত করলেন। যাহোক দু-জনে মিলে আমার শয্যার ব্যবস্থা করার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, খানা খেয়ে এসেছি কিনা। ইতিবাচক উত্তর পেয়ে ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন, তাহলে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক্‌, নিশ্চয়ই ঘুম পায় নি। আর গাড়ী না ছাড়লে প্লাটফর্মের চেঁচামেচিতে ঘুমও আসবে না।

১০টার মধ্যে শয্যাগ্রহণ করতে আমি কোন দিনই অভ্যস্ত নই; সুতরাং গল্প করার প্রস্তাবে সায় দিলাম। পোশাক পরিবর্তন করে মেহ্‌তা সাহেবের পাশে বসবার পর তিনি শুরু করলেন: আপনাকে দেখেই আনন্দ হয়েছিল, কেন জানেন? একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যাওয়া যাবে। কুপেতে যাচ্ছি, যদি কোন খুনে-লুটেরা ওঠে।

জ্ঞানগর্ভ কথা। জানালাম যে তাঁর মত ভদ্রলোক সংগী পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত। কিন্তু মেহ্‌তা সাহেব যাবেন কতদূর? 'কলকাত্তা', শুনে বললাম, তা হলে ত দু-রাত্রি আর একটা পুরো দিন এক সংগে কাটানো যাবে।

আলাপ অগ্রসর হতে লাগল এবং ট্রেন ছাড়ার পরও চলল। গাজিয়াবাদ ছাড়ার পরেই আমি প্রস্তাব করলাম যে এবার ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক্‌। ট্রেনের ঝাঁকানিতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমার ঘুম আসছিল। মেহ্‌তা সাহেবও বুঝি একটু ক্লান্তি বোধ করছিলেন। সংগে সংগে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ঘুম আমার গাঢ়। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙল মেহ্‌তা সাহেবের কণ্ঠস্বরে : আপ্‌কো চায়।

কোন রকমে চোখ খুলে দেখি দণ্ডায়মান মেহ্‌তা সাহেবের করধৃত চায়ের পেয়ালা আমার দিকে প্রসারিত। মুহূর্তের মধ্যে ঘুম ছুটে গেল। সকাল হয়ে গেছে?—বাংলায় আমার প্রশ্নবাচক স্বগতোক্তি বুঝতে মেহ্‌তা সাহেবের অসুবিধা হল না, বললেন, জী, হ্যাঁ। কানপুর আ গিয়া। বেড-টী আপ্‌ নেই লেংগে?

বেড-টী আবার নিই না! কি বলে মেহ্‌তা সাহেবকে ধন্যবাদ দেব তাই ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধাতস্থ হয়ে ধন্যবাদের পালা শেষ করে তাঁর হাত থেকে কাপটা নিলাম।

কাপে চুমুক দিয়ে মেহ্‌তা সাহেব জানালেন যে দিল্লীতে তিনি কণ্ডাক্টারকে একটা প্রাতঃকালীন চা-ই দিতে বলেছিলেন, এখন কানপুরে বেয়ারাকে বলে আর-একটা কাপ জোগাড় করে নিয়েছেন। অনেকটা করে লিকার দুধ আর চিনি দেয়, দু-কাপ স্বচ্ছন্দে করা যায়।

বেয়ারার কাছ থেকে অতিরিক্ত কাপ চাওয়া হয়ত খানদানী ব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু সহযাত্রীর জন্য এইরকম দরদ যে উচ্চ পর্যায়ের বস্তু সে বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই। মেহ্‌তা সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড়াও শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল।

ফতেপুরে প্রাতর্ভোজনের ক্ষেত্রে অবশ্য মেহ্‌তা সাহেব দু-জনের জন্যেই অর্ডার দিয়েছিলেন। এবার বিলটা আমি জোর করে মিটিয়ে দিলাম। তিনি এর শোধ দিলেন মির্জাপুরে মধ্যাহ্নভোজনে এবং বক্সারে বৈকালিক চায়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভারি লজ্জা করছিল। মনে হচ্ছিল মেহ্‌তা সাহেবের সৌজন্যের অপব্যবহার করছি। যে নাতিদীর্ঘ পরিচয় আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এতটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে ঠিক হচ্ছে কি? অথচ ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, জোর করে তাঁকে নিরস্ত করতে গিয়ে রেস্তোরাঁ-বেয়ারার সামনে এক অশোভন দৃশ্যের অবতারণাও করা যায় না। মনে মনে ঠিক করলাম যে নৈশ ভোজনের বিলটা আমিই না-হয় দেব, আর নৈশ ভোজনে একটু বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করব। মেহ্‌তা সাহেবও আমিষাশী। সুতরাং কোন অসুবিধা নেই।

আরাতে পৌছে কণ্ডাক্টারকে খুঁজে বের করে বললাম, আমাদের নৈশ ভোজনে স্ট্যাণ্ডার্ড মিলের পরিবর্তে ওয়েস্টার্ন ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

—তা কি করে হয়? টেলিগ্রাম যে চলে গেছে, কণ্ডাক্টার অক্ষমতা জানালেন।

—যে করে হোক ব্যবস্থা করতেই হবে, বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিজেই করলাম। হাতের মুঠোয়-ধরা ছোট লাল রং-এর কাগজখানার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে কণ্ডাক্টার জানালেন, পাটনা থেকে আবার টেলিগ্রাম করতে হবে মোকামায়, হয়ে যাবে।

অভিবাদনের ভংগিতে মুষ্টিবদ্ধ হাতটা একটু তুলে কণ্ডাক্টার চলে গেলেন।

পাটনা থেকেই গাড়ী লেট করতে শুরু করল। থামবার কথা ২৫ মিনিট, পুরো ৫০ মিনিট পেরিয়ে গেলেও ছাড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। বিরক্ত হয়ে অনেকটা বোকার মতই মেহ্‌তা সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, গাড়ী লেট করছে কেন?

সম্পূর্ণ নিস্পৃহ স্বরে উত্তর পেলাম, ক্যা মালুম।

উত্তরের স্বর বা শব্দের কার্পণ্য কোনটাই মেহ্‌তা সাহেবের চরিত্রের সংগে খাপ খায় না, অন্তত আমার সংগে ব্যবহারে ত নয়ই। কারণ কি, ট্রেন লেট? ট্রেন না-হয় কিছুটা লেটই করছে, তাতে অত বিচলিত হবারই বা কি আছে? ভাব-পরিবর্তনের জন্য বললাম, যাই দেখে আসি, কেন লেট করছে।

এবার স্বর আরও বেয়াড়া,—যাইয়ে, কোন্ রুকতা?

ব্যাপার কি মেহ্‌তা সাহেবের? ট্রেন লেট করাতে যে একেবারে ক্ষেপে গেছেন! ভাবতে ভাবতে উঠে করিডর্ পেরিয়ে দরজার কাছে গেছি এমন সময় ট্রেন ছাড়ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কামরার দিকে ফিরলাম। যাক্, এবার মেহ্‌তা সাহেবের মেজাজ ফিরবে। ফিরে দেখি ব্যাপারটা ঠিক আশার বিপরীত। মেহ্‌তা সাহেব জানালার কোণে মাথা রেখে, নয়ন মুদ্রিত করে শয়নের ভংগিতে বসে আছেন, আর তাঁর মুখমণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে জগতের যত বিতৃষ্ণা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বোকার মত উক্তি করলাম, মেটা সাব্, গাড়ী ত চল্ রহা।

এবার কোন জবাব এল না, তবে ভাবে বুঝলাম যে একটা জবাব দিতে

গিয়েও মেহ্‌তা সাহেব নিজেকে সংযত করে নিলেন। টাইমটেব্‌ল্ হাতে নিয়ে নীচের বার্থেরই অপর দিকে চুপ করে বসে রইলাম।

বক্তিয়ারপুরে পৌছোবার কথা রাত্রি ৭-৪৫-এ, পৌছুল ঠিক এক ঘণ্টা পরে। টাইমটেব্‌লের সাহায্যে হিসাব করলাম যে মোকামায় পৌছুবে ৯-৪০ কি তারও পরে। বিরক্তিকর অবস্থা সন্দেহ নেই—১০টা অবধি নৈশ ভোজনের জন্য অপেক্ষা করা! মেহ্‌তা সাহেব স্ফূর্তিতে থাকলে না-হয় আলাপ করে সময় কাটানো যেত। তিনি মৌনী বাবার ভূমিকা গ্রহণ করায় টাইমটেব্‌ল্ পড়েই কালহরণ করতে হবে। বই এক-আধখানা সংগে আছে কিন্তু এখন কি তাতে আর মন বসবে?

বক্তিয়ারপুর থেকে গাড়ী ছাড়ার কিছুটা পরে মেহ্‌তা সাহেব চোখ খুলে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, দেখিয়ে সাব্, আভি আপনা বার্থপর যাইয়ে, ন বজ গিয়া।

চমকে উঠলাম—এ যে মেহ্‌তা সাহেবের কণ্ঠস্বর তা যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। তবুও কোনমতে সামলে নিয়ে জানালাম মোকামাতেই যাব —নৈশ ভোজনের পর।

—নেহি,—মেহ্‌তা সাবেবের কণ্ঠে অকল্পনীয় দৃঢ়তা। অবশ্য ব্যাখ্যা হিসাবে সংগে সংগেই জানালেন, মেরা নিদ্ আ গিয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপ্ খানা নেহি লিজিয়েগা?

এবারও উত্তর সংক্ষিপ্ত, নেহি, তবিয়ত্ ঠিক্ নেহি হ্যায়।

চিন্তিত হয়ে পড়লাম—দু-জনের ওয়েস্টার্ন ডিনারের অর্ডার দিয়েছি। তবুও অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টায় বললাম, শির্‌দরদ? মেরে পাস সারিডন হ্যায়।

—শির্‌দরদ নেহি, এইসি।

উত্তর শুনে যেন আশার ঝিলিক দেখতে পাই, মন্তব্য করি: তবে মেহ্‌তা সাহেব কিছুটা খেতে পারবেন এবং জানাই যে মোকামায় স্ট্যাণ্ডার্ড ইণ্ডিয়ান খানার পরিবর্তে ওয়েস্টার্ন ডিন্যারের ব্যবস্থা করেছি।

শুনে মেহ্‌তা সাহেব ক্ষেপে যান। বলেন, ওয়েস্টার্ন ডিনার! আপ লিজিয়ে, হাম্ নেহি লেংগে।—তারপর একটু থেমে কতকটা স্বগতোক্তির মত করে বলেন, তবিয়ত্ আচ্ছি নেহি রহ্‌নেসে ভি খানা খানে হোগা? এ ক্যা জুলুম!

এরকম ফ্যাসাদে জীবনে পড়ি নি। দু-জনের খাবার নিয়েই বা কি করব? আবার মেহ্‌তা সাহেবের বার্থ ছেড়ে দেবার আদেশও রয়েছে। খাওয়ার জায়গাই বা কোথায়? ওপরের বার্থে বসে কি খাওয়া যায়? গাত্রোত্থান করে কামরা থেকে বেরিয়ে করিডরে এসে হাজির হলাম।

অ্যাটেণ্ডাণ্টের সঙ্গে গল্প করতে করতে সময় কোন রকমে কেটে গেল, গাড়ী পৌঁছুল মোকামায়। ট্রে হাতে বেয়ারাকে পথ দেখিয়ে কামরায় ঢুকে দেখি মেহ্‌তা সাহেব ঘুমোন নি। তিন-চতুর্থাংশ শায়িত অবস্থায় চোখ তুলে যেন কিছুর ধ্যান করছেন। বেয়ারা চলে যাবার পর একবার শেষ চেষ্টা করলাম, কুচ্ ভি তো লে লিজিয়ে, মেটা সাব্?

মেহ্‌তা সাহেব উঠে বসলেন। খাবারের ট্রে সামনে দেখেই হোক বা অন্য কারণেই হোক মুখে তাঁর সম্পূর্ণ দ্বিধার ভাব; বললেন, যব এতনা জুলুম্ করতে হেঁ…।

ভাব-পরিবর্তনের সূচনা দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, একটা অপব্যয়ের আশংকা সত্যিই মনকে খোঁচা দিচ্ছিল।

ভেবেছিলাম মেহ্‌তা সাহেব শুধু ঠুকরেই অনুরোধ রক্ষা করবেন, কিন্তু দেখলাম যে সবই শেষ করলেন। এবং অতৃপ্তি বা অনাগ্রহের সংগেও নয়। আমিও তাঁর বার্থে বসেই ভোজনপর্ব সমাধা করলাম। খাবারের সময় অবশ্য দু-জনেই মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলাম।

কিউলের আগের একটা স্টেশনেই বেয়ারা বাসনপত্র ও বিলের টাকা নিয়ে চলে গেল। তখনও আমরা নির্বাক হয়ে বসে। বেয়ারা চলে যাবার পর নিজের বার্থে চড়ে বসলাম। মেহ্‌তা সাহেবও দেখি বিছানাটি ঝেড়ে নিয়ে লম্বমান হবার চেষ্টা করছেন।

আবার ঘুম ভাঙল মেহ্‌তা সাহেবের ডাকে : উঠিয়ে জী, চা পিজিয়ে গা নেহি ?

চোখ মেলে তাকাতে দেখি মেহ্‌তা সাহেব দাঁড়িয়ে, তবে আগের দিনের মত হাতে চায়ের কাপ নেই। এবার তিনি বললেন, উৎরিয়ে, চা বানায়কে রাখা।

ঠিক মেহ্‌তা সাহেবের আহ্বানে নয়, নানা কৌতূহলের তাড়নাতেই বার্থ থেকে নেমেছিলাম। ১২নং ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসে প্রাতঃকালীন চা পানের কথা নয়। গাড়ী অবশ্য কাল ঘণ্টাখানেক লেট করেছিল। সেই লেট না বাড়লে সকাল ৫টার পরই বর্দ্ধমান ছাড়ার কথা। গাড়ী এখন চলছে। কতদূর এলাম ? মেহ্‌তা সাহেব চা যোগাড় করলেন কোন্ স্টেশন থেকে ? তিনি কি গতরাত্রের ব্যবহারের কথা ভুলে গেছেন ?

আমার মনের অবস্থা মেহ্‌তা সাহেব যে অনেকটা অনুমান করেছিলেন তা তাঁর উক্তিতেই বেশ বোঝা গেল। প্রশ্ন করলেন, ক্যা শোচতে হে ?—তারপর ধীরে ধীরে ভাঙলেন, গাড্‌ডি পাক্কি দো ঘণ্টে লেট, আভ্‌ভি বার্দোমান্ ছোড়া। উসিমে আধে ঘণ্টা রুকা থা। ময়নে চায় মাঙায় লিয়া।

বিচক্ষণতার কাজ করেছেন মেহ্‌তা সাহেব। তবে তিনি কি গতরাত্রের কথা ভুলে গেছেন ?

একটু পরেই বুঝলাম যে না, ভোলেন নি। দায় এড়ানোর মত ভাব নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছি এমন সময় মেহ্‌তা সাহেব বলে উঠলেন, মাপ কিজিয়ে, সাব্।

ব্যাপারটা বুঝলেও না-বোঝার ভান করে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। ক্ষমা-প্রার্থনার স্বরে মেহ্‌তা সাহেব জানালেন যে কাল তাঁর তবিয়ত্‌টা ঠিক ছিল না বলেই......। তারপর একটু অস্বস্তির সংগে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে চললেন : তবিয়ত্ ঠিক ছিল না বললে ঝুট বলা হয়, তবিয়ত্ ঠিকই ছিল। ব্যাপারটা হল রোজই সন্ধ্যার পর তাঁর একটু—থোড়াসে—পান করা অভ্যাস। কাল রাত্রে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হওয়াতেই 'টেম্পর' চড়ে গিয়েছিল। তা নইলে আমার মত জেণ্টেলম্যানের সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার ?...

মেহ্‌তা সাহেব যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, আবার যেন একটু লজ্জিতও হলেন বলে মনে হল। আমার কাছে কিন্তু চায়ের স্বাদ হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে এল। সংগে সংগে মুখের ভাবও।

ট্রেন চলছে। আর-একটা প্রশ্ন মনে উঁকি দিচ্ছিল, মেহ্‌তা সাহেব সেটাকেও টেনে বের করলেন: আপনি বোধহয় ভাবছেন কিছুটা সংগে নিয়ে উঠি না কেন। কাজটা বে-আইনী—কানুনকো তোড়না ঠিক নেহি হ্যায়!

আইনকে মান্য করে চলতে সক্রেটীস থেকে শুরু করে অনেক মহাপুরুষই উপদেশ দিয়েছেন, তবে ঐ উপদেশ যে একজন সুরাপায়ীর মনে এমনভাবে রেখাপাত করবে, তা জানতাম না। অবশ্য একটু পরেই জানলাম যে মেহ্‌তা সাহেবের আইনভংগে অনিচ্ছা নীতিগত নয়, দণ্ডভয়জনিত। এই দণ্ডভয় আবার একটু অন্য পর্যায়ের।

মেহ্‌তা সাহেব বলে চললেন: আগে তিনি সাথ মে লে যাতে থে। প্রয়োজনমত সহযাত্রীদের দৃষ্টির অগোচরে বাথরুম যা কর্ থোড়াসেভি পি লেতা। ফলে মেজাজ তাঁর সব সময়েই খুশ্ থাকত। বহুৎ ভদ্দর আদমী এই রকমই করে। একবার একজনকে রেলবে পুলিস পকড়কে বহুৎ হুজ্জুৎ করেছিল। মেহ্‌তা সাহেবের মালুম হোয় আউর কোই পেসেঞ্জার দুশমনী করে পুলিস বোলায়া। ঐ সংবাদ ছাপামে ভি নিকলা। ওহি দিনসে হামলোককো ডর লাগ গিয়া—তাঁর ক্ষেত্রেও যদি ঐ রকম খটপট হয়, যদি ছাপার অক্ষরে নাম বেরোয়। এই রকম হলে পজিসন তো জরুর গিরেগা; আর সরকারী ঠিকাদার তিনি, লিস্টমে নামভি খারিজ হোনে শকতা। দুশমন লোগ তো চারিদিকে ছড়িয়েই আছে। এই পরিবেশে কি সাথমে লেকে চড়না ঠিক হ্যায়?

উপযোগিতার অকাট্য যুক্তি। এও এক রকম দণ্ডভয়। দণ্ড মানেই দাণ্ডা নয়, জেল-পুলিস নয়। হাতে না মেরে ভাতে মারলে আরও বেশী দণ্ড দেওয়া যায়। এই বিশেষ দণ্ডভয়ই মেহ্‌তা সাহেবকে তাঁর প্রবৃত্তির সংগে জোর লড়াই করে আইন মানতে বাধ্য করেছে। মাঝে মাঝে এক একটা রাত্রি হয়ত তাঁকে একটু অসুবিধায় কাটাতে হয়, কিন্তু কালো তালিকাভুক্ত হয়ে সরকারী ঠিকাদারি খারিজ হবার ভয় থাকে না।
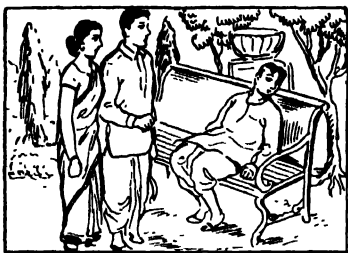
ভাগ্যবতী

'দাঁড়ান একবার জিজ্ঞাসা করে আসি'. বলে তাঁর কামরায় ঢুকে গেলেন হরবিলাস বক্সী মহাশয়। একটু পরেই ফিরে এসে জানালেন, ঠিক আছে, আজ বিকেলেই সহস্রধারায় যাওয়া যাবে, ট্যাক্সি ঠিক করুন।

আবার ঘরে ঢুকে গেলেন ভদ্রলোক।

হরবিলাসবাবুদের সংগে আমাদের আলাপ ট্রেনে। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। ওঁরা হাওড়ায় ওঠেন নি, রিজার্ভ বার্থ দখল করেছিলেন আসানসোল থেকে। ভদ্রলোক আসানসোল, না আদ্রার ফৌজদারী কোর্টের উকিল।

যাচ্ছিলাম ডুন এক্সপ্রেসে। প্রাতঃকালীন প্রাথমিক চা-এর খালি পাত্র নিয়ে রেস্তোরাঁ-বেয়ারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে আমারই কামরার দরজার কাছে পাকড়াও করে এক ভদ্রলোক (নিশ্চয়ই পাশের কামরার) আদেশ দিলেন, হামকো ভি লিয়ে দো চা লে আনা।

অক্ষমতা জানিয়ে বেয়ারা বলল, টেম নেহি হ্যায় সাব্, সিংগল হো গিয়া।

—সিগন্যাল হয়ে গেছে, কি মুশকিল! কতকটা স্বগতোক্তি করে ভদ্রলোক বেয়ারার পথ ছেড়ে দিলেন। তারপর ফিরে যাবার মুখে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে যেন সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্যেই বললেন, কি মুশকিল বলুন ত. চা পাওয়া গেল না।

জানালাম, আগে থেকে অ্যাটেণ্ডড্যাণ্ট বা কণ্ডাক্টারকে না বললে চা বা মীল সবকিছুই পেতে মুশকিল হতে পারে।

—তাই বুঝি! ভদ্রলোকের কণ্ঠে সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সুর, কিন্তু পরক্ষণেই বেশ একটু ব্যাকুলতার সংগে প্রশ্ন, এখন কি করা যায় বলুন ত?

—কি আর করা যাবে! ভাঁড়ের চা চলবে?

—ভাঁড়ের চা? দাঁড়ান একবার জিজ্ঞাসা করে আসি, বলে ভদ্রলোক তাঁর কামরায় ঢুকে গেলেন। বেরুলেন অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই এবং জানালেন, চলবে।

ইতিমধ্যে কখন যে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল খেয়াল করি নি। এখন দেখলাম প্লাটফর্ম অতিক্রম করেছে। বললাম, চললেও এখন উপায় নেই, গাড়ী প্লাটফর্ম পেরিয়ে এসেছে।

—অ্যাঁ, উপায় নেই ?—ভদ্রলোক যেন আঁৎকে উঠলেন, তবে কি হবে ?

খানিকটা আশ্বাস দিয়ে বললাম, কি আর হবে ? মাঝে দু-একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী থামবে, সেখানে ভাঁড়ের চা নিশ্চয়ই পাবেন। তবে ভাল চা পেতে হলে সাড়ে আটটা নাগাদ ডেহিরি-অন-শোণে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আবার কিন্তু ফিরে এলেন। দরজা এবারও খোলা ছিল। অনুমতি না নিয়েই ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কতদূর যাবেন ?

—দেরাদুন।

বেশ বোঝা গেল যে প্রত্যাশিত উত্তর পেয়ে ভদ্রলোক খুশিই হয়েছেন, ভালই হল, আমরাও দেরাদুন যাচ্ছি। উনি বললেন, আপনাদের সংগে আমাদের অর্ডারগুলোও যদি দিয়ে দেন ··।—তারপর কি যেন বলতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা ক-জন ? আর কি খাবেন, আমিষ না নিরামিষ ?

ক-জন, তার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন,—ভাল ফ্যাসাদে ফেললেন ত মশাই, আমিষ না নিরামিষ। তা মাছমাংস সবই চলে। তবে কি জানেন, ওঁর একটু খুঁতখুঁতে স্বভাব, বোয়াল মাছটাছ চলে না। আর মাংস দিলে কিসের মাংস দেবে কে জানে ! তার চেয়ে নিরামিষই ভাল, কি বলেন ?

আমি কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক—দাঁড়ান একবার জিজ্ঞাসা করে আসি, বলে চলে গেলেন।

এবার বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে জানালেন যে নিরামিষই নিরাপদ, সুতরাং সেই ব্যবস্থাই যেন করি।

আমরা—অর্থাৎ আমি ও আমার স্ত্রী—যাচ্ছিলাম এক কুপেতে। ভদ্রলোক চলে গেলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কেমন দেখলে ?

দ্ব্যর্থবোধক উত্তর এল, যে যেমন বরাত করে আসে !—বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা আর নিঃসৃত হল না। আমি তখন বাথরুম অভিমুখে যাত্রা করলাম।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি আর-এক ভদ্রমহিলা আমাদের কামরায় বসে আছেন। আমাকে দেখে মাথার কাপড বেশ খানিকটা টেনে দিলেন। মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা, বিশেষ চওডা পাডের শাডী পরা। আমার স্ত্রী 'মিসেস বক্সী' বলে কতকটা একতরফা আলাপই করে দিলেন। ভদ্রমহিলা কিন্তু প্রতি-নমস্কার করা ত দূরের কথা, ভাল করে আমার দিকে চাইলেনই না। বুঝলাম, ভদ্রমহিলা অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে বিশেষ পটু নন। ব্যাপারটা আমার স্ত্রীও বুঝেছিলেন। বললেন, তুমি বরং ওঁদের ঘরে গিয়ে বস, আমরা ততক্ষণ গল্প করি।

গেলাম পাশের কামরায়। সেখানে বক্সী মহাশয় ছাডা আছেন সৈন্য-বিভাগের দু-জন শিখ অফিসার। বক্সী অভ্যর্থনা জানালেন : আসুন স্যার, আমার স্ত্রী আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে গেছেন।

বক্সীর সঙ্গে আমারও আলাপ হল। জানলাম তাঁর পুরো নাম, জানলাম তিনি উকিল, জানলাম আদালতের ছুটি বলে স্ত্রীকে নিয়ে বেডাতে বেরিয়েছেন—আগে কখনো এ সুযোগ হয় নি। এবার তাঁর ভাই সস্ত্রীক এসেছিল নাগপুর থেকে, কালীপূজোর পর ফিরবেন। সুতরাং সুবিধা হয়ে গেল। বক্সীদের দুটি মাত্র ছেলেমেয়ে। তাদের কাকাকাকীর কাছে রেখে বেরিয়ে পডতে পেরেছেন।

শোণ ব্রীজে গাডী এলে বক্সীকে বললাম, ওপারেই ত ডেহিরি-অন শোণ। আপনাদের চা-টায়ের ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের অর্ডার দেওয়াই আছে। আপনাদের চা-এর সঙ্গে আর কি দিতে বলব—টোস্ট আর ডিমভাজা ?

—ডিম ভাজা ? কিসের ডিম ?—বক্সীর স্বরে উৎকণ্ঠা।

একটু হেসে বললাম, মুরগীর ছাডা আর কিসের ? রেলে হাঁসের ডিম পাওয়াই যায় না।

—কি মুশকিল ! দাঁডান একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।—ভদ্রলোক উঠে আমাদের কামরার দিকে গেলেন।

কামরায় অপর যাত্রী-দু-জন বাঙলা ভাষায় জ্ঞানবর্জিত বলেই রক্ষা, নচেৎ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সামনে লজ্জায় পড়তাম।

ফিরে এসে বক্সী আদেশ দিলেন, আমার জন্যে টোস্ট আর অমলেট, আর

ওঁর জন্যে শুধু টোস্ট।—তারপর ব্যাখ্যাস্বরূপ বললেন, আমার মুরগীর ডিম চলে, বাইরে হোটেলে টোটেলে খেতে হয় কিনা…,—তারপর যেন কোন রহস্য ফাঁস করছেন, মুরগীও বাদ যায় না…।

দেরাদুনে এসেছি। দুই পরিবারের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে। হরবিলাসবাবু সম্পূর্ণ আমার ওপরই নির্ভরশীল—হোটেল টাংগা ট্যাক্সি যাই বন্দোবস্ত করি, তাতেই তিনি রাজী। তবে কোন কিছু প্রস্তাব করলে 'দাঁড়ান একবার জিজ্ঞাসা করে আসি' বলে তাঁর ঘরে ঢুকে এক মিনিট পরেই বেরিয়ে এসে সম্মতি জানান: উনি বললেন, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।—বক্সীদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাপারে আমার স্ত্রীরও পূর্বের দ্ব্যর্থবোধকতা দূর হয়ে গেছে, তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য করতে শুরু করেছেন: মিসেস বক্সী সত্যিই ভাগ্যবতী।—আমাদের খানিকটা লাভও হয়েছে। দু-জনের চেয়ে চার জনে বেড়ানো খরচের দিক দিয়ে অনেক সুবিধা, আর আমার স্ত্রী একজন সংগিনী এবং আমি একজন সংগী পেয়েছি।

দেরাদুন থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল। সহস্রধারা দেখতে গেছি। সেখানে শ্রীমতী বক্সী দেখা পেলেন তাঁর একজন বাল্যসখীর। শুনলাম, সখি-পরিবার কলকাতা থেকে সটান এসেছেন মোটরে। দেরাদুনে এখন দু-চার দিন থাকবেন।

বহুদিন পরে পুনর্মিলন—দুই সখী বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন দেখলাম, একান্তে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করে চললেন। আমার স্ত্রী আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর হরবিলাসবাবু দাঁতে একটা কাঠি খুঁটতে খুঁটতে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

ফেরার পথে শ্রীমতী আমার স্ত্রীকে বলছেন শুনলাম, সুষমার সঙ্গে এক সংগে পড়েছি। তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেল… ওঃ। কতদিন পরে দেখা…।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ওঁরা দু-জনে এসেছেন?

উত্তর এল, তিন জন কোথায় পাবে? ছেলেপিলেই হয় নি,…মস্ত বড়লোক, স্বামী ব্যারিস্টার। ছুটি পড়লেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।…

বক্সীরা খেতেন তাঁদের ঘরে আর আমরা রেস্তোরাঁ-কাম-ডাইনিং রুমে। সেদিন রাত্রে খেয়ে ফিরছি, দেখি আমাদের দরজার সামনে হরবিলাসবাবু পায়চারি করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ?

এই আপনাদের জন্যেই, বক্সীর উত্তর।

—আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।—বক্সীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে আবার জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার ?

উত্তরে বক্সী বলেন, এক গ্লাস জল।

জল পান করে হরবিলাস বক্সী মহাশয় অনেক করে যা বললেন তার মর্মার্থ হল যে পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে আগামী কাল তাঁদের পক্ষে মুসুরী যাওয়া সম্ভব হবে না। তাঁরা আরও কয়েক দিন দেরাদুনে থাকতে চান. এজন্যে আমরা যেন কিছু মনে না করি।

বললাম, এতে মনে করবার কি আছে! কিন্তু হঠাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ কি ?

—ব্যাপারটা কি জানেন,—বক্সী এবাব সপ্রতিভভাবে ব্যক্ত করে বললেন, আমার স্ত্রীর সেই সহপাঠিনী, যাঁদের সঙ্গে সহস্রধারায় আজ দেখা হল, তাঁবা কয়েক দিন দেরাদুনে থাকবেন। এখান থেকে এদিক ওদিক বেড়াতে যাবেন। সহপাঠিনীর ইচ্ছা যে আমরাও কয়েক দিন এখানে থাকি। একসংগে ঘোরা যাবে, অনেক দিন পরে দেখা কিনা···।

অতি স্বাভাবিক ইচ্ছা—বলবার কিছু নেই, এবং এই ইচ্ছা যে মূলত শ্রীমতী বক্সীর তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কোন ব্যাপারে শ্রীমতী বক্সীর ইচ্ছা হলে শ্রীযুক্ত বক্সীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন যে অবান্তর তাও জানি। সুতরাং বলবার কিছু ছিল না। তবুও বললাম, ট্যাক্সি ঠিক করা হয়ে গেছে, ফোনে হোটেল বুক করা হয়েছে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ট্যাক্সির অর্ধেক ভাড়া আর-একদিনের হোটেল খরচ দিয়ে দেব।

এর উত্তরে আর কিছু বলা যায় না। বক্সী এবার কিন্তু উৎসাহ দিয়ে বললেন, ক-দিন পরেই ত আবার এক সংগে হচ্ছি! ফোন করে জানাব কবে যাচ্ছি, ঘর ঠিক করে রাখবেন।

মুস্থরীতে সাতদিন থাকা সত্ত্বেও হরবিলাসবাবুদের কোন ফোন এল না। পথেঘাটেও দেখা হল না। সুতরাং তাঁরা মুস্থরীতে আসেন নি।

বক্সীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আবার দেরাদুনেই। পরের দিন সকালের গাড়ীতে হরিদ্বারে যাব বলে দুপুরবেলা নেমেছি। সন্ধ্যার দিকে দু-জনে গান্ধী পার্কে বেড়াতে গেছি। হঠাৎ দেখি কয়েক গজ দূরে বেঞ্চে অর্ধশায়িত অবস্থায় শ্রীহরবিলাস বক্সী মহাশয়—একা। তখনও ঠিক অন্ধকার হয় নি, সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বক্সীকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল না। কাছে গিয়ে ডাকলাম, হরবিলাসবাবু, মিঃ বক্সী!

কোনরকমে চোখ খুলে বক্সী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও, আপনারা। —তারপর যেন কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা করে বললেন, কবে নামলেন?

—আজই। কিন্তু আপনার কি শরীর খারাপ?

—Oh, no! শরীর খারাপটারাপ নয়, শরীর খারাপ কেন হবে? বরং শরীর ভালই···Couldn't be better।—বক্সী হঠাৎ ইংরেজীর ভক্ত হয়ে উঠেছেন।

অবস্থাটা বুঝলাম। বললাম, আপনাকে পৌছে দেব?

সবেগে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বক্সীর উত্তর, ধন্যবাদ! তার দরকার নেই। Let me lie for some time more here under the starry sky··· .

বক্সীর ক্যাবোচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরিয়েণ্টাল হোটেলেই আছেন, না আর কোথাও চলে গেছেন?

বক্সী উত্তর দেন, সরে গেছি White House-এ—the most fashionable hotel with a bar attached to it.

—হোয়াইট্ হাউসটা কোন্ দিকে?

ঐ অবস্থাটাতেও হরবিলাসবাবু প্রশ্নের উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন দেখলাম। একটু হেসে বললেন, মিসেস্‌কে খবর দেবেন ভাবছেন? She is not here —I mean not at Dehra Doon···তাঁর সেই সহপাঠিনী—তাঁদের সংগে গাড়ীতে বদরিনারায়ণ গেছেন।

মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আপনি গেলেন না?

—No, I didn't; অসুখের ভান করেছিলাম—diarrhoea। হিল-এ ডায়ারিয়া নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক, জানেন ত?

আমি আর কোন প্রশ্ন না করলেও বক্সী বলে চললেন,—কেন অসুখের ভান করেছিলাম ভাবছেন? The reason is simply this: I wanted a bit of freedom—at least for a few days। দেশে থাকলে আদালতে যাই, মক্কেলদের সংগে কথাবার্তা বলি······দিনের অধিকাংশ সময় এইভাবেই কেটে যায়······আর এখানে সব সময়ই slavery—এক মিনিটও নিষ্কৃতি নেই ···অসহ্য। তাই সুযোগ যখন হাতের মুঠোয় এল, তখন আর ছাড়লাম না।···ওঁরা ফিরলে কাল পরশু হয়ত মুসুরী যাব······আবার সেই serfdom.

বক্সী থামলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, একটা টংগা করে পৌছে দেব?

—ধন্যবাদ! টংগা নিয়ে নিজেই যেতে পারব। তবে এখন নয় পরে যাব, বক্সীর স্বরে দৃঢ়তা। উত্তর শেষ করে বক্সী প্রশ্ন করলেন, একটা উপকার করতে পারেন?

—কি, বলুন?

—একটা চুরুট দিতে পারেন?

বক্সীর অনুরোধে অবাক হয়ে বললাম,—চুরুট ত নেই, সিগারেট আছে। আপনি স্মোক করেন নাকি? কখনও ত দেখি নি।

—না, সাধারণত করি না, তবে আজ করতে ইচ্ছে করছে।

বক্সীকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে স্ত্রীর মৃদু হস্ত আকর্ষণে বাইরের দিকে পা বাড়ালাম।

রাস্তায়, হোটেলে এবং পরেও দু-একবার আমার স্ত্রীর কাছে হরবিলাস বক্সী মহাশয়ের প্রসংগ উত্থাপনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন সাড়া বা উৎসাহ পাই নি। ভাবটা যেন বক্সী-পরিবার এতই হেয় যে আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। কারণ কি অবশ্য তা জানি না। শ্রীযুক্ত বক্সীর প্রতি ঘৃণা, না শ্রীমতী বক্সীর প্রতি অনুকম্পা, না হঠাৎ নিজের আপেক্ষিক মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি? মনোবিজ্ঞানীরা হয়ত বলতে পারবেন।
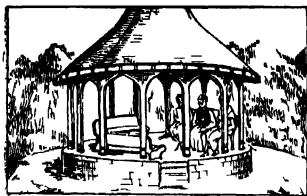
বাইরে ঘরে হাজির হুটা

ওঁদের দু-জনের মধ্যে পরিচয় আগে থেকেই, অবশ্য মুস্বরীতে আমার পরই। আমার সংগে সরকার সাহেবের প্রথম আলাপ হয়েছিল লাল টিব্বায় এবং তাঁরই মাধ্যমে গাঙ্গুলী মশায়েব সংগে পরিচয়। ওঁদের মত আমিও ক্যামেলস্ ব্যাক্ রোডে একা বেডানো পছন্দ করতাম। (জানি না ওঁদের পরিবারের সভ্যরাও কুলরির কাছে ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করতেন কিনা।) হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজাবে ঢোকবার আগেই ডান হাতে মসজিদের পাশ দিয়ে ক্যামেলস্ ব্যাক্ রোডে পডতাম, আর বেরিয়ে আসতাম লাইব্রেরি বাজারের কাছে পাহাডী রিক্সা বা পুস্‌পুস-স্ট্যাণ্ড হয়ে। পুরো এক চক্কর।

ওঁদের দু-জনের মধ্যে কিভাবে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল জানি না, তবে অনুমান করা যায় যে সরকার সাহেবই আলাপে অগ্রণী হয়েছিলেন। আলাপে সরকার সাহেব সব সময়েই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন বলে আমার ধারণা। এবং ধাবণা হয়েছে লাল টিব্বার দিন থেকে।

লাল টিব্বায় ক্যান্‌টিনের পাশে চায়ের কাপ নিয়ে একাই দাডিয়েছিলাম, পরিবারের সভ্যরা ছিল একটু দূরে। বাঙালী পোশাকে সজ্জিত ভদ্রলোকও ছিলেন তাঁর পরিবাব থেকে একটু বিচ্যুত এবং আমারই কাছাকাছি। মনে হয়েছিল যেন আমাকেই তিনি লক্ষ্য করছেন। তাঁর দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে উক্তি করলেন,—চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

আমার কিন্তু মোটেই 'চেনা চেনা' মনে হয় নি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সে কথা না বলে একটু কূটনৈতিক হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেছিলাম। ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি ম্যাণ্ডেভিলা গাডেনস্-এ থাকেন ?—বিনীতভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম, আজ্ঞে না, বাগবাজারে।

যেন একটু সামলে নিয়ে ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করেছিলেন, বাগবাজারে আদি নিবাস ?

—আজ্ঞে না, আদি নিবাস উত্তরপাড়া।

—বালি-উত্তরপাড়া?—ভদ্রলোকের কণ্ঠে এবার আগ্রহ বা কৌতূহলের স্বর।

—হ্যাঁ, বলে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলাম, উত্তরপাড়ার কাউকে চেনেন নাকি?

—না, ঠিক চিনি না, তবে বাড়ুজ্যে পাড়ার বোসদের···, উত্তর শেষ না করেই ভদ্রলোক আর-এক প্রশ্ন করে বসলেন: বোসেরা কি রকম লোক মশাই?

তারপর প্রশ্নটা যে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে বলেছিলেন, ঐ বোসদের নিশ্চয়ই চেনেন, বালি-উত্তরপাডার সাত পুরুষের বাসিন্দা।

প্রথম প্রশ্নের ধরনে একটু বিস্মিত হলেও দুটির উত্তরই একসংগে দিয়েছিলাম,—হ্যাঁ, বোসদের চিনি, আর ভাল লোক বলেই ত জানি।—তারপর নিজেও প্রশ্ন না করে পারি নি, কেন বলুন ত?

ভদ্রলোক ব্যাপারটা ভেঙেছিলেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেছিলেন,—আমার থার্ড ডটারের সংগে, বুঝলেন না, বোসবাড়ীর ঐ মেজকর্তার—কি নাম জানি—বড়ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল। ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল বলেই শুনেছিলাম—কোন্ কলেজের যেন প্রফেসর। আমরা ছেলে দেখতে গেছলাম, আর ছেলেকে দু-একটা জিজ্ঞেসবাদও করেছিলাম—যেমন করে আর কি! পরের রবিবার ওঁদের আমার মেয়েকে দেখতে আসবার কথা। ও মশাই! ইতিমধ্যে একখানা চিঠি এল ঐ মেজকর্তার কাছ থেকে। তাতে লেখা, আমার ছেলেকে আপনি ঐ রকম জেরা করাতে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং সে ওখানে সম্বন্ধ করতে নারাজ। অতএব মেয়ে দেখতে আর যাবে না।··· বুঝলেন ব্যাপারটা!—ভদ্রলোক থামলেন।

সেদিন আলাপ ঐ পর্যন্তই, কারণ ইতিমধ্যেই অদূরে দণ্ডায়মান উভয় পরিবারের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুটা সরব কিছুটা নীরব তাগিদ এসেছিল। ফেরার পথে আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভদ্রলোক কে? উত্তর দিয়েছিলাম, তা ত জানি না।

—তবে যে এতক্ষণ আলাপ করছিলে?

বলেছিলাম, আলাপ যে করছিলাম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভদ্রলোকের নাম ধাম ঠিকানা, এমনকি মুসুরীতে কোথায় উঠেছেন তাও জানা হয় নি।

শুনে ভদ্রমহিলা সংক্ষিপ্ততম মন্তব্য করেছিলেন: আশ্চর্য!

সত্যিই আশ্চর্য। এইরকম পটভূমিকাবিহীন আলাপ শুধু মহিলাদের

কাছেই নয়, অনেক ভদ্রলোকের কাছেও আশ্চর্য বলে মনে হবে। হাজার হোক আমরা সামাজিক জীব, এবং সামাজিক পরিচয়েই আমাদের পরিচয়।

ভদ্রলোকের নামধাম সহ সামাজিক পরিচয় জেনেছিলাম পরে—ক্যামেলস্ ব্যাক্ রোডের হাওয়া-ঘরে। সেদিনও লাইব্রেরি বাজারের দিকে আসছিলাম, হাওয়া-ঘরেই ভদ্রলোকের সংগে দেখা। সংগে আরও একজন ছিলেন। কারা বসে আছেন, তাকিয়ে দেখি নি। পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় কানে এল,— এই যে, বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

বাক্যটি প্রশ্নের আকারে হলেও আসলে সম্বোধনসূচক। তাকিয়ে দেখলাম লাল টিক্কার সেই ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক আহ্বান করলেন : আসুন না, খানিকক্ষণ গল্প করা যাক্।

আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাওয়া-ঘরে গিয়ে বসলাম। ওখানেই সরকার সাহেবের সংগে লাল টিক্কার আলাপ রূপান্তরিত হল পরিচয়ে এবং ঘটল গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে পরিচয়। তারপর থেকে রোজই দেখা হয় এবং রোজই হাওয়া-ঘরে কিছুক্ষণ সময় কাটাই।

ফেরার পথে গাঙ্গুলী মশায় আমার সংগেই মল রোড ধরে ফেরেন। তিনি থাকেন কনট্ কাসেল্-এ। আর সরকার সাহেব পুল্পুস্-স্ট্যাণ্ডে এসে স্যাভয়-এর দিকে পা বাড়ান।

গাঙ্গুলীমশায় বললেন, সেবার মশাই সিমলে গিয়ে কি মুশকিলেই না পড়লাম। সঙ্গে আবার মেয়েজামাই। বলতে গেলে কোন হোটেলেই জায়গা পেলুম না···

বিবৃতির মাঝখানেই সরকার সাহেব বলে উঠলেন, মুশকিল ত হতেই পারে, হোটেল রিজার্ভেশন না করে কোন জায়গায় যাওয়াই ভুল।

মন্তব্যকে উপেক্ষা করে গাঙ্গুলী মশায় বলে চললেন : আমরা ওয়েটিং-রুমে বসে, দুই ছেলে হোটেল খুঁজতে গেল। প্রায় ঘণ্টা-দুই পরে ফিরে এসে জানালে যে কালীবাড়ীতে দুখানা ঘর পাওয়া গেছে।

এবার সরকার সাহেব আধা বিস্ময়ের সুরে শুধু 'কালীবাড়ী' বলে চুপ

করলেন। গাঙ্গুলী মশায় বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিলেন, একবার তিনি সরকার সাহেবর মুখের দিকে তাকালেন। না, মুখে কিছু ফুটে ওঠে নি; তিনি আবার তাঁর বক্তব্য শেষ করতে উদ্যোগী হলেন।

—কালীবাড়ীতে তার ওপর আবার মাত্র দুখানা ঘর শুনে একটু মুষড়ে পড়েছিলাম। ছেলেরা বোঝালে যে একটা রাত কোন রকমে কাটান যাক্, কাল হোটেল খুঁজে নিলেই হবে। জামাইও তাতে সায় দিলেন। আমার মন ঠিক চাইছিল না, কিন্তু উপায় কি?…

গাঙ্গুলী মশায় হয়ত আরও কিছু বলতেন, কিন্তু সরকার সাহেব যেন অপেক্ষা করতে পারলেন না।—বুঝলেন, বলে আমাদের বোধহয় আমাদের দু-জনকেই সম্বোধন করে শুরু করলেন, আমার ছোটজামাইও ঠিক ঐ রকম। ইয়ার বিফোর লাস্ট সে স্টেট্‌স্‌-এ যাবে, প্যাসেজ বুক করা হয়েছে বোম্বে থেকে। আমরা সপরিবারে সী-অফ করতে গেছি। ট্রাভেল এজেন্টস্‌ জামাই-এর জন্যে তাজমহলে রুম বুক করে রেখেছে, আর আমরা আছি রীজ-এ। হল কি, জামাই, তাজমহল ছেড়ে আমাদের সংগেই থাকতে এল। এয়ার ইণ্ডিয়াকে জানিয়ে দিলে যে বাস পাঠাতে হবে না, সে নিজেই স্যাণ্টাক্রুজে হাজির হবে। এধারে মুশকিল! এক্সট্রা রুম পাওয়া গেল না। আমাদেরই একখানা ঘরে একটি এক্সট্রা বেড লাগিয়ে বাবাজী রাত কাটালেন।…

এবার গাঙ্গুলী মশায় সম্পূর্ণ খাপছাড়াভাবে বলে উঠলেন, শুনেছি,—শাস্ত্রে বলে, ছেলে যদি বাবাকে ছাড়িয়ে না যায় তবে বাপের গতি হয় না।

সরকার সাহেবের মুখের ভাব যেন হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এল বলে মনে হল। গাঙ্গুলী মশায়ের দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকেই নিবদ্ধ, তিনি বলে চললেন: আমার পিতাঠাকুর ছিলেন সেকালের এফ.এ. পাস। তাঁর কামনা ছিল যে আমি যেন গ্রাজুয়েট হই। গ্রাজুয়েট হলাম, ল-ও পাস করলাম। ইচ্ছে ছিল ওকালতি করব। পিতাঠাকুরের কিন্তু স্পষ্ট জবাব—না, আমাদের পাঁচ পুরুষে কেউ উপার্জন করতে বাইরে বেরোয় নি। তখন একটু দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝলাম যে তাঁর কথাই ঠিক। কর্নওয়ালিসের আমল থেকে ভূস্বামী আমরা, অর্থোপার্জনের জন্যে শামলা চড়িয়ে 'হুজুর' বলে দাঁড়ান আমাদের শোভা পায় না।—গাঙ্গুলী মশায় একটু দম নিলেন, —বড় ছেলের কৈ ত প্রিন্সিপল্‌ বজায় রাখতে পারলাম না, ছেলেকে ত ওকালতিতেই দিতে হল!…এম্‌-এ.র রেজাল্ট ভাল, ল'-এর তিনটে পরীক্ষাতেই

ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, জুডিসিয়াল সার্ভিসে কিছু একটা নিশ্চয়ই জুটত। তার চেয়ে এই ভাল··· ।

আমরা দু-জনেই চুপ করে শুনছিলাম। গাঙ্গুলী মশায় আবার শুরু করলেন : ছোট ছেলে অবশ্য চাকরিই করে, তবে প্রফেসরি। চাকরি হলেও ঠিক দাসত্ব নয়। কি বলেন ?—যেন সমর্থনের আশা করে গাঙ্গুলী মশায় থামলেন।

সরকার সাহেব অবশ্য সমর্থনই করলেন তবে একটু অন্যভাবে : তা ঠিকই, প্রফেসরিকে ঠিক দাসত্ব বলা যায় না, আর—সরকার সাহেব একটু থামলেন—মাইনে বেশী না হলেও উপরি রোজগারের সুযোগ আছে। ··আমাদের চেনা একটি ছেলে মশাই প্রাইভেট পড়িয়ে লাল হয়ে গেছে। সেদিন সে আমার কাছে এসেছিল ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস্-এ জমির খোঁজে। বুঝুন একবার প্রাইভেট টুইশানি করে আমাদের পাড়ায় জমিবাড়ী করবার আশা রাখে। তা হবে না কেন, ইনকাম ট্যাক্স ত দিতে হয় না···তবে বাড়ী করলেই ধরবে, জবাবদিহি করতে হবে টাকা কোথায় পেলে।—যেন একটা গূঢ় তথ্য পরিবেশন করে সরকার সাহেব আমাদের দু-জনেরই মুখের দিকে চাইলেন।

দু-তিন দিন পরে হাওয়া-ঘরে বসে গাঙ্গুলী মশায় জানালেন, একটা সুখবর আছে মশাই। আমার ছোট ছেলের চিঠিতে জানলাম যে সে ডি.ফিল. হয়েছে, পূজোর আগেই অবশ্য ভাইভা হয়ে গিয়েছিল। তবে সরকারী ভাবে খবর বেরুবে কালীপূজোর পর ইউনিভার্সিটি খুললে। তা সেটা নেহাত ফরম্যালিটি।

—তা হলে ত আমাদের একটা খাওয়া পাওনা হল, সরকার সাহেব সাধারণ সৌজন্যমূলক উক্তিই করলেন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়,—গাঙ্গুলী মশায় প্রত্যাশিত জবাবই দিলেন—কবে খাবেন বলুন ?

—না না, এখানে নয়। কলকাতায় ফিরে আপনার বাড়ীতে ··কি বলেন ?

—সেই ভাল, ততদিন রেজাল্টটাও অফিসিয়্যালি জানা যাবে···গাঙ্গুলী মশায় শেষ করতে না করতে সরকার সাহেব উপদেশ দিলেন, ছেলেকে এবার ফরেন-এ পাঠান, এখানকার ডিগ্রিতে কিছুই হবে না।···আমি ত মশাই দুই জামাইকেই ফরেন-এ পাঠিয়েছি। বিয়ের সময় ডাউরি যা দেবার তা ত দিয়েইছি, তারপর

বড জামাইকে একদিন বললাম, যাও বাবাজী ফরেন-এর ছাপ নিয়ে এস ·· সেইটেই হবে তোমার আসল ক্যাপিটাল।·· ছোট জামাই-এর নিজেরই অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল, যখন মেয়ের মুখে তা শুনলাম তখন জানিয়ে দিলাম, ঠিক আছে—টাকার জন্যে আটকাবে না।···

—ছেলেদের কাউকে বাইরে পাঠান নি?—প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—ছেলেদের? —সরকার সাহেবের ভাবে মনে হল যেন নির্বোধের মত প্রশ্ন করে ফেলেছি। ভাবটা কাটিয়ে বললেন, তাদের ফরেন এ পাঠা'ব ত বিজনেস দেখবে কে? আমি ত একরকম রিটায়ারই করেছি, তাদের ব্যাপার তারা বুঝে নিক। —তারপর একটু থেমে জানালেন, তবে যদি ফরেন-ট্যুর-এর কথা বলেন ত দুই ছেলেই কয়েক বার করে গেছে, আমার এক্সপোর্টের কারবারও আছে কি না।

হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় দু-তিন দিন বেড়াতে বেরোই নি। সুস্থ হয়ে আবার পুরোনো নিয়মে ফিরে গেলাম। সেদিন কিন্তু হাওয়া-ঘরে গাঙ্গুলী মশায় বা সরকার সাহেব—কারও দেখা পেলাম না। ফেরাব পথে একবার ভাবলাম শ্যাভয় বা কনট্ ক্যাসল-এ খবর নিই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন ইচ্ছে করল না।

কয়েক দিন পরে সরকার সাহেবের আবার দেখা পেলাম—ক্যামেলস্ ব্যাক রোডে নয়, আমাদেরই হোটেলের কাছাকাছি পিকচার প্যালেসের সামনে। হোটেল থেকে বিকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে পিকচার প্যালেসের সামনে এসেছি, দেখি সপরিবারে সরকার সাহেব। সপরিবারে—অর্থাৎ তিন জন। সরকার সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন: মিসেস সরকার আর আমার বড মেয়ে।

—ছবি দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি? —প্রশ্ন করলাম।

—না, আমি যাই নি। এঁরাই গিয়েছিলেন। আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

ধীরে ধীরে কুলরি বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আগের কথার জের টেনে সরকার সাহেব বললেন, অবশ্য সংগে করে নিয়ে যাবায় কিছু নেই, ওঁরা একলাই এসেছিলেন আর একলাই যেতে পারতেন। তবু ভাবলাম একবার যাই, বেড়ানোটাও হবে।···হ্যাঁ ভাল কথা, গাঙ্গুলীরা দু-দিন আগে নেমে গেছেন।

কথা বলতে বলতে ক্যামেলস্ ব্যাক রোডের মুখে মসজিদের কাছে এসে পড়েছিলাম। সরকার সাহেবকে বললাম, আমি এদিক দিয়েই যাই, আচ্ছা নমস্কার।

—চলুন, আমিও এদিক দিয়ে যাই। ওঁরা মল রোড দিয়ে হোটেল-এ ফিরুন।

সবকার সাহেব ও আমি গল্প করতে করতে ক্যামেলস্ ব্যাক রোড দিয়ে চললাম। হঠাৎ কি কারণে জানি না মন্তব্য করে ফেললাম, আপনার মেয়েকে দেখলে কেমন মায়া হয়—ঠিক যেন প্রতিমার মত চেহারা।

উক্তিটি, বিশেষত প্রৌঢ়ের মুখে, হয়ত অশোভন নয়। কিন্তু সরকার সাহেব দেখলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর নাম কি জানেন? — প্রতিমা।

—নামও প্রতিমা অদ্ভুত মিল ত'। —আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি নি।

—হ্যাঁ অদ্ভুত মিলই সত্যি।—সবকার সাহেব একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন,—কিন্তু কার প্রতিমা জানেন?

প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে বললাম, আজকাল ত সব প্রতিমাই এক রকম করে গড়ে—লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা·

শেষ করবার আগেই সবকার সাহেব প্রতিবাদ করে উঠলেন,—না, আমার মনে হয় ওর সংগে সীতার প্রতিমারই অদ্ভুত মিল আছে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—সীতার প্রতিমা কোথায় দেখলেন? সীতার প্রতিমা ত পূজো কেউ করে না।

—কেউ করে না, কিন্তু আমি করি, সরকার সাহেবের স্বর আরও অদ্ভুত। তারপর একটু সহজ হবার প্রচেষ্টা করে বললেন,—ব্যবসা থেকে রিটায়ার করে নিজের আত্মীয়-স্বজন সমাজ থেকে একরকম আলাদা হয়ে ওকে নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান কোন্ দিক দিয়ে পূজোর চেয়ে কম?

পথ নির্জন, অদূরে গোরস্থান। সরকার সাহেবের দৃষ্টি যেন ঐ দিকেই নিবদ্ধ। চলতে চলতে তিনি কতকটা স্বগতোক্তির মতই বলে চললেন, · মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়, কেন গাঙ্গুলীর মত কেরানী জামাই করি নি।···মেয়ের আমার বিয়ে হয়েছে চার বছর, বিয়ের দু-মাস পরেই জামাই জার্মেনী গেল। দশ মাসের কোর্স, কিন্তু চার বছরেও ফিরে এল না। প্রথম প্রথম চিঠিপত্র দিত, এখন তাও বন্ধ। কানাঘুষোয় নানা কথা শুনি।···

হঠাৎ সরকার সাহেব স্বগতোক্তি বন্ধ করলেন, আর দাঁড়িয়েও গেলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, সরি। ভুলে গিয়েছিলাম, আমাকে কুলরি হয়েই যেতে হবে—কিছু পারচেজ করার আছে।

ইংগিত অতি সুস্পষ্ট, একাই সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কয়েক পা গিয়ে একবার সামনে গোরস্থানের দিকে আর একবার পিছন ফিরে পাহাড়ী পথের বাঁকে অপস্রিয়মান সরকার সাহেবের দিকে চেয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম : মাত্র অপসারিত হওয়াই কি, কামনাকে সমাহিত করাই কি সকল ভাবনাকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায়?

এখানে
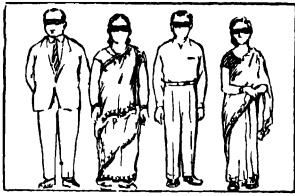
'এখানে আসিলে সকলেই সমান'—দার্শনিক উক্তিটি আবার মনে পড়ে গেল। উক্তিটি ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম এবং পরে কর্মজীবনে এক সহকর্মীকে উদ্ধৃত করতে শুনেছিলাম—শ্মশানে নয় হাওড়া স্টেশনে।

আমি প্রাত্যহিক যাত্রী, লোকাল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। সংগে উক্ত সহকর্মীটি, তিনিও ঐ ট্রেনে যাবেন। অপর প্লাটফর্মে একখানা মেল না এক্সপ্রেস ট্রেন গন্তব্যস্থলে যাত্রার উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে আছে। একজন রেল-কর্মচারীকে ঘিরে খুব ভিড়। কর্মচারীটির হাতে একখানা কাগজ, বুঝলাম রিজার্ভেশন চার্ট। ভিড়ের বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছেন কর্মচারীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

ভদ্রলোককে চিনতাম, বাংলা দেশের স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম। সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিজেই এগিয়ে গেলাম ভিড়ের দিকে। ঠেলাঠেলি করে কোনমতে কর্মচারীটির কাছে পৌছে বললাম, ঐ যে ভদ্রলোক, উনি হলেন ডক্টর—চক্রবর্তী, মস্ত বড়লোক, বাংলার একজন

আর বলার সুযোগ পেলাম না, কর্মচারীটি খেঁকিয়ে উঠলেন,—থামুন মশায়। বড়লোক! ওর চেয়ে ঢের বড় লোক রেলগাড়ী চাপে জানেন?

ভিড় থেকে কর্মচারীটির মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন আমার প্রচেষ্টায় আর অগ্রসর না হ'যে ফিরে এলাম।

আমার সহকর্মীটি ভিড়ের দিকে অর্ধপথ এসছিলেন, আমাকে ঠিক সহযোগিতা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—সৌজন্যবশত। তিনি সবই লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর একটু সাহিত্য খ্যাতি আছে। ফিরে আসতে মন্তব্য করলেন, কেন গেলেন মশাই? —তারপর প্রশ্ন করলেন, স্টেশন প্লাটফর্মে এলে আমার কি মনে হয় জানেন?—অনতিবিলম্বে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন,—এখানে আসিলে সকলেই সমান—ধনী-নির্ধন, মূর্খ-বিদ্বান, বুদ্ধি-জীবী-ভিক্ষাজীবী, বালক-বৃদ্ধ, মাড়োয়াড়ী-বাঙালী, বড়াসাহেব-বেয়ারায় কোন ভেদাভেদ নেই।—তারপর খানিকটা স্মৃতিচারণ করে মন্তব্য করলেন, এমন সাম্য-সংস্থাপক জগতে আর কোথায়?

মনে হল, আজ এই রেল-কাম-বাসের বুকিং অফিসে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় অনুরূপ প্রশ্নই করতেন এবং অনুরূপ উত্তরই দিতেন—হয়ত বা উত্তরে এইটুকু যোগ করতেন: ওয়েস্টভিউ-অলকা-এভারেস্ট-মুন-স্নো-ভিউ-এর অতিথিদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

রেল-কাম-বাসের বুকিং অফিস যাত্রী সাধারণেরই অন্যতম স্থান, তবুও কিন্তু ভদ্রলোককে সেখানে দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম: হোটেলের কোন লোক বা আব কাউকে না পাঠিয়ে নিজে এসেছেন কেন?—এখানে তিনি যেন বেমানান!

করণিকের সামনে দুখানা পৃষ্ঠবিহীন কাষ্ঠাসন বা টুল—এবং উভয়েই অধিকৃত। ফলে আমরা—ভদ্রলোক ও আমি পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তবে আশার কথা যে আর কেউ নেই, সুতরাং বেশীক্ষণ অপেক্ষা কবতে হবে না।

আমাদের সময় এলে আমি আসন দখল করলাম, ভদ্রলোক কিন্তু সম্মুখ দিকে সামান্য অগ্রসর হয়ে পূর্ববৎ দণ্ডায়মান রইলেন। দণ্ডায়মান থাকার জন্যই হোক বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক করণিকের কৃপাদৃষ্টি ভদ্রলোকের দিকেই প্রথম পড়ল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইতে ভদ্রলোক হাতে-ধরা কয়েকখানা টিকিট করণিকের দিকে এগিয়ে দিলেন। তাকিয়েই বুঝলাম AC বা রাষ্ট্রভাষায় বাতানুকুল শ্রেণীর টিকিট।

দূর থেকে এক পলক টিকিটগুলোর দিকে তাকিয়েই করণিক জানালেন,—না, আর কোন খবর আসে নি। কি একটা বলতে গিয়েও ভদ্রলোক থেমে গেলেন। টিকিটগুলো ধীরে ধীরে পকেটে পুরলেন। এইবার আমার দিকে তাকিয়ে করণিকটি বললেন, আপকো আ গিয়া—কনফার্মড্।—তারপর টেবিলের ওপর রাখা একখানা টেলিগ্রাম তুলে আমার হাতে দিলেন।

টেলিগ্রামখানা পকেটস্থ করে, ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। ভদ্রলোক তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।

তিনিই প্রথমে কথা বললেন,—কোথায় উঠেছেন এখানে? বেশ খানিকটা অবাক হলাম। এই প্রথম দেখা নয়, প্রায় রোজই দেখা হয়, কিন্তু আলাপের চেষ্টা আগে ত কখনও করেন নি। আমরাও অবশ্য করি নি, কারণ আমাদের

মনে হয়েছিল যে বাঙালী হলেও আমাদের মত অভাজনদের সঙ্গে আলাপ করতে পরিবারটি যেন অনিচ্ছুক।

আমাদের মত ঐ পরিবারটিও রোজ বিকালে বেড়াতেন আপার মল রোড ধরে। তাঁরা আসতেন প্রধান ডাকঘরের দিক থেকে বাজারের দিকে, আর আমরা যেতাম বাজার থেকে ঐ ডাকঘরের দিকে। পথে হত দেখা। ধরে নিয়েছিলাম যে ভদ্রলোকরা অভিজাত ওয়েস্ট-ভিউ হোটেলেই উঠেছেন, কিংবা কোন আর্মি অফিসারের অতিথি। কারণ, ঐ পথ ক্যাণ্টনমেণ্টের অংশ বলে সাধারণ নাগরিকের বসবাসের বিশেষ সুযোগ নেই। অবশ্য ক্যাণ্টনমেণ্ট-এলাকা পেরিয়ে ঝুলা দেবীর মন্দিরের কাছাকাছি কোন কটেজও ভাড়া নিয়ে থাকতে পারেন।

ভদ্রলোকরা সংখ্যায় চার জন। অনুমান করায় অসুবিধা ছিল না যে স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা সহ ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে তাঁরা রাস্তার ধারের নীচু পাঁচিলে বসতেন, আমরাও বসতাম। দু-এক দিন উভয় পরিবারের দূরত্ব বিশ ত্রিশ গজের বেশী থাকত না। তবুও কিন্তু কোন পক্ষই আলাপের চেষ্টা করে নি। আজই প্রথম আলাপ হল—দুই পরিবারের মধ্যে নয়, দু-জনের মধ্যে।

কোথায় উঠেছেন এখানে?—ভদ্রলোকের এই মামুলী প্রশ্নের উত্তরে একরকম নিস্পৃহভাবেই উত্তর দিলাম, এই এভারেস্ট হোটেলে।

নামটা আভিজাত্যবোধক হলেও হোটেলটা নিম্নশ্রেণীর। বাজারের কাছে সব কটা হোটেলই ঐ রকমের, তবে মুন হোটেলের একটু নামডাক আছে।

—এভারেস্টটা কোথায়?

এবারও সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, ঐ বাজারের ওপর, ঠিক মুনের সামনে।

—একেবারে বাজারের ওপর?

ভদ্রলোকের প্রশ্নে কোন কিছু ছিল কি না জানি না, কিন্তু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। একটু কৃত্রিম হাসি হেসে বললাম, হ্যাঁ, একেবারে বাজারের ওপর। তবে খুবই সস্তা বলে ওখানেই ডেরা বেঁধেছি। ওয়েস্ট-ভিউ-এ থাকবার আর সংগতি কোথায়।

ভদ্রলোক সত্যিই লজ্জিত হলেন: না, না—সেকথা নয়। বলছিলাম যে রাণীক্ষেতে এসে বাজারের মধ্যে থাকা···।—ভদ্রলোক কৈফিয়ত শেষ করতে পারলেন না।

কয়েক পা এগোবার পর ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, কত দিন এসেছেন এখানে ?

—দিন পনেরো।— আমি কিছুতেই সহজ হতে পারছিলাম না।

—নৈনীতাল হয়ে এসেছেন ?

—না, সোজাই এসেছি। ফেরবার পথে দু-এক দিন নৈনীতালে থেকে যাব। —এরপর জানাতে ভুললাম না যে নৈনীতালে আগে বার দু-এক গেছি— অর্থাৎ—বাজারের ওপর সস্তা হোটেলে থাকি বলে একেবারে অপাংক্তেয় অভাজন নই।

হোটেলের দরজা থেকে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। সেই দিনই আবার বিকালে দেখা হল আপার মল রোডে।

সেদিন আমি একা, পরিবারের আর সকলে গেছেন চৌবাটিয়ার আপেল বাগানে। দেখি ভদ্রলোকও একা।

সকালের আলাপ সত্ত্বেও পাশ কাটিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের সম্বোধনে তা আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হল না। আজ একা যে ?—প্রশ্নের উত্তরে বলতে হল, আপনিও দেখছি একা।

—হ্যাঁ, আর সবাই গেছেন চৌবাটিয়া।

আমারও যে আর সবাই গেছেন চৌবাটিয়ায় তা আর তখন জানালাম না।

এবার অভ্যাসমত ভদ্রলোককে অতিক্রম করে যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলাম, ধরে নিয়েছিলাম যে ভদ্রলোকও তাই করবেন। না, তা করলেন না। ভদ্রলোক ফিরলেন। বললেন, চলুন আজ আপনার সংগে বেড়ানো যাক।

প্রস্তাবে ঠিক সায় দিতে না পারলেও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, বেশ ত।

তারপর প্রথমে পদচারণা করতে করতে ভদ্রলোকের সংগে সকালের প্রাথমিক আলাপ পরিণত হল পরিচয়ে এবং পরে পাঁচিলের ওপর বসে সেই পরিচয় হল গভীরতর। ভদ্রলোকের নামধাম ইত্যাদি অনেক কিছুই জানলাম, আর জানলাম কেন তিনি স্বয়ং রেল-কাম-বাসের বুকিং অফিসে গিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক অবশ্য সব খুলে বলেন নি, বলাও সম্ভব ছিল না। বলতে বলতে তিনি থেমে যাচ্ছিলেন, আভিজাত্যের স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তবুও তাঁর মুখ থেকে ইংরেজী-বাংলা মেশানো ছাড়া ছাড়া যা শুনেছিলাম তা থেকে এই রকম একটা কাহিনী হয়ত খাড়া করা যায়:

ভদ্রলোকের নাম না হয় নাই জানালাম ; পদবী ধরুন তরফদার। তরফদার সাহেব পাটনা হাইকোর্টের একজন জজ। আগে ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার, স্বনামধন্য পি. আর. দাসের জুনিয়ার হিসাবে প্রথম জীবনে কাজ করেছেন। বিচারপতি-পদে নিয়োগের যখন প্রস্তাব এল তখন বাড়ীর সবাই লাফিয়ে উঠল। স্ত্রীর ত উল্লাসের শেষ নেই—হাইকোর্টের জজের পত্নী! ভদ্রলোক কিন্তু মোটেই উল্লসিত হন নি। মাসে আট দশ হাজার টাকা উপার্জন ছেড়ে সাড়ে তিন হাজার টাকার জজিয়তি!—তা আবার ইনকাম ট্যাক্স কেটে নিলে হাতে পাওয়া যাবে কত? ইতিমধ্যে পরিবারের চালচলন যা বেড়ে গেছে তাতে ব্যয়সংক্ষেপ করার সুযোগই নেই।

একেবারে দরিদ্র পরিবার থেকে না আসলেও প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে মি. তরফদারকে। কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করেছিলেন। সেখানে সুবিধে না হওয়ায় পাটনায় চলে আসেন। পাটনাতেও প্র্যাকটিশ জমান সহজ হয় নি। কিন্তু প্র্যাকটিশ জমার সঙ্গে সঙ্গেই এল বিপদ—স্ত্রী-পুত্র-কন্যার আভিজাত্যবোধ সমানুপাতিকের চেয়ে অধিক হারে বেড়ে উঠতে লাগল। ফলে সংসারনির্বাহের ব্যয়ও বাড়তে লাগল কল্পনাতীত ভাবে। তবুও যতদিন প্র্যাকটিশ করতেন সামাল দিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি ; বরং কিছু সঞ্চয়ও করতে পেরেছিলেন। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি বলে অভিহিত হবার পর থেকেই শুরু হয়েছে বিড়ম্বনা। এই দুর্মূল্যের দিনে জজিয়তির বেতন থেকে চালচলন বজায় রাখা অসম্ভব। সঞ্চিত অর্থের একটা মোটা অংশ শেষ হয়ে গেছে। একটি মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পেরেছেন, কিন্তু আরও একটি আছে। তার কি হবে? ছেলেটি খড়গ্‌পুরে আই. আই. টি-তে পড়ে, এখনও এক বছর বাকি। ছোট সংসার তাই রক্ষা।

প্র্যাকটিশ-জীবনে তরফদার সাহেব প্রতি বৎসর দশেরা-দেওয়ালীর সময় সপরিবারে বেড়াতে বেরোতেন। কিন্তু যেতেন ফার্স্ট ক্লাসে, থাকতেন দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলে। এখন আর ফার্স্ট ক্লাসে চলে না—চাই এয়ারকণ্ডিসন্‌ড্‌, আর হোটেল সম্পূর্ণ অভিজাত। এয়ারকণ্ডিসন্‌ড্‌ বলে হিল কনসেসনও পাওয়া পাওয়া যায় না।

এই উন্নাসিকতা ধীরে ধীরে এত বেড়ে উঠেছে যে বাইরে বেড়াতে এসে বাঙালী পরিবার দেখলে আনন্দিত হবারই কথা, কিন্তু সমমর্যাদার না হলে

আনন্দ প্রকাশ পায় না, আর কি ধরনের হোটেলে অপর বাঙালী পরিবারটি অবস্থান করছেন তাই হল সেই পরিবারের মর্যাদার পরিচায়ক। এই রাণীক্ষেতে একমাত্র অভিজাত হোটেল হল ওয়েস্ট-ভিউ। সেখানে না উঠে যাঁরা বাজারের কাছে কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে আস্তানা নেন, জজসাহেবের পরিবারেব কাছে তাঁরা সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়। এর চেয়ে বরং কোন কটেজ ভাড়া নিয়ে থাকা ভালো—কটেজ ভাড়া নেওয়া আভিজাত্যের অন্য এক দিক।

জজসাহেব অবশ্য পুরোনো দিনের কথা ভুলতে পারেন নি। প্রবাসে এসে বাঙালীদের সঙ্গে আলাপসালাপ করবাব জন্যে তাঁর মন ছুঁক ছুঁক করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। এয়াবকণ্ডিসনড্ কোচে ভ্রমণের সংগতি নেই, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে তা জানাতেও সাহসে কুলোয় না। একটা ভ্রান্ত মর্যাদাবোধের বন্দিত্ব পীড়া দিলেও তিনি কিছু করতে অক্ষম।

এবার তাঁবা এসেছিলেন সোজা নৈনীতালে, উঠেছিলেন মেট্রোপল হোটেলে। চার্জেস ওয়েস্ট-ভিউ-এরই মত, তবে নৈনীতালে স্ত্রী-কন্যার শপিং-এ আতংকিত হয়ে বুঝিয়েসুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন।

রাণীক্ষেতেব নামডাক আছে, ওঁরা আপত্তি করেন নি। কিন্তু এখানে এসে সবকিছু দেখে হতাশ হয়েছেন। লেক না হয় নাই থাকল—রিক্সা নেই, কেনাকাটা করার মত দোকানবাজারও নেই। শুধু পাহাড়-জংগল আর শ্লো-বেঞ্জ দেখে ক-দিন কাটানো যায়? তাই তাঁরা ফেরার জন্য ব্যস্ত।

তরফদার সাহেবেরও পূর্ণ সম্মতি, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ট্রেনে রিজার্ভেশন নিয়ে। পাটনা থেকেই ফেরবার রিজার্ভেশন কবেছিলেন; এখন আগে ফেরা ঠিক হওয়ায় সেই রিজার্ভেশন বাতিল করে নতুন রিজার্ভেশন করতে হবে। কাঠগুদাম থেকে লক্ষ্ণৌ অবধি রিজার্ভেশন পাওয়া গেছে, পাওয়া যাচ্ছে না লক্ষ্ণৌ থেকে পাটনা পর্যন্ত। পাটনায় অমৃতসর মেল পৌছোয় রাত্রি ১০টা নাগাদ। লক্ষ্ণৌ থেকে ফার্স্ট ক্লাসে গেলেই হয়, রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ত ফার্স্ট ক্লাসে কোন রিজার্ভেশন নেই। আরও এক ঘণ্টা কোনমতে করিডরে কাটিয়ে দিলেই চলে, বার্থের অধিকারীরা ঘণ্টাখানেক পরেও বিছানা পাততে রাজী হতে পারেন। এতেও খরচও কিছু বাঁচবে—লক্ষ্ণৌ থেকে পাটনা এ. সি ও. ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়ার মধ্যে পার্থক্যটা পরে ফেরত পাওয়া যাবে। প্রস্তাবে কিন্তু কেউই

রাজী নন। পাটনায় ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামবার পর আর্দালী ড্রাইভার ত দেখবেই, কিন্তু পরিচিত অন্য কেউ যদি দেখে ফেলে! তার চেয়ে যতদিন এয়ারকণ্ডিসন্‌ড্‌ কোচে রিজার্ভেশন না পাওয়া যায় ততদিন রাণীক্ষেতেই থাকা ভাল। কিন্তু তার অর্থ হোটেলের বিলের আকার দিন দিন স্ফীত হওয়া। তাই জজসাহেব রোজই হোটেল থেকে লোক পাঠান রিজার্ভেশনের খবর আনতে। রোজই নেতিবাচক উত্তর শুনে আজ নিজেই গিয়েছিলেন বুকিং অফিসে। পরিবারের সকলকে জানিয়ে যেতে সাহস করেন নি, বলেছিলেন, বেড়াতে যাচ্ছি।

কন্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সকালেই?—মিঃ তরফদার উত্তর দিয়েছিলেন, হোটেলে বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

এবার কন্যার প্রস্তাব হল, তার চেয়ে চলো বাপি নৈনীতালে ফিরে যাই। —'আচ্ছা পরে ভাবা যাবে' বলে দুরুদুরু বুকে ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়েছিলেন বুকিং অফিসের দিকে।

জজসাহেব হয়ত আরও কিছু বলতেন, থেমে গেলেন চৌবাটিয়ার বাসখানা সামনে দিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল দেখে। বললেন, বাসখানা বোধহয় চৌবাটিয়া থেকেই আসছে, দেখি ওরা এই বাসে ফিরলেন কিনা।

ফেরার পথে ভাবছিলাম, মিঃ তরফদার সত্যিই কি আমার কাছে মন হাল্কা করেছিলেন, না কিছুটা শুনতে শুনতে আমিই কল্পনা-বিলাসী হয়ে উঠেছিলাম।

রাত্রে স্ত্রীর মুখে শুনলাম, চৌবাটিয়ার জজসাহেবের পরিবারের সংগে আমার পরিবারের দেখা হয়েছিল, কিন্তু আলাপ হয় নি। তবে জানা গেছে, ভদ্রলোকেরা নাকি কালই নৈনীতাল ফিরে যাচ্ছেন। কিভাবে জানা গেল তা ব্যক্ত করে আমার স্ত্রী বলেছিলেনঃ ক্যান্‌টিনের সামনে এ্যাপ্‌ল জুইস-এর গ্লাস নিয়ে ভদ্রলোকের কন্যা তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মাম্মী! তা'হলে কালই আমরা নৈনীতালে ফিরে যাচ্ছি?—মা উত্তর দিয়েছিলেন, নয় ত কি এইরকম গ্লুমি জায়গায় আরও থাকতে হবে?—মেয়ে সমর্থন করে বলেছিল, যা বলেছ মাম্মী,—নৈনীতাল ইজ গে।

দিন কয়েক পরে নৈনীতালেই আবার আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে দেখা হয়েছিল। রাণীক্ষেত বাসে নৈনীতালে পৌঁছে নামবার ব্যবস্থা করছি, দেখি গমনোন্মুখ ইউ. পি. রোডওয়েজের একটা ট্যাক্সিতে তরফদার পরিবার। ট্যাক্সির মাথায় মালপত্র সাজানো। পেছনের সীটে জানালার ধারেই জজসাহেব বসে, তিনিও আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মুখে যেন একটু হাসিও ফুটে উঠেছিল। তারপর ডান হাতটা তুলে পরিচয়ের স্বীকৃতি জানাতে গিয়েও হাতটা না বয়ে ফেলে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন।
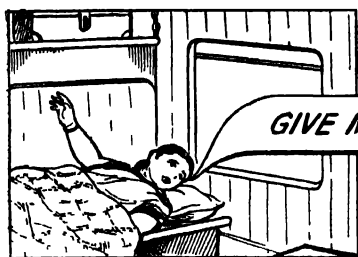
দীর্ঘ ছ-ফুট কি তারও বেশী শিখ সৈনিকটি যখন এসে সিমলা-কালকার বাসে উঠল তখন তার দিকে খানিকক্ষণ না চেয়ে থাকতে পারি নি। তখনও জওয়ান শব্দটি চালু হয় নি, কিন্তু তাকে দেখে জোয়ানেরই প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। সুন্দর সুঠাম দেহ, কিন্তু পদক্ষেপে কি যেন একটা ত্রুটি আছে। তাকে তুলে দিতে আরও দু-জন সৈনিক এসেছিল। তাদের সঙ্গেও বিদায়-সম্ভাষণও ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। মোটকথা, সৈনিকটির ছিল কেমন যেন এক ভীত, সন্ত্রস্ত ভাব যা তার চেহারা বা পেশা কোনটির সংগেই খাপ খায় না।

বাস স্টার্ট দিতে সৈনিকটি যখন তার নির্দিষ্ট আসন অধিকার করল তখন তার মুখে আতংক আরও সুপরিস্ফুট। সে কি সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কোন কিছু জবাবদিহি করতে যাচ্ছে? তা হলে তখন ত বন্দী অবস্থায় যেতে হত। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

সৈনিকটি আমার এক সীট সামনে জানলার ধারে বসেছিল, তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙা। বাস ছাড়ার সংগে সংগেই সে তা থেকে একটা ছোট লেবুর টুকরো বার করে চুষতে লাগল। সেটা শেষ হতে আর একটা। এইভাবে লেবু চুষতে চুষতে সে জানলায় মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

এবার ব্যাপারটা অনুমান করলাম, এবং অনুমান যে সত্য তার প্রমাণ পেলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। সবে মনে হয় তারাদেবী ছাড়িয়েছি এমন সময় সে চিৎকার করে উঠল, রোকো, রোকো!

বাস থেমে গেল, কণ্ডাক্টার চেঁচালে—কেঁও; ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, কা হুয়া?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সৈনিকটি টলতে টলতে কোনরকমে নেমে গেল। নামতে না নামতেই রাস্তার ওপর উদ্গিরণ—রাস্তার পাশে যাওয়া আর সম্ভব হল না। কে একজন বলে উঠল শুনলাম, চক্কর। আর একজন টিপ্পনী কাটলে, সিপাহী কো ভি চক্কর—তাজ্জব কা বাৎ! তৃতীয় জন প্রতিবাদ করলে, সিপাহী

হোনেসেই ছোড় দেগা ? চক্কর কিসিকো ছোড়তা হ্যায়, চাই সিপাহী হো আর লাটসাহেব হো।

লোকটির কথা আবার মনে পড়ল সরলা মাসী ওরফে বড়দির ঘটনায়—মনে পড়ল চক্কর সিপাহীকে ছাড়ে না, লাটসাহেবকেও ছাড়ে না, আর দেখলাম যে সরলা মাসী সদৃশ বড়দিকেও ছাডে না।

সরলা মাসী তাঁর নামই নয়, নামটা দিয়েছিলেন আমারই সংগী বন্ধু। ভদ্রমহিলার অনেক কিছুই নাকি বন্ধুর বাল্যস্মৃতিতে চিরস্থায়ী ভাবে অংকিত বরিশালের কোন এক গ্রামের গ্রামিকা সরলা মাসীর মত। এই সরলা মাসী অবশ্য গ্রামীণা নন, রীতিমত নগরবাসিনী। সহযাত্রীদের কথাবার্তা থেকে পেয়েছিলাম তাঁর সামাজিক পরিচয়। তিনি বড়দি—অর্থাৎ কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা—খড়গ্‌পুর না আসানসোলের ঠিক মনে নেই।

বড়দি ঠিকে ভুল করেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি তাঁর জন্যে আগে থেকে রিজার্ভ করে প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কেটেছিলেন, ভেবেছিলেন বোধ হয় ৩নং সীটটি জানলার ধারেই হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলেন যে ১নং থেকে শুরু করে ২, ৩ পার হয়ে ৪নং সীটই হল জানলার ধারের। ঐ ৪নং সীটটি পেয়েছিলাম আমি, আর ঠিক তার পেছনে জানলার ধারের ৫নং সীটটি আমার বন্ধুর ভাগ্যে জুটেছিল। প্রথম শ্রেণীর আর পাঁচখানা সীট দখল করেছিলেন কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক—সকলেই অবাঙালী। বড়দির দলের আর সকলের ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পৌছোবার সংগে সংগেই বড়দির ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল যেন নিয়মানুবর্তিতা নারীরূপ ধারণ করে আমাদের সম্মুখে বিরাজ করছে।

প্রথমে তিনি তাঁর দলকে লাইন দিয়ে দাঁড় করালেন, তারপর টানা রিক্সা

থেকে কুলিদের দিয়ে মাল নামিয়ে যার যার কাছে রাখবার ব্যবস্থা করে হুকুম দিলেন : অনীতা, ঝর্ণা তোমরা সবাই ছোট ছোট জিনিস হাতে হাতে নাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালিত হলে ভদ্রমহিলা তাঁর ঝোলানো হাতব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করে মেলাতে শুরু করলেন : ওয়াটার বটল্ ন-টা—কার কার কাছে ? টিফিন কেরিয়ার পাঁচটা—বড়দি খাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেন—কার কার কাছে ?—প্রতিবারই দম দেওয়া পুতুলের মত হাত উঠতে লাগল, আর বড়দি হিসাব-পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হওয়ার পর খাতায় টিক দিয়ে চললেন।

ছোট জিনিসগুলো মেলান হয়ে গেলে ভদ্রমহিলা আর-এক দফা ফরমান জারি করলেন : এবার বড় মালগুলো তোলার ব্যবস্থা কর,—তারপর একজন সংগিনীকে সম্বোধন করে বললেন, শেফালী তুমিই লেবেলের নম্বরে মিলিয়ে দেখ, মালগুলো ঠিক উঠল কিনা। হায়ার সেকেণ্ডারী ক্লাসের অংকের টিচার তুমি,—তুমিই পারবে।

শেফালী নাম্নী সংগিনী উত্তর দিলেন, ঠিক আছে বড়দি, আমিই দেখছি।

লেবেলের নম্বর মিলিয়ে দেখবার জন্যে হায়ার সেকেণ্ডারী ক্লাসের অংকের টিচারের বোধ হয় প্রয়োজন হয় না, তবে উক্তির ঐ অংশটুকু তাৎপর্যহীন নয়। স্পষ্টই বোঝা গেল, দলটি যে কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার দল এবং তদারক-কারিণী যে ঐ বিদ্যালয়ের বড়দি, তা জানাবার জন্যই আদেশের সংগে ঐ আপাত অসঙ্গত অংশটুকু যোগ করা।

ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে মাল উঠতে লাগল, আর শেফালী নাম্নী মহিলা লেবেল দেখে মেলাতে লাগলেন এক দুই তিন……। হঠাৎ দেখা গেল, একটা লেবেলের আধখানা ছেঁড়া, মাত্র বাঁ দিকের ১ সংখ্যাটি রয়েছে। বড়দির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা এড়াল না। তিনি কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার হোল্ড-অল ?

—আমার বড়দি, দলের একজনের কাছ থেকে উত্তর এল।

—কত নম্বর ?—বড়দির স্বর কঠিনতর।

—তের, উত্তরের স্বর অতি মৃদু।

—আনলাকি থার্টিন,—মন্তব্যের সংগে সংগে আবার প্রশ্ন, তা লেবেলটা যে ছিঁড়ে গেছে, লক্ষ্য কর নি ?

—না বড়দি, হোটেলে ত ঠিকই ছিল।—ভদ্রমহিলার সুস্পষ্ট আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টা।

জবাবদিহি মেনে নিয়ে বড়দি আদেশ দিলেন, থাক্, কাঠগুদামে গিয়ে লেবেল এঁটে নিও, একস্ট্রা লেবেল বাসবীর কাছে আছে।

স্ট্যাণ্ডে এমনিতেই বাস ছাড়ার সময় বলে ভিড় ছিল, তার ওপর এই চলমান নাটকের অভিনয় দেখতে এদিক ওদিক থেকে অনেকে এসে জমা হয়েছিল। তবে ভাগ্য ভাল যে জুন মাস বলে বাঙালী বিশেষ ছিল না। ভাবলাম যদি বেংগল সীজন বা পুজোর সময় হত তবে কি হত? বডদির খ্যাতি দিক থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পডলেও সেই খ্যাতির মাশুল কত পরিমাণে তার সহকর্মিণীদের দিতে হত? পরিচিত কারও সংগে দেখা হয়ে গেলে যে-কোন ভদ্রমহিলার পক্ষে হয়ত বড়দির অধীনে আর কাজ করাই সম্ভব হত না।

মাল তোলা হয়ে গেলে বড়দি লাইন দিয়ে তাঁর দলকে বাসে ওঠালেন, নির্দেশ দিলেন: যে যার সীট-নম্বর দেখে বস। তারপর উঠলেন নিজে এবং টিকিটখানা হাতে নিয়ে তাঁর সীট-নম্বর খুঁজতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আমরাও উঠে বসেছি।

৩নং সীট জানলার পাশে নয় দেখেই বডদি গুম হয়ে গেলেন। একবার জানলার পাশে ৪নং সীটে উপবিষ্ট আমার প্রতি রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাঁক দিলেন, কণ্ডাক্‌টার, কণ্ডাক্‌টার!

কণ্ডাক্‌টার তখনও ওঠে নি। সাড়া দিল না দেখে বড়দি নিজেই নেমে গেলেন।

পাশেই রোডওয়েজের অফিস। একটু পরেই সেখান থেকে ভদ্রমহিলার গলা শুনতে পেলাম: What nonsense...I will report the matter to the authorities...।—ওদিকে রোডওয়েজের কোন কর্মচারী যে তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন তাও বুঝলাম।

সামান্য কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করছি পেছনের সীট থেকে আমার বন্ধু প্রায় আমার কানে কানে বললেন, ঠিগ যেন আমাগো গইলা গেরামের সরলা মাসী, ত্যামনিই ইম্পিরিয়াস।

বড়দি ফিরে এলেন—একা নয়, রোডওয়েজের একজন কর্মচারীকে সংগে

নিয়ে। কর্মচারীটি আমাকে বললেন, মেহেরবানি করে যদি ভদ্রমহিলার সংগে স্থান-বিনিময় করি।

যদি বড়দি নিজে ঐ অনুরোধ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই রাজী হতাম। স্বাভাবিক আকর্ষণ সত্ত্বেও জানলার ধারের সীট কখনই অপরিহার্য মনে করি নি, কিন্তু ভদ্রমহিলা যখন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমাকে অধিকারচ্যুত করতে চাইলেন, এবং তাতে সমর্থ না হয়ে অনুরোধের আশ্রয় নিলেন, তখন আমারও মন বিগড়ে গেল। কর্মচারীটিকে দুঃখের সঙ্গে জানালাম যে স্থান-বিনিময় করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

কর্মচারীটির তখন দৃষ্টি পড়ল এবং সীটে বসা আমার বন্ধুর ওপর। 'আপ্ ?'—বলে সে প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইতেই বন্ধু বলে উঠলেন, মাপ্ কিজিয়ে ।

কর্মচারীটি আর কোন প্রচেষ্টা না করে বড়দির দিকে চেয়ে নির্বাক ইংগিতে অপারগতা জ্ঞাপন করে নেমে গেলেন। অগত্যা ভদ্রমহিলা আমার পাশে এসেই বসলেন। বন্ধুর একটা চাপা হাসি কানে এল, বোধহয় বড়দি তা শুনতে পান নি।

বাস স্টার্ট দিতেই ভদ্রমহিলা হাত তুলে কাকে প্রণাম করলেন—লেকের ওপারে নৈনী দেবীকে, না বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে, না দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে, না যাত্রা বামনদেবকে—জানি না।

খানিকটা যাওয়ার পরেই বড়দির অবস্থা দেখে সন্দেহ হল। মুখচোখের ঐ ভাব যে আমি চিনি। লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলা অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। মনে ভয় হল, পাশেই আমি বসে, যদি তিনি সামলাতে না পেরে……। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় বলেই ফেললাম, আপনি বোধহয় অসুস্থ বোধ করছেন। জানলার ধারে বসবেন ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বড়দি একবার আমার দিকে চাইলেন, কিন্তু পর্যাপ্ত তীক্ষ্ণতা যেন কিছুতেই ফুটে উঠল না। তবুও তিনি কিন্তু মচকালেন না,—No, thank you, বলে প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

এর পর আর কি বলা যায় ? নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে সতর্ক হয়ে বসে রইলাম।

লক্ষ্য করলাম অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে—প্রাণপণ চেষ্টা করেও ভদ্রমহিলা অবস্থা আয়ত্তে রাখতে পারছেন না। হঠাৎ তাঁর ওষ্ঠ-দুটি ঈষৎ কম্পিত হয়ে দুটি অর্ধস্ফুট শব্দ নির্গত হল: একটু জল।

প্রায় লাফিয়ে উঠে আমিই চীৎকার করে উঠলাম, রোখো, রোখো—বাস রোখো।

বাস থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে বিস্মিত ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, ক্যা হুয়া ?

'বিমারি' বলে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে পিছন ফিরে বড়দির সংগিনীদের প্রায় আদেশই দিলাম: এঁকে একটু বাইরে নিয়ে গিয়ে মুখচোখে জল দিয়ে আনুন ত।

ন-টা জলপাত্র নিয়ে বোধহয় ন-জনই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ন-জনই এগিয়ে এলেন তাঁদের বড়দির দিকে।

ধরাধরি করে নামাবার সময় সতর্ক করে দিলাম, জল খাওয়ানোটা ঠিক হবে না, শুধু মুখচোখ ভাল করে ধুইয়ে দিন। একটু হাওয়া লাগলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বড়দি নেমে যাওয়ার পর বন্ধুর মন্তব্য কানে এল: সরলা মামী কাইং।

কিছুক্ষণ নিষ্ফল উদ্গিরণের প্রচেষ্টা করে, চোখে মুখে জল দিয়ে বড়দি যখন ফিরে এলেন, তখন অনেকটা সামলেছেন দেখলাম। আবার আমি স্থান-বিনিময়ের প্রস্তাব করলাম, এবং শুধু 'Thank you' শুনে সরে ৩নং সীটেই বসলাম। তাঁর নতুন সীট দখলের জন্যে আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় বড়দি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ সন্দেহ নেই।

বাস চলার কিছুক্ষণ পরে বেশ বোঝা গেল বড়দির অবস্থার আবার অবনতি ঘটছে। এবার অবশ্য আমার বিপদের আশংকা কম, কারণ তিনিই জানলার ধারে বসে।

এবার বাস আপনা থেকেই থামল। জেলীকোট এসে গেছে।

জেলীকোট পেয়ারা ও গোঁড়া লেবুর জন্য বিখ্যাত। পেয়ারা ও লেবুর সাজি নিয়ে বাসের কাছে 'আমরুদ', 'নিম্বু' বলে হাঁকতেই বড়দি নিমীলিত চক্ষে বললেন, একটা লেবু।

বীটলবণমিশ্রিত দুই খণ্ডে বিভক্ত একটু লেবু ভদ্রমহিলার হাতে আমিই দিলাম। তিনি রসাস্বাদন না করে ঘ্রাণেই লিপ্ত হলেন।

বাস আবার ছাড়ল। এতক্ষণ বড়দি জানলায় মস্তক রক্ষার প্রচেষ্টা করছিলেন, এবার বিপরীত দিকটাই তাঁর কাছে কাম্য বিবেচিত হল—বড়দি আমারই স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করলেন। বোধহয় জানলার কাঠের চেয়ে আমার কাঁধ প্রশস্ততর বলে। পিছন থেকে বন্ধুর যেন সামান্য হাসিও কানে এল।

এই রকম সসেমিরায় কখনও পড়ি নি। আগের বার জানলার ধারের সীট ছেড়ে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেছিলাম, কিন্তু এবার নিষ্কৃতির পথ কি?—ভেবে পেলাম না। ভদ্রমহিলা যখন বাস থেকে নেমেছিলেন তখন যদি উদ্গিরণ প্রচেষ্টায় সফল হতেন তাহলেও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। উপায়ান্তর-বিহীন হয়ে আমিই এবার সর্ববিপদ্‌তারণ মধুসূদনকেই স্মরণ করলাম।

কিন্তু তাতেও কিছু হল না, বাস একটা বাঁক নিতেই বড়দি একেবারে লুটিয়ে পড়লেন আমার বুকে। বিসদৃশ অবস্থার জন্যেই হোক, গুরুভারের সংঘর্ষের দরুনই হোক, আবার চিৎকার করে উঠলাম,—বাস রোকো।

ড্রাইভার বিনা বাক্যব্যয়েই বাস বাঁধল। কোণের সীট থেকে কণ্ডাক্টার উঠে এসে বলল, উধার নল হ্যায়, উধার যা কর··

তাঁর দু-তিন জন সংগিনীর সহায়তায় বড়দিকে ধরাধরি করে নামানো হল। জায়গাটা চিনতে পারলাম, নাম দোঁ-গাও, কাঠগুদাম থেকে চড়াই-এর পথে দম নেবার এবং জলপান করাবার জন্যও অনেক সময় ড্রাইভাররা বাস থামায়।

বড়দিকে নল বা পাইপ দিয়ে প্রবাহিত-করা ঝরনার জলের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। এবারও নিস্ফল প্রচেষ্টা। তবে এবার আমি কৌশলে অব্যাহতি লাভ করলাম। বড়দিরই এক সংগিনীকে তাঁর পাশে বসিয়ে আমি দখল করলাম সেই ভদ্রমহিলার দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন।

ভালয় ভালয় নয়, কোন রকমে কেটে গেল বাকী পথটুকু। কাঠগুদামে বাস থামা মাত্রই বড়দি নামবার চেষ্টা করলেন, নামলেনও। তবে সংগে সংগেই······।

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল মাল নামিয়ে নেবার জন্যে তারা ছিটকে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াল, কেউ-বা নাসিকা আবৃত করল।

বড়দির দলই ধরাধরি করে তাঁকে ওয়েটিং রুমে নিয়ে গেল।

প্লাটফর্মে গাড়ী লাগার পর আমরা উঠলাম। ওদিকে দেখি বড়দির দল তাঁদের নির্দিষ্ট কামরার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এবং বড়দি চলছেন দু-জন সংগিনীর কাঁধে ভর দিয়ে।

গাড়ী ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে মনে হল বড়দি কেমন আছেন খোঁজ নিলে হত। প্রথমটা গররাজী হলেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে বন্ধুকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। একটা লেডিজ কম্পার্টমেণ্ট, বড়দির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্যে যে রিজার্ভ করা তা গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা আছে।

কামরার কাছে কয়েক জন 'আসুন' 'আসুন' বলে আহ্বান করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, সহকর্মিণীরা তাঁদের বড়দির জন্যে ভাল ব্যবস্থাই করেছেন। দুটো বেঞ্চের মাঝখানে বাক্সতোরঙ্গ রেখে তার ওপর হোল্ড-অল বিছিয়ে একটা বেশ বড় বিছানা, আর বিছানায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শুয়ে আছেন বড়দি। তাঁর চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত থাকলেও তিনি যে নিদ্রা যাচ্ছেন না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

নিমীলিত চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হয়ে গেল। ঐ অবস্থায় যতদূর সম্ভব পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাদের দেখে বড়দি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর চোখমুখের ভাব পরিবর্তিত হতে লাগল। তারপর যেন সমস্ত অন্তঃশক্তি সংগ্রহ করে, চক্ষুদ্বয়কে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন: লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে উঠেছেন কেন? Don't you know...?

বড়দি শেষ করতে পারলেন না, অবসন্ন হয়ে চক্ষুদ্বয় আবার মুদ্রিত করে অতি মৃদুস্বরে বললেন,—অনীতা, একটু জল!

চার্বাক

গৈরিক বসনধারী কাউকে যদি সর্বসমক্ষে সানন্দে কুক্কুট-মাংস ভক্ষণ করতে দেখা যায় তবে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কথা। কারণ, গৈরিক বসন হল ত্যাগেরই প্রতীক; সুতরাং ঐ বর্ণের পরিচ্ছদধারীর পক্ষে কোন কিছুতে লোভ থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। তার ওপর কুক্কুট-মাংস সমাজে চালু হলেও কোন সন্ন্যাসী তা লোকচক্ষুর সামনে সানন্দে ভোজন করছেন, এরকম কল্পনা করতেও বেশ একটু অসুবিধা হয়। তাই আলমোডার ডাকবাংলোয় গৈরিক বসনধারী ভদ্রলোককে তারিফ করে কক্কট-মাংস আস্বাদন করতে দেখে ভদ্রতার গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর দিকে বারবার না তাকিয়ে পারি নি।

তিনিও আমাদেব লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু মুখে ছিল উপেক্ষার ভাব—যেন দুনিয়াব কোন রহস্য বুঝতে তাঁর বাকী নেই। অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ নীরব কর্মী ছিলেন না, মাঝে মাঝে ঐ উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহারপ্রসূত তৃপ্তিসূচক শব্দ করছিলেন আর ডাকবাংলোর চৌকিদারকে আদেশ দিচ্ছিলেন: একঠো মিরচা লে আও ত বাবা, আউর থোডা আউর, কিংবা মনসুর, আউর জুস হ্যায়?—ইত্যাদি।

বারান্দাতেই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল—গৈরিক বসনধারীর নির্দেশে কিনা, জানি না। তবে পরিবেশ যে মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। ডাকবাংলোর সামনে থেকে পাহাড ঢালু হয়ে কোশী নদীতে নেমে গেছে, বাঁ দিকে তুষারধবল শৃংগ—যা দেখতে লোকে কৌশানীতে ভিড করে, ডান দিকের টিলায় উদয়শংকরের অধুনালুপ্ত সাধনাকেন্দ্র। এ হেন পরিবেশে সাধারণ ভোজনও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

গৈরিক বসনধারীর অবশ্য এ-ব্যাপারে কোন অনুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। ভোজনস্থান হিসাবে বারান্দা নির্বাচন তাঁরই নির্দেশে হয়ে থাকলে, নির্বাচনের কারণ বোধহয় ছিল রৌদ্রতাপের আরাম উপভোগ করার ইচ্ছা। তিনি বারান্দার কোণে রৌদ্রের দিকেই পৃষ্ঠ প্রসারিত করে বসেছিলেন। আর আমরা—আমি ও আমার বন্ধু—বসেছিলাম তাঁর থেকে হাত-দশেক দূরে আমাদেরই ঘরের দরজার সামনে।

আমাদের ভোজ্যে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায় ভোজনপর্ব আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। নাহানে কা আগাড়ি আউর ভোজন কা পিছাড়ি শীতের অনুভূতি বেশীই হয়। তাই আমরা বারান্দা থেকে নেমে রোদে পায়চারি করছিলাম। এমন সময় কানে গেল, মনসুর ! পান লে আয়া ?

মনসুরের কণ্ঠও শুনলাম, জী, মহারাজ !

মহারাজ সম্বন্ধে স্বাভাবিক কৌতূহল সত্ত্বেও ইচ্ছে করেই একটু দূরে চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ পশ্চাতে পদশব্দ শুনে ফিরে দেখি মহারাজ আমাদের দিকেই আসছেন। বুঝলাম, শেষ অক্টোবরের খোলা রোদ তাঁকেও আকর্ষণ করেছে।

অগ্রসর হতে হতে আমাদের সম্বোধন করে মহারাজ বললেন, রোদ্দুরটা বেশ মিষ্টি, নয় ?—

মহারাজ যে বাঙালী তা তাঁর হাবভাব, হিন্দি বাচন থেকে অনুমান করে নিয়েছিলাম। সুতরাং সম্বোধনের ভাষায় অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু জবাব কিভাবে দেব তাই ভাবছিলাম। আমার বন্ধুরও বোধহয় ছিল একই সমস্যা। এমন সময় আমার কানে এল, বা ! বেশ লাগছে !

এবার বন্ধু বলে উঠলেন, গুরুভোজনের পর মিষ্টি রোদ্দুর ঐ রকমই লাগে, মহারাজ !

—মহারাজ !—গৈরিকবসনধারী হো হো করে হেসে উঠলেন,—মহারাজ-টহারাজ নই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জোচ্চোর-বদমাশও নই।

খোঁচা খেয়ে বন্ধু চুপ করেন গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, সাধু লোকেরা—সন্ন্যাসীরাই গৈরিক বসন ধারণ করে জানি, আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের রাজার রাজা—মহারাজ বলেই ডাকা হয়। তা আপনার যদি আপত্তি থাকে……।

—না, আপত্তি কিসের ? মহারাজ বলেও ডাকতে পারেন। তবে কি জানেন, আমি সন্ন্যাসী নই।

বিশেষ অবাক হলাম। আমার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মহারাজ বললেন, দাঁড়ান।—তারপর হাঁক দিলেন, মনসুর, মনসুর !

মনসুর আসার পর আদেশ দিলেন তাঁর ঘরে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই আনতে। সিগারেট-দেশলাই আসার পর মহারাজ আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, চলে নিশ্চয়ই। তবে আমার একেবারে রয়্যাল ব্রাণ্ড—চারমিনার, চলবে ?

মহারাজের সঙ্গে মিতালী করার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু রয়্যাল ব্রাণ্ডের উল্লেখে প্রত্যাখ্যান করাটা অভদ্রতা হবে বলে বললাম, ঐ ত আজকাল অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ব্রাণ্ড—দিন।

বন্ধুটি আমার ধূমপানে ঠিক অভ্যস্ত নন, তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যানই করেন। সিগারেট ধরিয়ে দু এক টান দিয়েছি আর ভাবছি যে মহারাজ তাঁর গৈরিক বসনের রহস্য উদ্ঘাটন করবেন এমন সময় তিনি বলে উঠলেন, না ঘুম পাচ্ছে। আমার আবার একটু দিবানিদ্রা ভালই লাগে।

—গুরুভোজনের পর ত বটেই, বন্ধু মন্তব্য করলেন।

যেন কানে পৌঁছোয় নি এমনভাবে মহারাজ বারান্দায় উঠে গেলেন।

রাত্রে যার যার ঘরেই খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আলমোড়ার শীত বেশী না হলেও অক্টোবরের শেষ দিকে রাত্রে বারান্দার বদলে ঘরে বসেই ভোজনপর্ব সমাধা করা বেশী আরামপ্রদ। তবে এই ব্যবস্থা মনসুর করেছিল, না মহারাজ করেছিলেন, জানি না। অন্তত আমরা করতে বলি নি।

ভোজনে বসে ছাগ বা মেষ মাংসের সংগে একপাত্র কুক্কুট মাংস দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম। আমরা ত এ-রকম কোন নির্দেশ দিই নি। জিজ্ঞাসা করাতে মনসুর উত্তর দিয়েছিল, মহারাজমে ভেজা।

—মহারাজমে ভেজা?—আমাদের বিস্ময়ের পরিমাণ স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

—জী, হ্যাঁ—মনসুর ব্যাখ্যা করেছিল, উনি লোক ওহি ইস্পিসাল ডিশ্‌কা ওয়র্ডার দিয়ে থে।

বুঝলাম। কিন্তু আমাদের ওপর এত মেহেরবানি কেন?—মনসুর তার কোন জবাব দিতে পারলে না।

জবাব পেলাম পরদিন বারান্দায় প্রাতর্ভোজনের টেবিলে বসে। মনসুর তখনও কোন কিছু আনে নি। আগের দিনের মতই মহারাজ বসেছিলেন বারান্দায় এক কোণের টেবিলে একা। আমরা বসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রামপাখীর মাংস কেমন খেলেন? একটু শক্ত ছিল, না?

—না, ভালই ছিল,—বন্ধু বললেন, কিন্তু আমাদের পাঠিয়েছিলেন কেন, বলুন ত।

—It was just an exchange—মহারাজের মুখে সামান্য হাসি। আমরা কিন্তু উক্তির তাৎপর্য কিছুই বুঝলাম না।

আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মহারাজ ব্যাখ্যা করলেন: কাল আপনাদের মটন খানিকটা চেখে দেখেছিলাম, আর তার বদলে একটু ফাউল পাঠিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হবার পর বাক্যস্ফূর্তি হতে বেশ দেরী লাগল। প্রথমে বন্ধুই কথা বললেন, আইডিয়া মন্দ নয়—যাকে বলে direct quid pro quo।

মহারাজ দেখলাম বেশ শিক্ষিত। বললেন, একরকম সুবিধা বিনিময়ই বটে, তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক আনুষ্ঠানিক নয়।

—তার মানে?—স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—মানে অতি সহজ, মহারাজ উত্তর দিলেন.—আপনাদের সংগে আত্মীয়তা পাতাতে চাইছিলাম আর কি?

—আত্মীয়তা?—বন্ধুর কণ্ঠে বিস্ময় না বিদ্রূপ ঠিক বোঝা গেল না। মহারাজ কিন্তু সহজভাবেই বললেন,—হ্যাঁ, আত্মীয়তা ছাড়া আর কি! আত্মীয় কাকে বলে? আত্মার যোগ থাকলেই হয় আত্মীয়।

—তা আপনার এবং আমাদের মধ্যে আত্মার যোগ হল কি করে, মহারাজ? —বন্ধুর কণ্ঠে এবার বিদ্রূপ সুস্পষ্ট।

মহারাজের মুখে এক নিগূঢ় হাসি খেলে গেল; বললেন, এক সংগে আছি, পরস্পরের সংগে স্বার্থ-বিনিময় করছি—আপনাদের ভাষায় direct quid pro quo, কেউ কারও ঘাড় ভাঙবার চেষ্টা করছি না, এতেও যদি আত্মার যোগ না হয় আত্মীয় শব্দটিই বোধহয় অভিধান থেকে বাদ দিতে হয়।

মহারাজের মুখের কথা লুফে নিয়ে বন্ধু বললেন, তাই যদি হয় তবে সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করছেন কেন মহারাজ? আত্মীয়দের মধ্যে নৈকট্যই বোধহয় রীতি।

—একটু দূরত্ব বজায় রাখা বোধহয় ভাল,—মহারাজ বিনীতভাবে প্রতিবাদ করলেন, সাধুজনে বলেন, familiarity breeds contempt…তবে যখন বলছেন তখন একসংগেই বসা যাক, অতি ক্ষণস্থায়ী আত্মীয়তা ত! হয়ত আপনাদের সংগে জীবনে আর দেখাই হবে না।

মহারাজ চেয়ার টেনে আমাদের কাছে আসার সংগে সংগে মনসুরও ঢুকল প্রাতর্ভোজনের প্রাথমিক পর্বের উপাদান নিয়ে।

একসংগে তিন জনকে দেখে সে একটু আশ্চর্য হয়ে শুধু উচ্চারণ করলে, মহারাজ!

সম্বোধনের তাৎপর্য অনুধাবন করে মহারাজ বললেন, ঠিক হ্যায়, মনসুর। হিঁয়াই লাগাও। মনসুর টেবিল সাজানোর পর একটা অসংগতি লক্ষ্য করলাম, দেখলাম ডিম আর টোস্ট তিন প্লেট করেই আছে, উপরন্তু আছে একটা প্লেটে দুখানা ভর্জিত যকৃৎ।

মনসুরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মহারাজ ব্যাখ্যা করলেন: সকালেই ওপরের ঐ সদারজীর দোকান থেকে কিনে এনেছিলাম, মনসুর মাত্র গরম করে দিয়েছে।—তারপর একটু হেসে উক্তি করলেন, তখন কি জানতাম যে আত্মীয়দের সংগে এক টেবিলে বসতে হবে। জানলে এক প্লেটের জায়গায় তিন প্লেটের ব্যবস্থাই করতাম।

লজ্জিত হয়ে বললাম,—না, না তাতে কি হয়েছে? আমাদের পক্ষে ডিম টোস্টই যথেষ্ট।—বন্ধু যোগ করলেন, সকালে কি বেশী খাওয়া যায়?

—বিলক্ষণ! আত্মার যোগ যখন তখন বণ্টন করেই সদ্ব্যবহার করতে হবে, মহারাজ হেসেই উক্তি করলেন।

ভোজনপর্বের মাঝখানে বন্ধু বললেন, আত্মীয়দের কাছ থেকে আত্মপরিচয় গোপন রাখা বোধহয় বিধি নয়—কি বলেন মহারাজ?

মহারাজ উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই নয়, তবে উভয়ত।

—আমাদের আর পরিচয় দেবার কি আছে?—আমি বলে চলি, আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ—সংসারধর্ম করি, টেম্পোরারিলি সংসার থেকে পালিয়ে দুই বন্ধুতে একটু অবসর যাপন করছি। আমাদের নাম···।

শেষ করার আগেই মহারাজ বলে উঠলেন, নামে কি যায় আসে? আপনারা এবং আমি একই শ্রেণীভুক্ত, এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

বুঝতে না পেরে মনে আছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার মানে?

প্রশ্নটি যেন মহারাজের কানেই যায় নি, তিনি আগের সূত্র ধরেই বলে চললেন,—অবশ্য তফাত হল, আপনারা টেম্পোরারিলি সংসার থেকে পালিয়ে

এসেছেন, আর আমি পার্মানেণ্টলি সংসার থেকে কেটে পড়েছি। তবে তিন জনেই যে পলাতক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মহারাজের উক্তির সারবত্তা স্বীকার না করে উপায় নেই—গৈরিক বসনধারীও সংসার-পলাতক, গৃহীর পরিচ্ছদধারী আমরাও সংসার-পলাতক। তবে তিনি স্থায়িভাবে, আর আমরা অস্থায়িভাবে—এই যা তফাত।

বন্ধুও তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন বুঝলাম ; বললেন, তা ঠিক।

একটু হেসে মহারাজ মন্তব্য করলেন, সেইজন্যেই ত আমরা পরস্পরের আত্মীয়—অন্তত টেম্পোরারিলি !

মনে মনে মহারাজের যুক্তিনৈপুণ্যের তারিফ করছিলাম এমন সময় আবার তাঁর কণ্ঠ কানে এল : দর্শনে বলে বর্তমান বলে কিছু নেই - হয় অতীত, না হয় ভবিষ্যৎ। আমার মতে কিন্তু বর্তমানই সব। ভবিষ্যতে কি আছে কেউ জানে না, আর অতীত জেনে লাভ কি ?

এরপর বন্ধু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু বর্তমান বলতে ঠিক কি বোঝায় বলতে পারেন ?

—ঠিক কি বোঝায় জানি না,—মহারাজ উত্তর দিলেন, তবে আমি বুঝি বর্তমান হল তা যাকে নিয়ে আছি। যেমন, আজ দুপুরে আশা করছি একটা ফ্রাই-ট্রাই-এর ব্যবস্থা হবে, এই আশাই বর্তমান। আশা করছি মনসুর রাঁধবে ভাল, আশা করছি শরীর সুস্থ থাকবে এবং আমার আত্মীয়দের সংগে আমি আনন্দ উপভোগ করতে পারব—এই আশাও বর্তমান।

—তবে বর্তমান বলতে আশাকেই বোঝায় ?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—না, এই যে আলমোড়ার ডাকবাংলোয় আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, এও বর্তমান। গতকাল সকালে আপনারা ছিলেন না, আগামী কাল হয়ত থাকবেন না—কিংবা আমিই কোথাও চলে যাব। তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

—কিন্তু আবার ত আপনার সংগে আমাদের দেখা হতে পারে,—এবার বন্ধু বললেন।

—হলে সেটাই হবে তখন বর্তমান। তখন সম্ভব হলে আবার আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হবে।

—কিন্তু আজকের যে এই···, —আমি শেষ করার আগেই মহারাজ বললেন, সম্পূর্ণ ভুলে যাব। আপনারা স্মরণ করিয়ে দিলেও মনে করার চেষ্টা করব না। সেইজন্যেই ত আপনাদের নাম-ঠিকানায় আমার মোটেই ঔৎসুক্য নেই।

আলমোড়ায় পুরো চার দিন মহারাজের সংগে ছিলাম। চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নভোজনের সময় তিনি ঘোষণা করলেন, কাল চলে যাব ভাবছি।

—কালই ?—একটু বিষণ্ণ না হয়ে পারি নি।

—হ্যাঁ, কালই,—মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, পলাতকের এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে নেই, ধরা পড়বার ভয় থাকে।

ধরা মহারাজ দিয়েছিলেন সেইদিনই রাত্রে, তবে পুরোপুরি নয়। তিনি তাঁর আসল নাম জানান নি, বলেছিলেন, ধরুন চার্বাক সেন।

—চার্বাক সেন! দু-জনেই বিস্মিত না হয়ে পরি নি।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত নাম থাকতে চার্বাক নামটা বাছলেন কেন?

—চার্বাকের অনুগামী বলে—মহারাজ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মহারাজকে চার্বাক-দর্শনের অনুগামী বলেই মনে হয়, কিন্তু কোথায় যেন আরও কিছু আছে যা ঠিক ধরা যায় না। এই আরও কিছুরই পরিচয় পেলাম কিছুক্ষণ পরে।

সেদিন রাত্রে মহারাজের নির্দেশে তাঁরই ঘরে নৈশভোজনেব ব্যবস্থা হয়েছিল। বলেছিলেন, লাস্ট সাপার একসংগেই খাওয়া যাবে, কি বলেন? রাত্রে বারান্দায় বেশ ঠাণ্ডা, আপত্তি না থাকলে আমার ঘরেই।

খাওয়ার সময় সেদিন কোন তাত্ত্বিক আলোচনা হয় নি। মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। খাওয়ার পর উঠি উঠি করছি দেখে মহারাজ বললেন, উঠছেন নাকি? আমি ত আশা করেছিলাম লাস্ট সাপারের পর একবার লাস্ট গল্পস্বল্প করা যাবে।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বন্ধু বললেন, বেশ ত!

আরেকটা চারমিনার ধরিয়ে মহারাজ বললেন, কি নিয়ে গল্প করা যায় তাই ভাবছি—চার্বাক-চরিত শুনবেন?

—চার্বাক-চরিত?—প্রশ্নের আকারে পুনরুক্তিই করলাম।

—হ্যাঁ, চার্বাক-চরিত—এই চার্বাক সেনের অতীত। তবে ভাল লাগবে কিনা, জানি না!

যেন কোন রহস্য-চলচ্চিত্রে সবে রহস্যের অবতারণা স্নায়ুকে চঞ্চল করে তুলেছে, ঔৎসুক্যের প্রাবল্য আর বাধা মানছে না—এমনি ভাব নিয়ে বললাম, —বলুন, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আগ্রহাতিশয্য মহারাজ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন , বললেন, বেশ তবে শুনুন।

চার্বাক সেনের কাহিনী ঃ

চার্বাক সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অনার্স গ্রাজুয়েট, অনার্স ছিল দর্শনশাস্ত্রে। বি.এ. পাস করার পরই চাকরি নিয়েছিলেন এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে। সেখানে ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু অবধি হয়েছিলেন।

চার্বাক সেন যথাসময়ে সংসার করেছিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হয় নি। এজন্যে তাঁর স্ত্রী স্বাভাবিক মনঃকষ্ট ভোগ করলেও তাঁর নিজের কোন বিশেষ ক্ষোভ ছিল না। অফিসের কাজ ও বাড়ীতে পড়াশোনা নিয়েই ভদ্রলোকের সময় বেশ কাটত। অফিসের এবং পাড়ার ক্লাবে-ট্লাবেও মিশতেন, তবে খুব বেশী নয়।

সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর সমস্ত আকর্ষণ গিয়ে পড়ল তাঁরই ওপর। এতে সময় সময় বিব্রত বোধ করলেও কেমন যেন ভালও লাগত। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে তাঁরই ভাষায় পূর্ণ আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হল।

হঠাৎ একদিন চার্বাক সেনের মনে হল, তাঁর কর্মস্থল আছে, ক্লাবকেন্দ্রিক সমাজ আছে কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কি আছে ? ভদ্রমহিলার সমস্ত জীবনই ত তাঁকে ঘিরে। এর পর থেকে তিনি যতটা সম্ভব ঘরেই থাকতে শুরু করলেন। অফিস-ক্লাবের ছোকরারা বলাবলি করে: সেনবাবুর হঠাৎ হল কি ? দুর্গাপূজোর মিটিং-এ পাড়ার ছেলেরা ডাকতে এসে ফিরে যায়। চার্বাক সেন এসব কেয়ারই করলেন না।

একদিন দুপুরে পাড়ার একটি ছেলে অফিসে এসে হাজির। কি ব্যাপার ? বললে, শিগ্‌গির বাড়ী চলুন, বউদি ভীষণ অসুস্থ।

বাড়ী এসে দেখেন ডাক্তার বসে, পাড়ার ছেলেরাই ডেকে এনেছে। শুনলেন 'সিরিয়াস টাইপ অফ হার্ট অ্যাটাক'—এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠানো দরকার।

হাসপাতালে এগারো দিন পরে ভদ্রমহিলা তাঁর একমাত্র আকর্ষণের বস্তুকে বোধহয় উপরওয়ালার হাতেই সমর্পণ করে চোখ বুঝলেন।

চার্বাক সেন কিন্তু মোটেই ভেঙে পড়েন নি, দর্শনের ছাত্র তিনি ব্যাপারটাকে

'স্টোয়িক্যালিই' নিয়েছিলেন। অপর দিকে কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থাতেও তিনি ধর্মাচার বা লোকাচার কোনটাকেই উপেক্ষা করেন নি।

এর কিছুদিন পর থেকেই শুরু হল বিপদ। অফিসের ছোকরারা ধরে বলে, চলুন রিহার্শাল শুনবেন—মনটা ভাল থাকবে। পাড়ার ছেলেরা এসে বলে, আজ আমাদের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কমিটির মিটিং-এ আপনাকে উপস্থিত থাকতেই হবে।

এতেও নিস্তার নেই। আত্মীয়স্বজন—যাঁদের অনেকে আগে কোন দিন খোঁজখবর নিতেন না—চিঠিপত্র দিতে শুরু করলেন, কেউ-বা সমবেদনা প্রকাশ করে, কেউ-বা কোন প্রস্তাব করে, কেউ-বা দাবি জানিয়ে। বহরমপুর থেকে এক খুড়তুতো বোন লিখলেন: তাঁর মেয়ের বিয়ে, সোনাদানা কোনমতে জোগাড় করা গেছে কিন্তু নগদের ব্যবস্থা হচ্ছে না—সুতরাং অন্তত দু-হাজার টাকা দিতেই হবে। দক্ষিণ কলকাতা থেকে এক দূরসম্পর্কীয়া শ্যালিকা এসে জানালেন: জামাইবাবু, একলা থাকবেন কি করে। আমাদের ওখানেই চলুন। না-হয়, আমরাই এখানে আসি। তিনখানা ঘরে কোনমতে কুলিয়ে যাবে।

রবিবারই ছিল চার্বাক সেনের পক্ষে সবচেয়ে আতংকের দিন। সকাল হলেই পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন, ক্লাবের ছেলেরা ভিড় করত। তাঁদের সংগে কথা বলতে, তাঁদের আপ্যায়ন করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করত না—কিন্তু করতে হত।

এ হেন অবস্থায় চার্বাক সেন পলায়নের পন্থাই খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু বাধা ছিল চাকরি। সে বাধাও একদিন হঠাৎ দূর হয়ে গেল—কোম্পানি নতুন নিয়ম করলে যে ত্রিশ বছর একাদিক্রমে চাকরি করলেই কোন কর্মচারী 'রিটায়ারমেণ্টের সময় ট্রিপল বেনিফিটের সুযোগ' পাবে।

নিয়মটা চালু হবা মাত্র চার্বাক সেন লাফিয়ে উঠলেন, করলেন পদত্যাগপত্র পেশ—তাঁর ত্রিশ বছর চাকরি হয়ে গেছল।

'মোটা টাকা' নিয়ে ঘরে আসার পর মক্ষিকার দল এবার ছেঁকে ধরল। চার্বাক সেন এদিকে সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছেন। ব্যাংকের সংগে বন্দোবস্ত করে, মাসকাবার না হলেও বাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে, জিনিসপত্র কিছু বেচে কিছু বিলিয়ে, 'বাড়ী ছেড়ে দিলাম' বলে ডাকে বাড়ীওয়ালাকে জানিয়ে, একদিন

তিনি হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির। রিজার্ভেশন কাউণ্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন্ গাড়ীতে বেনারসের বার্থ খালি আছে?

তারপর টিকিট হাতে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের টয়লেটে গিয়ে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁকে চেনাই দায়। তিনি আর অমুক কোম্পানির অমুক ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব বডবাবু নন—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, 'আপনাদের ভাষায় মহারাজ!'

ঠিক সংসারত্যাগ না করলেও চার্বাক সেন স্ত্রীর স্মৃতির সম্মানে দুটি জিনিস ত্যাগ করেছিলেন: আমিষভোজন ও ধূমপান। অশৌচ-অবস্থায় নিরামিষ আহার করতে করতে তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীকে ত সারাজীবনই নিরামিষ খেতে হত, তিনিও যদি ঐ নিয়মটা ত্যাগ হিসাবে গ্রহণ করেন ত ক্ষতি কি!

তাঁর স্ত্রী তাঁকে ধূমপান ছাড়াতে অনেক বারই চেষ্টা করেছিলেন—অন্য কোন কারণে নয়, আশংকায়। খবরের কাগজ থেকে ভদ্রমহিলা জেনেছিলেন যে ধূমপানে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা। বাস! তারপর থেকেই···। চার্বাক সেন নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন ধূমপান বর্জন করতে, কিন্তু পারেন নি। এবার স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রচেষ্টায় সফল হলেন—অথচ ঐ সময়টাতেই ধূমপানের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক।

ট্রেনে এক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে চর্বাক সেনের আলাপ হল। ভদ্রলোক কোন্ এক ইউনিভার্সিটি না কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক; কাশী যাচ্ছিলেন কোন যজমানের শ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করতে। এইভাবে তাঁকে কাশী টেনে নিয়ে যাওয়াতে ভদ্রলোক বিরক্তই হয়েছিলেন। ঐ প্রসংগে অনুযোগ করেছিলেন: মৃতের নাকি ইচ্ছা ছিল যে কাশীতে গিয়েই যেন তাঁর শ্রাদ্ধ করা হয়। কাশীতে শ্রাদ্ধ না করলে নাকি তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে না! ছেলেরাও তাই মেনে নিলে। 'আরে বাপু, মরা গরু কি ঘাস খায়!'

কথাটা চার্বাক সেনের মনে লাগল। কতকটা নিজেরই অজান্তে তিনি প্রশ্নাকারে পুনরাবৃত্তি করলেন, মরা গরু ঘাস খায় না?

প্রশ্নটি অধ্যাপকের কানে গেল ; তিনি এবার একটু ব্যাংগোক্তি করলেন : খেলে মশাই মাঠে আর ঘাস থাকত না। আজ পর্যন্ত কত গরু মরেছে কল্পনা করুন ত !

এবার চার্বাক সেন নির্বোধের মতই প্রশ্ন করলেন : তাহলে আপনি শ্রাদ্ধ করতে যাচ্ছেন কেন ?

—সংসারের কিছুটা সুরাহা হবে বলে।—অধ্যাপকের বিদ্রূপ খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না। তারপর তিনি যেন নিজের মনেই বলে চললেন, সংসার চলে না তাই এই উঞ্ছবৃত্তি ··অন্নচিন্তা চমৎকারা ! আর ওদেরও খ্যাতনামা অধ্যাপককে দিয়ে শ্রাদ্ধ না করালে আভিজাত্য বজায় থাকে না।···

সব কথা চার্বাক সেনের কানে যাচ্ছিল না, তিনি ভাবছিলেন : অধ্যাপকের কথাই বোধহয় ঠিক—মরা গরু ঘাস খায় না। শ্রাদ্ধশান্তি, আত্মার সদ্গতি সবই কল্পনা···সবই matter, spirit বলে কিছু নেই···। তবে কেন এই আত্মবঞ্চনা ?···

কোন একটা স্টেশনে গাড়ী থেমেছিল, সামনে দিয়ে একজন সিগারেট ভেণ্ডার যাচ্ছিল। চার্বাক সেন এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা ধরালেন। ভাবলেন : আঃ কি আরাম ! এই সুখ থেকে এ ক'দিন নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন কেন ? মাছমাংসই বা ছেড়েছেন কেন ? না, কাশীতে গিয়ে গেরুয়াও ছাড়তে হবে !

কাশী স্টেশনে অধ্যাপককে তাঁর যজমানের তরফ থেকে লোক নিতে এসেছিল। অধ্যাপক চলে গেলে চার্বাক সেন ভাবলেন, কোথায় ওঠা যায় ? সওদাগরী অফিসের বড়বাবু, ভ্রমণে বিশেষ অভ্যস্ত নন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল কার কাছে যেন শুনেছিলেন, বড় বড় তীর্থস্থানে ডর্মিটরি আছে, প্রথমে একলা সেখানে ওঠাই সুবিধা।

টিকিট কালেক্টরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একজন কুলি দিয়ে রিজার্ভেশন কাউণ্টারে পাঠিয়ে দিলেন। খাতিরের কারণ ছিল গেরুয়া ও ইংরেজীর সমন্বয়। ইংরেজী-বলা সাধু ত সংখ্যায় বেশী নয়।

ডর্মিটরিতে জায়গা পাওয়া গেল। চার্বাক সেন বুঝলেন, গেরুয়া পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। যুক্তিযুক্ত যে হবে না সে-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেললেন সেদিনই রাত্রে। ভিড থেকে একটু দূরে দশাশ্বমেধ ঘাটের এক কোণে বসে ধূমপান করছিলেন। কখন যে আর-একজন লোক এসে পায়ের তলায় বসেছে, লক্ষ্য করেন নি। সচেতন হলেন যখন লোকটি অনুমতি প্রার্থনা করলে : মহারাজ গোড় দাবাই?

চার্বাক সেন লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করলেন। না, চেহারায় ভয়ের কিছু নেই; আর ঘাটও লোকভরতি। তা একটু পা টিপিয়ে নিলে মন্দ হয় না। গা-হাত-পা টেপাতে তাঁর ভালই লাগে। জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিতে হবে?

—কুছ নেই মহারাজ! সিরিফ একঠো সিগরেট পরসাদ।

মাত্র একটা সিগারেট প্রসাদ হিসাবে দিয়ে পা-টেপানো! ভালই। চার্বাক সেন অনুমতি দিলেন।

লোকটা দাবায় না খারাপ, কিন্তু সামান্য মাত্র পদসেবা করেই বলে ফেলল, গত বৎসর এক বাঙালী বাবু আর উনকা জেনানা তারই পদসেবা করেছিল।

কি রকম?—চার্বাক সেন কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না।

লোকটি যা বলল তা হল: গত বৎসর তার গঙ্গাসাগর মেলায় যাবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু কেরায়া যোগাড করাই কঠিন হল। তারপর একজনের পরামর্শে গেরুয়া রংয়ে কাপড ছুপিয়ে, বাজার থেকে একটা কমুণ্ডলু ও চিমটা কিনে, মাথা ভাল করে কামিয়ে গাডী চেপে বসল। ট্রেন-ভাডা লাগে নি, এমনকি নৌকো-ভাড়াও অর্ধেক লেগেছিল।

গঙ্গাসাগর-মেলায় এক সাধুর সংগে ভাব হল, তারই তাঁবুতে সে বাস করেছিল। সেখানেই বাঙালীবাবু ও তাঁর জেনানা তার পদসেবা করে। কেনই বা করবে না?—সাধুর পদসেবা করা ত পুণ্যকার্য!

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে চার্বাক সেন স্টেশনের ডর্মিটরিতে ফিরলেন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে যে গৈরিক বসনকে পরিত্যাগ করা চলবে না—এর উপযোগিতা আছে।

পরবর্তী সময়ে এই উপযোগিতার আরও প্রমাণ পেলেন যখন টিকিট কাটা, আশ্রম যোগাড় ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়মিত সুবিধা হতে লাগল। ধর্মশালা আশ্রম মঠ-মিশন ত বটেই—কয়েক ক্ষেত্রে হোটেলগুলোও পক্ষপাতিত্ব দেখাতে কার্পণ্য করে নি।

পুণা স্টেশনের ঠিক সামনে ন্যাশানাল হোটেলে চার্বাক সেন ক-দিন

ছিলেন। হোটেলটাতে পার্শীদের বাহাই-সম্প্রদায়ের একটা অফিসও আছে। হোটেল ছাড়বার ঠিক আগে হোটেলের ম্যানেজার নিজেই বিল নিয়ে এলেন। চার্বাক সেন দেখলেন বিলে 'হাফ চার্জ' ধরা হয়েছে। ম্যানেজার জানালেন, তাঁদের ঠিক 'বিজনেস্ নয়', একটা মিশন। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে অর্ধেক চার্জই নিয়ে থাকেন।

গেরুয়া বসনের দৌলতে কয়েকটা মঠ-মিশনেও চার্বাক সেন থাকতে পেয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থার জন্যে বেশী দিন কোন জায়গাতেই থাকেন নি। এই আলমোড়াতেই তিনি একটা আশ্রমে উঠেছিলেন। কিন্তু ডালসেদ্ধ আর আলুসেদ্ধ খেয়ে বিরক্ত হয়ে এই ডাকবাংলোয় পালিয়ে আসেন মুখ বদলাতে। তারপর আমাদের সংগে আত্মীয়তা স্থাপন।

চার্বাক সেন থামলেন, আমরাও নীরব—শুনতে শুনতে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। চার্বাক সেনই আবার নীরবতা ভংগ করলেন। বললেন, শুতে যান, অনেক রাত হয়েছে।

পরের দিন সকালে মনসুর বেড-টী নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, মহারাজ চলে গেছেন ?

—জী, হাঁ। আপ্ কো লিয়ে এক্ঠো চিটঠি ছোড় গিয়া।

আমাদের জন্যে চিঠি ! বেড-টী ভুলে চিঠিখানা নিয়েই বন্ধু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুরু করলেন।

চিঠিখানায় কোন সম্বোধন নেই, একেবারে বক্তব্য শুরু হয়েছে। সুন্দর হস্তাক্ষর। চিঠিখানা এখনও আমার কাছে আছে, তাই পুরোপুরি উদ্ধৃত করতে পারলাম :

চার্বাক সেনের পত্র

কাল আপনারা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ঘুম এল না, ফলে নানা দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করল। এরকম মাঝে মাঝে হয়, তবে কার্যকারণ সম্বন্ধ ঠিক জানি না—ঘুম হয় না বলেই দুশ্চিন্তা ভিড় করে, না, দুশ্চিন্তার দরুন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে ? নিদ্রাহীন এই বিরক্তিকর অবস্থা থেকেই মুক্তি পাবার জন্যই আপনাদের এই চিঠিখানা লিখতে বসলাম।

আমার এই জীবনদর্শনকে ঠিক চার্বাক-দর্শন বলা যায় কিনা, জানি না।

চার্বাক-দর্শন পাঠ করার সুযোগ আমার হয় নি। তবে মনে হয় চার্বাক মুনি ও তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের বক্তব্য ছিল যে, আত্মা পরলোক-টরলোক ইত্যাদি সবই ভূয়ো ধারণা ; ইহলোকই সর্বস্ব। অতএব, খাও দাও নৃত্য কর মনের আনন্দে।

এই দর্শনের অনেক গুণ আছে, তবে ত্রুটি হল যে দর্শনটি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শন নিয়ে মানুষের কি চলে ? আমার কথাই ধরুন না। বন্ধনহীনভাবে একা একা ঘুরি, অস্থায়িভাবে আত্মীয়তা স্থাপন_করি, আবার বন্ধন ছিন্ন করে সরে পড়ি।

কাল আপনারা চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হল আপনারা দু-জন, কিন্তু আমি একা। রাত্রে যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলে কাকে ডাকব ? আবার ভবিষ্যতের ভাবনাও সংগে সংগে পশ্চাদ্ধাবন করল—যদি বেশী দিন বাঁচি, যদি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন কার ওপর নির্ভর করব ? আমার জীবন-দর্শন তখন কতটা আমার সহায়ক হবে ?

অতীতকে হয়ত বিস্মৃত হওয়া যায়, কিন্তু এই ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় কি ? তাই ভাবছি কোন মঠ-মিশনেই ভিড়ে যাব। অবশ্য বেছে নেব, যাতে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হলেও একেবারে বিনষ্ট না হয়।

তখন এই চার্বাক সেনের সংগে আবার দেখা হলে আপনারা 'মহারাজ' বলেই ডাকবেন, মোটেই আপত্তি করব না।

যাক্ এখন আবার পালাচ্ছি। কোথায় পালাচ্ছি বলব না, কারণ পলাতকের ঠিকানা রেখে যেতে নেই।

ইতি—
একদাত্মীয়
চার্বাক সেন

বোম্বাই যাওয়াই

Have you got your car ?—জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার গুণে। একটু থতমত খেয়ে গেলাম প্রশ্নটা শুনে। ক'লকাতা থেকে ১২০০ মাইল দূরে এই শৈলাবাসে নিজস্ব গাড়ী কোথায় পাব ? আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজেদের কোন গাড়ীই নেই। আমার বাড়ীতে সাইকেল একখানা আছে বটে !

তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি। সংগী দুই বন্ধুর একজন বোধহয় জ্বর নিয়েই পুণা থেকে বাসযাত্রা করেছিলেন, মহাবালেশ্বরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফুটে উঠল। রাত যত গভীর হয়, জ্বরের প্রকোপও তত বাড়ে। সারা শরীরে যন্ত্রণা, আর তার প্রকাশ 'মা গো, আর পারি না', 'এখন করি কি', ইত্যাদি নিয়মিত স্বগতোক্তিতে।

একাধারে হোটেলের মালিক ও ম্যানেজার যিনি তাঁর কাছে গিয়ে খোঁজ করলাম ডাক্তারের। শুনলাম এত রাত্রে (তখন ৮টাও বাজে নি) আর ডাক্তার পাওয়া যাবে না, কোন ওষুধের দোকানও খোলা নেই। ওখানকার নিয়মই নাকি এই—যা ব্যবস্থা করতে হয় কাল সকালে।

আরও জানলাম যে সবসে বড়া ডাগদার হলেন গুণে ডাগদার সাব, তাঁর চেম্বার হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ এবং কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় তিনি চেম্বারে আসেন। অতএব, সকাল সাতটা অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মালিক তথা ম্যানেজার ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর অতিথিদের সুখসুবিধা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, তাঁর ব্যবহারে নিছক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আরও কিছু আছে। দেরাজ থেকে বের করে দুটো সারিডনের বড়ি দিয়ে বললেন, দো-তিন ঘণ্টে বাদ একঠো করকে পিলায় দিজিয়ে, আর আপনারাই বন্ধুকে থোড়া সে ম্যাসাজ। কি করবেন বলুন ? রাতের বেলা, তার ওপর আবার বিদেশবিভুঁই !

সকাল হল। রোগীকে রেখে আমরা দুই বন্ধুতে ছুটলাম ডাক্তার গুণের চেম্বারের দিকে। বাড়ীতেই চেম্বার—পেতলের ফলকে ঝকঝকে লেখা :

Dr.. S. N. Gune, L.M.P., এবং তার তলার লাইনে From 7 A.M. to 9-30 A.M. and 4 P.M. to 6 P.M.। তখনও সাতটা বাজতে কিছু দেরী আছে, ঘরে বেশ কয়েকজন বসে আছেন, কিন্তু ডাক্তারের চেয়ারটা পিতলের ফলকের ঘোষণার সংগে সংগতি রেখে তখনও খালি।

ঘরেই একটা দেওয়াল-ঘড়ি ছিল। ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। শেষ ঢং-*টি* বাজার সংগে সংগে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। মধ্যবয়সী, সুসজ্জিত ভদ্রলোক। কি কারণে জানি না, আমাদের দিকেই তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়ল—বোধহয় চেহারা বা বেশভূষা থেকে কিছু অনুমান করে থাকবেন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতেই ব্যাপারটা খুলে বললাম। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, Have you got your car ?

একটু থতমত খেয়ে গেলাম প্রশ্নটা শুনে। মহাবালেশ্বরে নিজের কার কোথায় পাব ? যা হোক ব্যাখ্যা করে বললাম, কারটার নেই, আমরা ট্যুরিস্ট, কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্রের এই শৈলাবাসে বেড়াতে এসেছি, আর এসেছি ট্রেনে।

ভদ্রলোকের মুখে একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল, কিন্তু তা কিসের পরিচায়ক ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার বন্ধু কতকটা অনুরোধের সুরেই বললেন, এখান থেকে আমাদের হোটেল পদব্রজে পাঁচ মিনিটের পথও নয়, ডাক্তার-সাহেব দয়া করে যদি . .

শেষ করবার আগেই ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করলেন, Which hotel ?

হোটেলের নাম বলাতে ভদ্রলোককে স্পষ্টতই নিরুৎসাহিত হতে দেখা গেল—নিশ্চয়ই কোন অভিজাত হোটেল নয় বলে। ভাবটা কাটিয়ে উঠে জানিয়ে দিলেন যে ১০টার আগে যেতে পারবেন না ; ঠিক ১০টায় যেন আমরা অপেক্ষা করি।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ১০টায় হাজির হলেন ডাক্তার গুণে, সংগে একজন লোক তাঁর ডাক্তারী ব্যাগ বহন করে।

ঘরে ঢুকেই, রোগীর দিকে না তাকিয়ে, আমাদের দু-জনের দিকে চেয়ে আদেশ জারি করলেন, You two, out please.

হতভম্ব হয়ে গেলাম। পুরুষ রোগী, পুরুষ ডাক্তার—রোগের বর্ণনাটাও করা দরকার। সুতরাং কেন আমাদের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন এবং কিভাবে তা সম্ভব, বুঝলাম না। বোধহয় ডাক্তার সাহেবের ইংগিতেই তাঁর ব্যাগবাহক

লোকটিও বেরিয়ে এল। ডাক্তার সাহেব ফেলা পর্দাটার ওপর দরজাটাও ভেজিয়ে দিলেন।

মিনিট-দুয়েক কাটার পর ভেতর থেকে অনুমতি এল: You may now come in। ভেতরে গেলাম। তখন রোগীর মুখে থার্মোমিটার লাগানো। থার্মোমিটারটি বের করে জ্বর দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবু বললেন,—সব পরীক্ষা করে দেখলাম, সারতে তিন-চার দিন লাগবে। যাহোক আমার চেম্বারে আসুন, ওষুধ দিচ্ছি।

আমার সুস্থ বন্ধুটি হঠাৎ বলে ফেললেন, ডেংগু নয় ত? আমরা কলকাতা থেকে আসছি, সেখানে এখন ভীষণ ডেংগু হচ্ছে।

আমার সংগীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার গুণে বললেন, হতে পারে; তা হলে ত এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠার সম্ভাবনা কম। আর এঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, ডেংগু হলে নড়াচড়া করা খারাপ।

দর্শনী কত জিজ্ঞাসা করলাম। ঘরটি ভাল করে পরীক্ষা করে ডাক্তার সাহেব বললেন, Sixteen rupees, তারপর দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান বাহককে নির্দেশ করে,—and two rupees for him.

টাকাটা নিয়ে বাহকসহ ডাক্তার সাহেব যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, আমরাও অনুসরণের ব্যবস্থা করছি—এমন সময় ডাক্তার সাহেব নির্দেশ দিলেন, আপনারা বরং আধঘণ্টা পরে আসুন। আমি ওষুধ তৈরি করিয়ে রাখব।

ডাক্তার গুণে চলে গেলেন, আমরা পীড়িত বন্ধুর পাশে এসে বসলাম।

একটা কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলাম না: ডাক্তার সাহেব আমাদের বাইরে যেতে বললেন কেন, এমন কিই-বা পরীক্ষা করবার ছিল। সুতরাং বন্ধুর পাশে বসেই জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা ঠিক কি—ডাক্তার সাহেব তোমার শরীরের কোন্ কোন্ অব্যক্তব্য অংশ পরীক্ষা করলেন?

রোগী বন্ধু উত্তর দিলেন, কিছুই না। শুধু কম্বলের ওপর থেকে পেটটা টিপে দেখলেন, জিবটা বার করতে বললেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন কলকাতায় কি করি—অর্থাৎ পেশা কি।

ডাক্তার গুণের সময়ানুবর্তিতা স্মরণ করে ঠিক আধ ঘণ্টা পরে তার চেম্বারে গিয়ে হাজির হলাম। এবার আর কোন রোগী বা ভিজিটর নেই। টেবিলের

ওপর একটা মিক্সচারের শিশি ও একটা ছোট কাগজের বাক্স নিয়ে ডাক্তার সাহেব বসে আছেন। শিশিটা দেখিয়ে বললেন, তিন ঘণ্টা অন্তর এক ডোজ; আর মোড়কটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, এতে কয়েকটি ট্যাবলেট আছে, গা-হাত-পায়ের যন্ত্রণা খুব বেশী হলে একটা করে দেবেন—I mean, if necessary ; otherwise, not.

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, কি ট্যাবলেট ?

বেশ একটু রুষ্ট হয়েই ডাক্তার সাহেব জবাব দিলেন, তা জেনে আপনাদের লাভ ? ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস নেই ?

ওষুধের দাম মিটিয়ে চলে এলাম। বাইরে এসে দেখলাম সেই কাগজের বাক্সের ওপর লেখা আছে If Necessary Tablets। লেখাটা নিশ্চয়ই কম্পাউণ্ডারের।

ডাক্তার গুণের ওষুধ নিয়মিত খাওয়া চলতে লাগল, কিন্তু উপশমের কোন লক্ষণই নেই। মাথার যন্ত্রণা ও শরীরের বেদনায় রোগী যখন ছটফট করে তখন একটা করে if necessary tablet দিই, আর আধঘণ্টা সে বেশ আরামে থাকে। ব্যস ঐ পর্যন্ত।

পরের দিন খবর দিতে ডাক্তার সাহেব জানালেন যে ওষুধ বদল করে দিচ্ছেন, তবে if necessary tablet ঐভাবে চালিয়ে যেতেই হবে। তিনি তো আগেই বলেছেন, এক সপ্তাহের আগে সেরে ওঠবার সম্ভাবনা কম।

কাঁহাতক রোগী নিয়ে শৈলাবাসে এইরকম বসে থাকা যায়! রোগীও বিরক্ত হয়ে উঠছে। তার ধারণা চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে না। আর মহাবালেশ্বরের শীতও অসহ্য। সুতরাং স্থির করা হল যে পাহাড় থেকে সমতলভূমিতে নামতে হবে।

কিন্তু কিভাবে?—সেটাই সমস্যা। রোগীকে বাসে করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর মহাবালেশ্বর থেকে পুণায় যাবার ট্যাক্সিও সচরাচর পাওয়া যায় না। ট্যাক্সি পেতে হলে পাঞ্চগনী যেতে হয়; পাঞ্চগনী পুণার পথেই—মহাবালেশ্বর থেকে দশ বার মাইল।

হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যাত্রী নিয়ে একটা ট্যাক্সি মহাবালেশ্বরে এসেছিল, পরের দিন সকালে ফেরার পথে যাত্রী খুঁজছে। বেলা তখন ৮টা। ব্যবস্থা করে ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম।

যাত্রার আগে মনে হল ডাক্তার সাহেবের সংগে একবার দেখা করা উচিত। ট্যাক্সিটা একটু দূরে রেখে আমরা দুই সুস্থ বন্ধু হেঁটে তাঁর চেম্বারে গেলাম।

আমাদের দেখে ডাক্তার গুণে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, রোগী কেমন?

মাত্র প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তরে জানালাম, আজই আমরা পুণায় নেমে যাচ্ছি।

—কিন্তু রোগী?

মিথ্যা কথাই বললাম,—জ্বর ছেড়ে গেছে।

—ছেড়ে গেছে, ডাক্তার সাহেব বেশ অবাকই হলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন, এই আশাই করেছিলাম। যাক, যাচ্ছেন কখন?

—এখনই।

—এখনই। ডাক্তার গুণে প্রতিধ্বনি করে বললেন,—তা কি করে হয়? অন্তত আরও দু-শিশি মিক্সচার খাওয়া দরকার। তৈরি করতে অন্তত এক ঘণ্টা সময় লাগবে। আমার কম্পাউণ্ডার এখন ব্যস্ত। কালকের ওষুধ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে।

জানালাম যে বরাতক্রমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেছি, ড্রাইভার একঘণ্টা অপেক্ষা করতে রাজী নাও হতে পারে।

—Then it should be served within half an hour, ডাক্তার-সাহেব আশ্বাস দিলেন।

এবার জানাতে বাধ্য হলাম যে হোটেল ছেড়ে দিয়ে ট্যাক্সি করে বেরিয়েই পড়েছি, আর পথে তাঁর এখানে নেমেছি।

—Can't he be asked to wait for, say, ten minutes?—ডাক্তার সাহেবের কণ্ঠে স্পষ্টতই উৎকণ্ঠার সুর।

এরপর আর এড়াবার কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না। কাজেই সম্মতি জানাতে বাধ্য হলাম। ডাক্তার গুণে ভেতরে ঢুকে বোধহয় কম্পাউণ্ডারকে নির্দেশ দিয়েই বেরিয়ে এলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কম্পাউণ্ডার এসে দুটো শিশি টেবিলের ওপর রাখার পর আমাদের দিকে চেয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, Here's your medicine.

দাম জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন, ষোল টাকা। তারপর একটু থেমে ব্যাখ্যা করলেন, Specially prepared for the convalescence stage.

উপায় নেই, ষোল টাকা টেবিলের ওপর রাখলাম। আমার বন্ধু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ট্যাবলেট আর দেবেন না ?

একটু যেন চমকে উঠে ডাক্তার সাহেব বললেন, Certainly not—তারপর ব্যাখ্যা করলেন, ও ট্যাবলেটগুলো সমতলভূমিতে নেমে আর খাওয়া চলে না—ভীষণ রিঅ্যাক্সান হতে পারে···They should be prescribed only when in the hills, you know.

টেবিল থেকে শিশি দুটো নিয়ে ওঠবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করলেন: সেই ট্যাবলেট আর আছে নাকি ?—ডাক্তার সাহেবের কণ্ঠে যেন খানিকটা উদ্বেগের প্রকাশ, আর মুখেও তার ছায়া পড়েছে বলে মনে হল।

যদিও তিন-চারটে ট্যাবলেট তখনও অবশিষ্ট আছে বলে জানতাম, তবুও বন্ধু কিছু বলবার আগেই আমি বলে উঠলাম, না, ফুরিয়ে গেছে—কালই ফুরিয়ে গেছে।

ডাক্তার গুণের মুখ থেকে উদ্বেগের ছায়া সরে গেল। বিদায়ের ইংগিতপূর্ণ করকম্পন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন, Very sorry that you are leaving. However, may I expect a line from you as soon as your friend comes completely round ?

স্বীকৃতি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

পুণাতে এসেও জ্বর ছাড়ল না। পরদিন সকালে রওনা হলাম বোম্বের দিকে। বোম্বে থেকে গুজরাট মেলে আমেদাবাদের টিকিট কাটা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ভি. টি. স্টেশনে একটা রিটায়ারিং রুম পেয়েছিলাম। তাতে রোগীকে রেখে স্টেশন-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সংগে দেখা করলাম ডাক্তারের খোঁজে। স্টেশনের ডাক্তারই রোগীকে দেখতে এলেন। পরীক্ষা করার পর কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। বলতে পারলাম না, কারণ ডাক্তার গুণে কোন ব্যবস্থাপত্র দেন নি, ওষুধই দিয়েছিলেন। শেষের শিশি দুটো পুরোই ছিল, বোকার মত দেখালাম। শিশির গায়ে কোন লেবেলটেবেল ছিল না।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, I am no wiser—মিক্সচারের রং দেখে কি প্রেসক্রিপশন অনুমান করা যায়?—তখন মনে পড়ল সেই বটিকার কথা; বললাম, আর একটা ট্যাবলেটও দিয়েছিলেন—খেলেই সংগে সংগে ব্যথাবেদনা কমে, তবে সেই উপশমের অবস্থা স্থায়ী হয় না।

—Let me see the tablets, if there are still any left,—যেন নিশ্চিত পাওয়া যাবে ধরে নিয়েই ডাক্তার হাত বাড়ালেন।

কিট ব্যাগ থেকে বের করে কাগজের সেই ছোট বাক্সটা ডাক্তারের হাতে দিলাম। নামটা পড়ে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ডাক্তার কতকটা আপন মনেই বললেন, If necessary tablets! What does it mean?—তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরে, Any way, what's in a name?

বাক্সটা খুলে ডাক্তার বটিকাগুলোর দিকে দু-তিন সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন, তারপর বাক্সটা বন্ধ করে আমার হাতে ফেরত দিলেন।

আমরা দুই বন্ধুতেই প্রায় একসংগে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ট্যাবলেট?

ডাক্তার বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, প্রোফেশন্যাল এটিকেটে বাধে,·· তবুও বলছি···ওগুলো অ্যাস্‌পিরিন ট্যাবলেট। খুব বেশী কষ্ট হলে এক-আধটা খাওয়াতে পারেন—I mean only when essential; not, if necessary.

কাহিনীর এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কারণ কিভাবে বন্ধু সেরে উঠলেন এবং কিভাবে কলকাতা ফিরলাম তা এই কাহিনীর সংগে সম্পর্কহীন, তবে সম্পর্কিত একটা ছোট ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলকাতায় ফিরেই অবশিষ্ট দুটো বটিকাসহ কাগজের বাক্সটা পার্শেল করে ডাক্তার গুপ্তেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আর পার্শেলের মধ্যে দিয়েছিলাম একখানা চিঠি তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রশংসা করে এবং ধন্যবাদ দিয়ে। চিঠিতে একটা অনুরোধও ছিল: যদি সেই অত্যাশ্চর্য বটিকার নাম ডাক্তার সাহেব জানান। লিখেছিলাম, ঐ বটিকা আবার কোন পাহাড়ে গেলে সংগে করে নিয়ে যাবারই ইচ্ছা—কারণ, বলা তো যায় না, যদি আবার ঐ রকম বিপদে পড়ি।

পার্শেলের রসিদ ফেরত এসেছিল কিন্তু চিঠির কোন উত্তর পাই নি।

গীতা-রহস্য

'গীতা-রহস্য' লোকমান্য তিলককৃত গীতার বিখ্যাত ভাষ্যের নাম। ভাষ্যখানি পড়ে দেখবার সুযোগ এখনও ঘটে নি। তবে শুনেছি, লোকমান্য বলতে চেয়েছেন গীতায় সন্ন্যাসধর্মের কথাটথা বিশেষ নেই, যা আছে তা হল নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব—স্বধর্ম স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যে-কোন অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে বিরতিবিহীন সংগ্রামের আহ্বান। যা হোক, গীতায় নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব ছাড়া আর কোন রহস্য আছে বলে জানতাম না, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল আমেদাবাদের রেল-স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে।

কোন কর্মব্যস্ত রেল-স্টেশনের রিটায়ারিং রুম হয়তো জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পরিবেশ নয়, কিন্তু কখন যে কোন্ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে তা কি কেউ বলতে পারে। এইজন্যেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন, জীবনগ্রন্থ থেকে যত শিক্ষালাভ করা যায় তা আর অন্য কিছু থেকেই সম্ভব নয়।

আমেদাবাদে রিটায়ারিং রুমে জায়গা পেয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, কারণ সংগে ছিলেন অসুস্থ বন্ধু—আমেদাবাদে পৌঁছেও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি।

রিটায়ারিং রুমে একজনের জন্যে একটা বিছানাই পেয়েছিলাম—পুরো ঘরটা পাই নি। অথচ সংখ্যায় আমরা তিন জন। মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি অপর বিছানাটি অধিকার করে আছেন স্থূলকায় মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক—মাড়োয়ারী বা উত্তরপ্রদেশের বলেই মনে হল। তাঁর কপালে রক্তচন্দন ও সিঁদুরের রেখা এবং মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সযত্নে-রচিত শিখাটি লক্ষ্য করার মত। তিনি যে সদ্যস্নাত তা সহজেই বোঝা যায়। মনোযোগ-সহকারে একখানি গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। মাঝে মাঝে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হলেও কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল না। বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা গ্রন্থখানির নামও পড়া গেল: শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

এইরকম একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়ে বিশেষ নিশ্চিন্ত হলাম।

একজনের জন্যে একটা বিছানা ভাড়া করে তিন জনে রিটায়ারিং রুম ব্যবহার করা বে-আইনী। তাই মনে খানিকটা আশংকা ছিল, কি জানি অন্য বিছানাটির অধিকারী যদি কোন সাধারণ স্বার্থপর লোক হয়—যদি সে আমাদের আইন-বিগর্হিত কাজের প্রতি স্টেশন-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে! নিঃশংক হওয়াতে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম

ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোক আমাদের দিকে একবার মুখ তুলে চেয়েই আবার পাঠে মনোনিবেশ করলেন। আমরাও কোন কিছু না বলে, অসুস্থ বন্ধুর শোবার ব্যবস্থা করে বাথরুম ব্যবহারে উদ্যোগী হলাম। আমার সুস্থ বন্ধু বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সংগে সংগে গীতা-পাঠকারীর কণ্ঠস্বর কানে এল, বিমারি হ্যায়, ক্যা? মনে আবার আশংকার অংকুর দেখা দিল—সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে ট্রেনে চাপা বা রিটায়ারিং রুম ইত্যাদিতে থাকা বে-আইনী। সুতরাং সাবধানে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, পথে একটু জ্বর হয়েছে, এখনও ছাড়ে নি, মনে হয় বিকেল নাগাদ ছেড়ে যাবে…ডরনেকো কোই বাৎ নেহি।

উত্তরের শেষাংশটিতে ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানি না, কারণ একটা সংগতিহীন প্রশ্নই করে বসলেন,—রোগী তাহলে সারাদিন এই ঘরেই থাকবে?

প্রশ্নের কোন তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে আমি সোজা উত্তরই দিলাম,—আর কোথায় যাবে বলুন? অসুস্থ শরীরে তো আর নড়াচড়া করা ঠিক নয়।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না—দেখলাম তিনি গীতায় মগ্ন হয়ে গেছেন।

বন্ধু বেরিয়ে আসার পর আমি ঢুকলাম বাথরুমে। ফিরে এসে দেখি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটি অন্তর্হিত হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রলোক কোথায়? জানলাম, জামা গায়ে দিয়ে গীতা হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

গীতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া! পাদরীরা রাস্তাঘাটে সকল সময়ই বাইবেল পড়েন দেখেছি। কোন কোন হিন্দুও তাহলে সকল সময় গীতা পড়তে শুরু করেছেন। ভাল কথা! কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভারতে লোকায়ত দর্শনের প্রচার যত বাড়ছে ধর্মভাবের বন্যাও তত বয়ে যাচ্ছে। তা না হলে

কেদার-বদরী অমরনাথ প্রভৃতি এত দুর্গম তীর্থযাত্রার হিড়িকই বা কেন, আর বারোয়ারী পুজোরই বা ধুমধাড়াক্কাই বা কেন!

ভদ্রলোকের ফিরে আসতে মোটেই দেরী হল না। ফিরে এসেই বিছানায় বসে আবার সুরু করলেন গীতাপাঠ। প্রায় সংগে সংগে হল রিটায়ারিং রুমের দরজায় এক রেল-কর্মচারীর আবির্ভাব।—Which of you Mr. Mukherji, please?—কর্মচারীটির প্রশ্নে একটু শংকিতচিত্তে উত্তর দিলাম,—আমিই সেই ব্যক্তি, এবং তারপর প্রশ্ন করলাম, কেন, কি হয়েছে?

কর্মচারিটি ব্যাখ্যা করলেন: আমরা বে-আইনী কাজই করেছি—একজনের জন্যে একটা বিছানা নিয়ে রিটায়ারিং রুমে তিন জনে ভিড় জমিয়েছি, এতে অন্য অক্যুপ্যাণ্টের অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং হয় মাত্র একজনই থাকব, না-হয় আমাদের রিটায়ারিং রুম ছেড়ে দিতে হবে। মাত্র দু-ঘণ্টা সময় দেওয়া হল, ইতিমধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝলাম। গীতা-পাঠকারীর দিকে তাকিয়ে দেখি, গীতা পাঠ করতে করতে তাঁর প্রায় সমাধির অবস্থা—রেল-কর্মচারী যে আমাদের এতগুলো কথা বললেন তা যেন তাঁর কানেই যায় নি। অহেতুক ধ্যান ভাঙাবার প্রচেষ্টা না করে সমস্যার সমাধানই চিন্তা করতে লাগলাম।

বিদেশবিভুঁই, সংখ্যায় আমরা মাত্র তিন জন, তাও একজন আবার অসুস্থ। ঝগড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। সবচেয়ে বড় কথা, বে-আইনী কাজ আমরাই করেছি। তাই আবেদনেরই আশ্রয় নিলাম। আবেদন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল—সেই দু-ঘণ্টার আলটিমেটামই বজায় রইল।

কর্মচারিটি চলে যাবার পর আমরা পরামর্শ করে স্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সংগে দেখা করলাম। বিশেষ ভদ্রলোক। সহানুভূতির সংগে সব কথা শুনে পরামর্শ দিলেন স্টেশনের ডাক্তারকে দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে সেই সার্টিফিকেট সহ একখানা দরখাস্ত করতে। দরখাস্ত করলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের থাকবার অনুমতি দেবেন। রোগী ত থাকবেই, পরিচর্যার জন্য আমরা দু-জনও সংগে থাকতে পারি।

পরামর্শমত কাজই করলাম। স্টেশনের ডাক্তারকে ধরলাম এবং পাঁচটি মুদ্রার বিনিময়ে রোগী পরীক্ষা করানো ছাড়াও স্টেশনের ডিস্পেন্সারি থেকে বিনামূল্যে ঔষধ আর একখানি সার্টিফিকেট জোগাড় করলাম। সার্টিফিকেটের মর্ম হল: রোগ সংক্রামক নয়, কিন্তু রোগীকে স্থানান্তরিত করাও যুক্তিযুক্ত হবে না।

লিখিত অনুমতি নিয়ে বিজয়গর্বে ফিরে এসে দেখি গীতা-পাঠকারী ঘরে নেই। রোগী বন্ধুর কাছে জানলাম, গীতাখানি হাতে নিয়ে ভদ্রলোক আবার বেরিয়ে গেছেন।

ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাখার তলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর তোয়ালে ইত্যাদি এবং গীতাখানিও নিয়ে আবার বাথরুমে ঢুকলেন।

গরমে স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে একাধিক বার স্নান করা মোটেই আশ্চর্যের নয়। অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে আমেদাবাদের ভ্যাপসা গরমে ক্ষীণকায় হওয়া সত্ত্বেও আমারই স্নান করতে ইচ্ছে করছিল। তবে গীতা হাতে করে বাথরুমে যাওয়া! সাহেবরা কি বাথরুমে বাইবেল পাঠ করে?

একটা সিগারেট ধরিয়ে গীতা-রহস্যের কথাই ভাবছিলাম। গীতার শিক্ষা কি? নিষ্কাম কর্ম? স্বদেশ স্বজাতি স্বধর্মের জন্যে বিরতিবিহীন সংগ্রাম? তাই যদি হয়, তবে নিজের জন্যেই বা নির্দয় সংগ্রাম নয় কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত মার্কিন লোক ক্রিস্টোফার ইসারউডের একটা লেখায় পড়েছিলাম যে গীতা যুদ্ধকে সমর্থন করে না, আবার ধিক্কারও দেয় না।* অভিমতটির তাৎপর্য বোধ হয় গীতার শিক্ষার সংগে জীবনসংগ্রাম তত্ত্বের কোন অসংগতি নেই। তা-হলে গীতায় বিশ্বাসী হয়েও একটু বেশী বাঁচার প্রয়াস, একটু বেশী সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা করলেও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করা হয় না। বরং বলা যায়, স্বধর্ম বা আত্মতুষ্টিসাধনের ধর্মই পালন করা হয়। সুতরাং গীতার শিক্ষাকে কি সকাম ধর্ম বলে অভিহিত করা যায় না?

চিন্তার জাল কেটে গেল বাথরুমের দরজা খোলার শব্দে। ধর্মপ্রাণ বেরিয়ে এসেছেন স্নানের উপকরণ সমেত। দেরী না করে আমিও ঢুকে পড়লাম—পুরোপুরি না হোক, আর একবার কিছুটা প্রক্ষালন করা যাক্।

---

* প্রবন্ধটির নাম *The Gita and War*, গ্রন্থখানির নাম **Vedanta for the Western World.**

ঢুকে দেখি ওয়াশ-বেসিনের ওপর সাবান ইত্যাদি রাখার জায়গায় মোড়া অবস্থায় ধর্মপ্রাণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাখানি—পরিত্যাগ করে নয়, ভুলেই রেখে চলে গেছেন। সংগে সংগে দরজায় করাঘাত এবং ধর্মপ্রাণের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর: হামারা কিতাব, হামারা গীতা বেসিন পর ছোড় গিয়া···।—অর্থাৎ অনুরোধ হল, আগে গীতাখানি তাঁর হস্তে সমর্পণের ব্যবস্থা করে তবে যেন কৃত্যকর্ম সম্পাদন করি।

এই ত প্রতিশোধের সুযোগ। সংক্ষেপে বললাম, আভি নেহি।

—কেওঁ নেহি?—কণ্ঠস্বরে কৈফিয়ত তলবের চেয়ে অনুনয়েরই প্রাধান্য।

কঠিন স্বরে বললাম, ঝামেলা করবেন না, আধঘণ্টা পরে আসবেন। আমি এখন স্নান করছি।

ধর্মপ্রাণ নাছোড়বান্দা, এবার কাতর স্বরে প্রার্থনা জানালেন, মেহেরবানি করে এক মিনিটের জন্যে দরজাটা খুলুন—যে অবস্থায় থাকেন না কেন, খুলুন। এখানে ত জেনানা নেই!

জিদ আরও বেড়ে গেল—এখন কোনমতে দরজা খোলা সম্ভব নয় বলে জানালাম; তারপর বললাম, আধঘণ্টা গীতা পাঠ না করলে ধর্মভ্রষ্ট হবেন না।

এবার ধর্মপ্রাণের কাছ থেকে কি জবাব এল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ওয়াশ-বেসিনের ওপর গীতাখানা রাখা, কৌতূহলবশত খুলেই ফেললাম। খুলেই বুঝতে পারলাম, গীতায় রহস্য আছে। টাইটল্-পেজবর্জিত হিন্দি গীতা। পাতা ওলটালাম। ধর্মপ্রাণ যত্ন নিয়ে পড়েছেন বটে—পাতায় পাতায় মার্জিনে নোট। দেবনাগরী অক্ষর কিছুটা চিনলেও হিন্দি বিশেষ পড়তে পারি না, তার ওপর আবার হাতের লেখা হলে ত কথাই নেই। তবুও নোটগুলো যে গীতার শ্লোকের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন তা বুঝতে দেরী হল না। বুঝতে পারলাম, ওপরে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হলেও আসলে সেখানা হিসাবের খাতা, আর মার্জিনে নোটগুলো হিসাবেরই দফা ও অংক।

এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। কয়েক পাতা ওলটাবার পরই এক জায়গায় গীতাখানি আপনা থেকে খুলে গেল। সেখানে একখানা পুরোনো খাম—খুব মোটা নয়। রহস্যের গন্ধ পেয়ে খামখানাও খুলে ফেললাম। খামের মধ্যে একখানা চিঠি, আর চিঠির মধ্যে খানতিনেক কোয়ার্টার সাইজ ফোটো।

তিনটি নারীর ছবি, আর এমন অবস্থায় তোলা যে সংগে থাকলে পুলিসে ধরবার আশংকা।

ফোটোগুলো যথাস্থানে রেখে গীতাখানিও মুড়ে রাখলাম।

বাথরুমের দরজা খুলেছি কি না খুলেছি, ধর্মপ্রাণ হুড়মুড় করে ঢুকে গীতাখানি করায়ত্ত করলেন। একবার দেখে নিলেন, খামখানা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। তারপর ঘরে এসে কুলি ডাকিয়ে মালপত্র নিয়ে রিটায়ারিং রুম ছেড়েই চলে গেলেন। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন।

গীতার রহস্যভেদ হয় নি, হাংগামার ভয়ে রহস্যভেদের কোন চেষ্টাই করি নি। তবে ঘটনাটি অনেকের কাছেই বলেছি এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাও পেয়েছি। কেউ বলেছেন লোকটা স্মাগ্‌লার, কেউ বলেছেন চোরাকারবারী, কেউ বলেছেন নারী-ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত।

কোন্ ব্যাখ্যা ঠিক জানি না, কোনও ব্যাখ্যা ঠিক কিনা তাও জানি না। তবে এইটুকু বুঝেছি যে গীতায় এমন কিছু গূঢ় রহস্য থাকতে পারে যার সন্ধান ভাষ্যকাররা এখনও পান নি।

রিটায়ারিং রুমে যেমন রহস্য থাকে তেমনি মাঝে মাঝে রোমান্সের সন্ধানও পাওয়া যায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ রহস্য ও রোমান্স সমজাতীয় উপাদান।

রহস্য-রোমান্সের খোঁজে নয়, নিতান্ত গন্ধময় কারণেই নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে প্রথমে রিটায়ারিং রুমে জায়গা পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করি, আর পেলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। ভি. টি. স্টেশনে এই সৌভাগ্য যে আমাদের হবে, তা কল্পনাও করি নি। তবুও স্টেশনে নেমে অভ্যাসমত খোঁজ করতে গেছি। সশংক প্রশ্নের উত্তরে আশারই ইংগিত: আপনারা ক-জন?

আমরা দু-জন—জানাতে উত্তর পেলাম, হ্যাঁ দুটো বেড খালি আছে, তবে এক ঘরে নয়—দুটো আলাদা ঘরে।

একটু মুষড়ে গেলাম। দু-জনে আলাদা ঘরে অচেনা যাত্রীর সংগে থাকা অসুবিধাজনক। কিন্তু উপায় কি? এখনই হোটেলের খোঁজে বেরোনোর চেয়ে ভাল। রাজী হয়ে বিছানা দখলের টিকিটি কেটে, নাম লিখিয়ে দু-জনে হাজির হলাম নিজ নিজ ঘরে।

ঢুকে দেখি একখানা বিছানা খালি—সুতরাং সেইটেই আমার। অপর-খানির ওপর বেশ কিছু পরিমাণে পোশাক ছড়ানো, অধিকারী স্বয়ং ঘরে নেই। সংগে সংগে ঘরের বিশেষ কোণ থেকে মৃদুকণ্ঠে পরিচিত সিনেমা-সংগীতের ছত্র কানে আসাতে বুঝতে পারলাম যে আমার অচেনা শরিক স্নানঘরে।

পনের মিনিট কেটে গেল, তৈরি হয়ে বসে আছি, ভদ্রলোকের বাইরে আসার নাম নেই। প্রায় দু-দিনের একটানা ট্রেন-জার্নির পর বাথরুম ব্যবহারটিই বেশী প্রয়োজনীয়। ওদিকে আবার বেলাও হয়ে যাচ্ছে, প্রাতর্ভোজন সেরে শহরের দিকেও বেরোনো দরকার—প্রথমত হোটেলের খোঁজ করতে, আর দ্বিতীয়ত শহরের কিছুটা দেখতে।

অপর ঘর থেকে বন্ধু এসে হাজির। বললেন, কি তৈরি? চল ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়া যাক্।

জানালাম প্রতিবন্ধকের কথা। বন্ধু পরামর্শ দিলেন, আমাদের ঘরের বাথরুম এখন খালি, করণীয় ব্যাপার ওখানেই সেরে নিও।

পরামর্শ গ্রহণ করে বন্ধুর সংগে তাঁর ঘরেই গেলাম।

বাইরে যাবার জন্যে পোশাক পরিবর্তন করতে বন্ধুসহ ঘরে এসে দেখি ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন। ভদ্রলোক না বলে তরুণ বা কিশোর বলা উচিত—এক উনিশ-কুড়ি বছরের বালক, বিছানায় বসে সযত্নে কেশচর্চা করছে। বোধহয় বাথরুমে কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল তাই সুসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা। সুদাম কেশগুচ্ছ সত্যিই দেখবার মত—কোন কেশতৈল কোম্পানি সন্ধান পেলে নিশ্চয়ই ছবি তুলে নিয়ে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করত।

ঘরে বৈদ্যুতিক পাখাটি বন্ধ ছিল। খুলে দিতেই 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে উঠে তরুণটি এক কোণে সরে গেল। কি ব্যাপার! পাখার হাওয়া সয়না নাকি, না স্নানের পর পাখার তলায় বসা নিষেধ? ব্যাপারটা অবশ্য তখনই বুঝলাম। সযত্নে রচিত কেশদাম যেন পাখার হাওয়ায় অবিন্যস্ত হয়ে না পড়ে তার জন্যেই এত সতর্কতা আর আতংকের প্রকাশ। অন্যমনস্কভাবে নিজের কেশবিরল মস্তকে একবার হস্তচালনা করে পাখা বন্ধই করে দিলাম। বন্ধুর দিক থেকেও কোন আপত্তি দেখা গেল না।

কেশবিলাসী কিশোরকে ঘরে রেখে, যদি সে বাইরে যায় তবে যেন চাবিটা অ্যাটেণ্ডাণ্টের কাছে রেখে যায় সে-সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন শুনলাম বন্ধুর মুখে আবৃত্তি:

"আমরা খেলা খেলেছিলেম,
আমরাও গান গেয়েছি···।"

তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্ধুও আমার দলে। তারুণ্যের প্রাণোচ্ছলতা আমাদের মতন প্রৌঢ়কেও আক্রমণ করে!

ফিরে এসে বন্ধুর সংগে তাঁর ঘরের দরজার কাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে নিজের

ঘরের কাছে এসে দেখলাম ঘরে তালা নেই—অর্থাৎ আমার কিশোর শরিক ঘরেই আছেন। দরজা বন্ধ নয়, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভেজানো। মনে হল তরুণ দিবানিদ্রায় মগ্ন—যাতে দরজায় করাঘাত করে কাঁচা ঘুমটা না ভাঙাই তার জন্যেই বোধহয় এই ব্যবস্থা।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু বেশ চমকে গেলাম। তরুণের বিছানায় একটা বেড-কভার চাপা দিয়ে ঘুমুচ্ছে একটি তরুণী (বা কিশোরী)। বাইরের বেশী আলো থেকে আমার ঘরের স্বল্প আলোয় সবকিছু ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। দৃষ্টিশক্তি সাধারণ হয়ে এলে ভাল করে দেখলাম, না, তরুণী নয়, আমারই তরুণ শরিক ঘুমোচ্ছেন মাথায় কাল রুমাল বেঁধে। পাখা এবার পুরোদমে ঘুরছে। যাতে শয়নাবস্থায় হাওয়ায় কেশরাজি উদ্দাম হয়ে না পড়ে তার জন্যেই নিশ্চয় এই ব্যবস্থা।

আতংকমুক্ত হয়ে জামাকাপড ছাড়তে ছাডতে ঘরখানির চারদিকে তাকালাম। তরুণের ট্রাংকটি খোলা, আরও পোশাক তা থেকে বেরিয়েছে। এখন সবই শোভা পাচ্ছে খাটের মস্তকে ও পশ্চাদ্ভাগে। জুতোই বা ক-জোড়া বা কত ধরনের। সবই সযত্নে পালিশ-করা।

দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত আমি নই, তবুও যে পুরো ঘুমিয়ে পডেছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম তা অবশ্য জানি না। 'হেল্লো মিস্টার' ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে সেই তরুণটি। কিবা তার পোশাকের বাহার। প্রান্তদেশে ভাঁজহীন হরিদ্রাবর্ণের চোঙা প্যাণ্টের (তখনও চোঙা প্যাণ্টের চলন বিশেষ হয় নি, ফলে চোখসহা হয়ে ওঠে নি) ওপর একই রং-এর নকশা-কাটা হাওয়াই শার্ট (বর্তমানে বোধহয় তাকে বাটিক প্রিণ্ট্ বলে)। মাথায় কিন্তু কৃষ্ণবর্ণের রুমালখানি তখনও জড়ানো। পদদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। সেখানে শোভা পাচ্ছে অভিন্ন রং-এর ছুঁচোলো মুখ একজোড়া শু।

কিশোরটি ঐ রং-এর ভক্ত কিনা জানি না, তবে রং মিলিয়ে—অর্থাৎ ম্যাচ করিয়ে পোশাক পরবার চেষ্টা করেছে যে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। পর্যবেক্ষণের পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

তরুণটি যা বললে তা হল এইরকম: বিকেল ৫টায় তার একটা ইণ্টারভিউ আছে। এখন প্রায় তিনটে বাজে। তবে সকাল সকাল বেরনোই ভাল। রাস্তাও প্রায় ঘণ্টাখানেকের, রাস্তায় যদি কিছু বাধাটাধা ঘটে।

বিকেল ৫টায় ইণ্টারভিউ। কোন নৈশ অফিস নাকি? আর এই ইণ্টারভিউ-এর পোশাক!

ব্যাখ্যা শুনে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু রইল না। ইণ্টারভিউ হল একটা ফিল্ম-কোম্পানিতে, কাজটা হল অভিনেতার। পাঁচটায় ফ্লোর থেকে ফিরে এসে পরিচালক ইণ্টারভিউ নেবেন।

ছোকরা যেজন্যে আমাকে ঘুম থেকে তুলেছিল তা হল যে তার রিটায়ারিং রুমে থাকার মেয়াদ সেদিন রাত ৮টা পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে সে ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ। যদি না পারে তবে যেন তার ট্রাংক ও বিছানাটা আমার নিজের জিনিসপত্রের সংগেই রেখে দিই। যত রাতই হোক না কেন, সে এসে তার মালপত্র নিয়ে যাবে। রিটায়ারিং রুমে তার থাকার মেয়াদ আরও ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা যে করেছিল, কিন্তু ফল হয় নি।

কেন যে অনুরোধে রাজী হয়েছিলাম জানি না। তবে এটা মনে আছে, এর জন্যে পরে একটু অনুশোচনা হয়েছিল এবং বন্ধুর কাছ থেকে মৃদু ভর্ৎসনাও বাদ যায় নি।

রাত ৮টার আগেই আমরা ফিরে এসেছিলাম। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছাড়ছি এমন সময় তরুণটি এসে হাজির। সংগে শালোয়ার-পরা একটি তরুণী এবং পেছনে একজন কুলি।

তরুণীটি সুন্দরী নয়, তবে চেহারায় চটক আছে। তরুণের মুখে হাসিখুসি ভাব। তবে কি ইণ্টারভিউ সফল হয়েছে? সংগের তরুণীটি কে? চিত্রজগতের কোন উদীয়মান তারকা, না মাত্র উপগ্রহ?

তরুণই পরিচয় ক'রিয়ে দিলেঃ মিস্ কাপাডিয়া। এঁর কাকা একজন প্রডিউসার। এঁদের আবার অ্যাপোলো বন্দরে হোটেলও আছে। সেইখানেই যাচ্ছি। আচ্ছা, তবে গুডনাইট।

মালবাহকের মাথায় মালপত্র দিয়ে মিস্ কাপাডিয়ার সংগে তরুণ চলে গেল।

ইণ্টারভিউ-এর কি হল? মিস্ কাপাডিয়ার সংগে কোথায় পরিচয়

হল? চলচ্চিত্র প্রযোজক ও হোটেল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী নিশ্চয়ই প্রথম দর্শনেই তরুণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে, নচেৎ সংগে করে তাদের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে আসবে কেন?—এইসব কৌতূহল মনে জাগলেও তা নিবৃত্তির আর কোন উপায় ছিল না। একখানা অর্ধপঠিত আকর্ষণীয় বই হঠাৎ হাতছাড়া হলে মনের যে-রকম অবস্থা হয়, তরুণ চলে যাবার পর আমার হল ঠিক সেই রকম অবস্থা।

দু-দিন পরে তরুণের আবার দেখা পেলাম। এবারও জোড়ে। তবে কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে নি, বরং বেড়েই গিয়েছিল। অর্ধপঠিত বইখানা আবার হাতে পেয়ে আরও দু-পাতা পড়ার মত।

এলিফ্যাণ্টার গুহা দেখে লঞ্চঘাটে ফিরছি এমন সময় কানে এল, হেল্লো স্যর!

কণ্ঠস্বর ভুল করবার কারণ নেই। তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে ঝোপের মধ্যে বসে মিস্ কাপাডিয়ার সংগে সেই তরুণটি। সে নিজেই এগিয়ে এল, পেছনে পেছনে মিস্ কাপাডিয়া। মিসের আজ কি সাজের বাহার! পরনে শালোয়ারের বদলে শাড়ী, কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত স্বচ্ছ! সযত্নে রচিত ভ্রূ আর মুখমণ্ডল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। যেন কোন চলচ্চিত্রের শটে নামবার জন্যে প্রস্তুত। তরুণও খুশিতে উথলে উঠেছে।

বন্ধুর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তরুণ জিজ্ঞাসা করলে, কফি খাবেন, আমাদের সংগে আছে। আপনাদের লঞ্চ ছাড়তে ত এখনও দেরী আছে।

একটু আগেই ক্যানটিনে চা-পর্ব শেষ করেছিলাম। সুতরাং ধন্যবাদের সংগে প্রত্যাখ্যান করলাম। আরও কারণ ছিল। কেন জানি না, আমার বন্ধুটি সম্পূর্ণ না হলেও রোমাণ্টিক আবহাওয়ায় কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেন, পালাই পালাই করেন।

বিদায় নেবার সময় তরুণকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা যাবেন না? উত্তর পেলাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব, তবে শেষ লঞ্চে। শেষ লঞ্চ কখন ছাড়ে তা আর জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

সেই বছরই বড়দিনের সময় আকস্মিকভাবে তরুণটির সংগে আবার দেখা হয়েছিল—বোম্বেতে নয়, লক্ষ্ণৌ-এ।

লক্ষ্ণৌ-এ একটা সম্মেলনে এসেছিলাম। গৃহিণী ও কন্যার আদেশ ও অনুরোধ ছিল আসবার সময় অন্তত দুখানা চিকন শাড়ী নিয়ে যাবার। তারই খোঁজে ফেরবার আগের দিন সন্ধ্যায় হজরৎগঞ্জের বেশ একটা বড় দোকানে ঢুকেছি। কাপড় পছন্দ করবার পর কাউণ্টারের কর্মচারীটি যখন টাকা ও ক্যাশমেমো নিয়ে ক্যাশের দিকে গেল তখন ক্যাশে উপবিষ্ট যুবকটিকে দেখে স্মৃতিপথ হাতড়াতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে এল না যে কোথায় দেখেছি। তবে কোথাও যে দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই।

মনে অস্বস্তি নিয়ে শেষবার যুবকটির দিকে চেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছি এমন সময় দেখি যে সে ইংগিতে তার কাছে যাবার জন্যে আহ্বান করছে।

কাছে গেলে যুবকটি জিজ্ঞাসা করলে, গত অক্টোবর মাসে আপনি কি বোম্বে গিয়েছিলেন এবং একদিন ভি. টি-তে রিটায়ারিং রুমে ছিলেন?

আর কিছু বলতে হল না।

এতক্ষণ যে চিনতে পারছিলাম না তার কারণ হলঃ প্রথমত সেই কেশদামের অভাব, দ্বিতীয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পোশাক এবং তৃতীয়ত ভিন্ন পরিবেশ।

কেশদামের পরিবর্তে মস্তক একপ্রকার মুণ্ডিত এবং একটি নাতিদীর্ঘ শিখাও শোভা পাচ্ছে—তাকে গোপন রাখবার কোন প্রচেষ্টাই নেই। সেই হরিদ্রা-বর্ণের বাটিক হাওয়াই শার্ট ও চোঙা প্যাণ্টের স্থলে ধুতি ও আধা-হাতা কুর্তা পরা। আর রিটায়ারিং রুম বা অ্যালিফ্যাণ্টার পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ-এর হজরৎগঞ্জের কাপড়ের দোকান।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলে, চা বা পান কিছু চলবে কি না।

তৃষ্ণার জন্যে ততটা নয়, যদি রহস্যের কিছুটা হদিস পাওয়া যায় সেই আশাতেই এক কাপ চা আনাতে বললাম।

ক্যাশের সামনে টুলে বসে কিভাবে প্রসংগটা উত্থাপন করব ভাবছিলাম, তরুণই সমস্যার সমাধান করে দিলে। বললে, আপনার সংগে সেই অ্যালিফ্যাণ্টার পর আর দেখা হয় নি…তারপর যা হল সে এক কহানী…অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে…সেই যে কাপাডিয়া ছোকরী…শয়তানী…।—হঠাৎ সে থেমে গেল, তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে ভীতিমিশ্র মৃদুস্বরে শুধু 'পিতাজী' বলে চুপ করল।

আমিও পেছন দিকে ফিরে দেখি গম্ভীর প্রকৃতির এক ভদ্রলোক ক্যাশের দিকে আসছেন। ফলে 'কহানীটি' আর শোনা হল না।

পিতাজীর পেছনে পেছনে একজন ভৃত্যও ঢুকল চায়ের কাপ নিয়ে। পিতাজী আমাকে, আমার হাতে-ধরা কাপড়ের বাক্স এবং ভৃত্যের হাতে-ধরা চায়ের কাপকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে ব্যবসায়সুলভ মৃদুহাস্য করে বললেন, পিজিয়ে!

চা-টা হয়ত ভালই ছিল, কিন্তু জীবনে কোন দিন চা আর এত বিস্বাদ বলে মনে হয় নি। কোনরকমে অর্ধকাপ শেষ করে কাপড়ের বাক্সটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বলের ভাগ্য

আবার দেখা হল। এবার আর পাঠানকোট স্টেশনের ওয়েটিং রুমে নয়, নয়া দিল্লীর নর্দার্ন রেলওয়ের বুকিং অফিসে। প্রথমটা আমি চিনতে পারি নি, না পারার কারণও ছিল। আর কিছু না থাক, মুখে সেই অনুপেক্ষণীয় দৃষ্টি-আকর্ষক ঝোলানো পাইপ নেই। সংকেত-বাক্যের মত 'গত পূজোর সময় সেই যে কাশ্মীর···' বলা মাত্র সবই চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সামলাতে বেশ একটু সময় লাগল। তারপর স্বাভাবিক প্রশ্নই করলাম : মিসেস দত্ত কেমন আছেন ?

—ঐ যে উনি, মিঃ দত্ত অদূরে উপবিষ্ট ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে দিলেন। চমকে গেলাম। একি পরিবর্তন ! কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সামলে ওঠা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে বিপরীত দিকে। ভদ্রমহিলাকে দেখে সে দিনের মিসেস দত্তকে কল্পনা করা একান্ত অসম্ভব। আভিজাত্য ও আধুনিকতার কোন পরিচয়ই আজ তাঁর সাজসজ্জায় নেই ; উপরন্তু দৃষ্টিও যেন উদ্‌ভ্রান্ত।

সাধারণ সৌজন্যবিধির অনুসরণে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করব কিনা ভাবছিলাম, মিঃ দত্ত মনের ভাব বুঝে ইংগিতে নিবৃত্ত করলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, আপনাকে দেখলেই সেই ট্রাজিক ট্রিপের মেমরি আবার স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ··ভদ্রলোক শেষ করতে পারলেন না বলেই মনে হল।

শেষ করার প্রয়োজনও ছিল না, এমনকি ওটুকু না বললেও চলত। প্রকৃত-পক্ষে নিবৃত্ত করার ইংগিতের সংগে সংগেই আমার ইতস্তত ভাবটা কেটে গিয়েছিল। কোন কৌতূহলও ছিল না—সবই যেন বুঝে ফেলেছিলাম। আর বুঝে ফেলার পর দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হল অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করা। তাই পালাবারই পথ খুঁজছিলাম, কিন্তু উপায় ছিল না। বুকিং ক্লার্কদের মধ্যে কার্যভার বদল হচ্ছিল, হিসাব মেলানোর পর পরের শিফ্‌টের কর্মচারী কার্যভার গ্রহণ করলে তবেই কাজ সেরে পালাতে পারব। তাই অপেক্ষাই করতে হল বুকিং কাউণ্টারের কাছে—মিঃ দত্তের পাশে দাঁড়িয়ে। রিজার্ভেশান কাউণ্টার থেকে চিরকুট আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওঁদের সংগে সেই আগের দুই সাক্ষাতের সবই কথা চলচ্চিত্রের মত স্মৃতিপথে ভিড় করতে লাগল—যেন আবার সেই মর্মান্তিক নাটকের পুনরাভিনয় দেখছি। ঐ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেও বোধহয় স্বপ্ন দেখতাম।

সপরিবারে কাশ্মীর যাচ্ছিলাম পাঠানকোট এক্সপ্রেসে। শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, এখনও প্ল্যাটফর্মে গাড়ী লাগে নি। আমাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আর-একটি পরিবার—ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর পাঁচ-ছ বছরের শিশুপুত্র। সংগে আরও একজন লোক, মনে হয় ভৃত্য।

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার পোশাক-পরিচ্ছদ আচার-আচরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করবারই মত, কিন্তু তার পরিবর্তে আমাদের কেমন যেন বিতৃষ্ণারই সঞ্চার হয়েছিল। নিখুঁত সাহেবী পোশাকে সজ্জিত ভদ্রলোক ঝোলানো পাইপ মুখে দিয়ে উর্ধ্বাংশ অ-পর্যাপ্তভাবে আবৃত, আধা-স্বচ্ছ শাড়ী-পরিহিতা, মেক-আপ-বিলাসিনীদের প্রতিনিধিস্থানীয়া ভদ্রমহিলার সংগে যে সংলাপ রচনা করে চলেছিলেন তা মৃদুস্বরে নয়; ফলে তার মোটামুটি সবই কানে ভেসে আসছিল।

ভদ্রলোক: ভাবছি কম্পার্টমেণ্টটা ঠিক আবার চাকার ওপর না পড়ে, তাহলে রাত্রে ঘুমের দফা রফা।

ভদ্রমহিলা: সেইজন্যেই ত বলেছিলাম এ. সি.-তে চল।

ভদ্রলোক: এ. সি. আর প্লেনের ভাড়ায় বিশেষ তফাত নেই।

ভদ্রমহিলা: তাহলে প্লেনে গেলেই হত।

ভদ্রলোক: সার্ভেণ্ট নিয়ে প্লেন ট্র্যাভেল!···তবে দিল্লী হয়ে এ. সি.-তে যাওয়া যেত···ভুল হয়ে গেছে। এ গাড়ীতে ত এ সি. নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সংলাপের পুনরারম্ভ।

ভদ্রমহিলা: হ্যাঁ, কুপে যাওয়া যাবে ত? নইলে চেঞ্জ করাই মুশকিল হবে।

ভদ্রলোক: ট্র্যাভেল এজেণ্টস্ ত অ্যাস্যুরেন্স দিয়েছে।···

আবার কিছুক্ষণ বিরতি এবং পরে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর: মনে আছে ত, পাঠানকোটে বাসের টিকিট সারেণ্ডার করে ট্যাক্সি বা স্টেশন-ওয়াগনের ব্যবস্থা করতে হবে?

—নিশ্চয়ই মনে আছে, ভদ্রলোক আশ্বাস দেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকের কণ্ঠ: আমার সেই ট্যুইড জ্যাকেটটা আনতে ভোল নি ত? গুলমার্গে টেম্পারেচার দেখলাম জেরো ডিগ্রির কাছাকাছি।

—ও সব ব্যাপার আমার ভুল হয় না, ভদ্রমহিলা যেন একটু আত্মশ্লাঘার সংগেই বলেন।

ছেলেটিকে দেখলে কিন্তু সত্যিই ভাল লাগে—আদর করতে ইচ্ছে হয়। মোটামুটি স্বাস্থ্যবান ছেলে, কিন্তু কোথায় যেন একটা বিষণ্ণ ভাব তাকে ঘিরে রেখেছে। নীরবে বাবামায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টিতেও তার কোন আগ্রহ নেই—এ বয়সে যে প্রাণচাঞ্চল্য, যে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক, কোথায় যেন তার অভাব।

ছেলেটির মাধ্যমেই উভয় পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

স্বপ্নের জাল ছিন্ন হয়ে গেল মিঃ দত্তের প্রশ্নে: দিল্লীতে কি ব্যাপার?

—এসেছিলাম প্রফেশনাল কলে,—উত্তর দিয়ে আমিও প্রশ্ন করি, আপনারা?

—আমি এসেছি অফিসের কাজে, আর ওঁকেও এনেছি—দত্তও সংক্ষেপে উত্তর শেষ করেন। তারপর আবার দু-জনেই নির্বাক, আবার সেই স্বপ্ন চলচ্চিত্রের শুরু।

ধানবাদ না কোন স্টেশনে প্লাটফর্মে নেমেছিলাম। ট্রেনে উঠে দেখি করিডর-বারান্দায় আমার কন্যা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সামনের কুপের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে আর বলছে, এসো, এসো। কুপের দরজা ঈষৎ ফাঁক করা, আর সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছেলেটির মুখ।

কোন কিছু না বলেই নিজের কামরায় ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে কন্যা এল ঐ শিশুটিকে সংগে নিয়ে। বললে, রুনুকে নিয়ে এলাম, ওর বাবা মা আসতে দিলেন।—তারপর জানালে, প্রথমে ওর মা আসতে দিচ্ছিলেন না, বলছিলেন এখন ফুড খাবার সময়। পরে বললেন, ফুড খাবার এখনও পনের মিনিট দেরী আছে, যাও নিয়ে যাও—দশ মিনিটের মধ্যেই দিয়ে যেও কিন্তু।

শিশুটি চলে গেলে কন্যা আরও জানাল, আমি যখন নিয়ে আসছি তখন

রুনুর মা বললেন, ওকে কিছু খেতে দিও না যেন—ও যখন তখন খায় না। আমিও বলে এসেছি,—কন্যা সংবাদ পরিবেষণ করলে, আমরাও যখন তখন খাই না।

দশ মিনিটেই ছেলেটির ওপর আমাদের সকলের কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল, কেন ঠিক জানি না। বাড়ীতে কোন শিশু নেই বলেই বোধহয়।

সন্ধ্যার সময় কন্যা আবার ছেলেটিকে নিয়ে এল। আমরা সবাই আদর করলাম, তবে সতর্কবাণী স্মরণ করে কিছু খেতে দিই নি। কোন এক স্টেশনে আতা বিক্রি হচ্ছিল, জানলার পাশ দিয়েই হেঁকে চলে গেল। ছেলেটি হঠাৎ বলে বসল, আতা ফল খেতে খুব ভাল····মা বলেন ও ফ্রুট খাওয়া খারাপ।

এবার রুনুকে নিতে এলেন রুনুর বাবা। দরজায় টোকা শুনে খুলে দেখি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বললেন, এবার ওকে নিয়ে যাব, ওর খাবার সময় হয়েছে।

দীর্ঘ পথ, পাশাপাশি কামরা। সুতরাং দুই পরিবারের মধ্যে আলাপ হল কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হল না। লক্ষ্ণৌ-এ আমি ও ভদ্রলোক দু-জনেই প্লাটফর্মে নেমেছিলাম। ট্রেন ছাড়ার সংকেত দিলে দু-জনেই একসংগে ট্রেনে উঠলাম। যে যার কামরায় যাবার সময় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে কারেণ্ট ব্রাড্‌শ আছে?

উত্তর দিলাম, না, অল ইণ্ডিয়া টাইমটেব্‌ল্‌ আছে।

—ওতেই চলবে। একবার পেতে পারি?

—নিশ্চয়ই।—টাইমটেব্‌ল্‌খানা এনে ভদ্রলোকের হাতে দিলাম।

বোধহয় অন্যমনস্কভাবে 'নিশ্চয়ই' শব্দটির পুনরুক্তি করে ফেলেছিলাম। মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কিছু বলছেন?

সচেতন হয়ে বললাম, না, আপনাকে নয়; ভাবছিলাম আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

মিঃ দত্ত বললেন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও ত কষ্টকর, তার চেয়ে চলুন বাইরে একটু পায়চারি করা যাক্‌। বোধ হয় ক্যাশ মেলাতে আরও কিছুক্ষণ লাগবে।

তাকিয়ে দেখলাম দু-জন বুকিং ক্লার্কই হিসাবের গরমিল নিয়ে ব্যস্ত। বুঝলাম এ অবস্থায় কত দেরী হবে জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। বাইরে বেরিয়ে এলাম পায়চারি করতে।

পায়চারি করতে করতে ছিন্নসূত্র আবার জোড়া লাগল।

রুনুকে নিয়ে আমার কন্যা রীতিমত মেতে উঠেছে। বেরিলি না কোন্ স্টেশনে তাকে নিয়ে যেতে তার মা-ই এসেছিলেন। নিয়ে যাবার সময় ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আপনাদের সংগে ভাল করে আলাপই হল না।

আমার স্ত্রী জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই হবে, এক সংগে যখন যাচ্ছি।

আপনারাও কাশ্মীর যাচ্ছেন?—ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তরে আমার স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, তবে সোজা নয়, ডালহৌসী ঘুরে।

আলাপ ট্রেনেই হয়েছিল। একটা স্টেশনে নেমে জল আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার অর্ধাংগিনী ও ভদ্রমহিলা করিডরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন। অর্ধাংগিনী ফিরলেন অনেকক্ষণ পরে। বুঝলাম, দুই ভদ্রমহিলা পরস্পরের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা মিটিয়ে নিয়েছেন।

স্ত্রীর মুখ থেকেই পরিবারটির পরিচয় জেনেছিলাম। ভদ্রলোক—মিঃ দত্ত হলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার, কোন এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, নিউ আলিপুরে নতুন বাড়ী করেছেন। রুনু তাঁদের একমাত্র সন্তান।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার ঐ একটিই?

ভদ্রমহিলা একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, গুটিকয়েকের কাল কি আর আছে? একটিকেই মানুষ করা কঠিন।—তারপর নাকি প্রশ্নাকারে আরও মন্তব্য করেছিলেন, একটির বেশী ইস্যু হলে দাম্পত্য জীবনের কি আর কিছু থাকে?

পাঠানকোট স্টেশন থেকেই ছাড়াছাড়ি হয়েছিলাম। ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ থেকে তৈরি হয়ে ওঁরা চলে গিয়েছিলেন কাশ্মীর সরকারের রোডওয়েজের অফিসের দিকে। আমরা আরও কিছুক্ষণ ছিলাম, কারণ আমাদের ডালহৌসীর বাসছিল বেলা ১০টায়।

ওঁরা চলে যাবার সময় রুনুকে নিয়ে আমার কন্যার কি আদর! আমাদেরও মন খারাপ হয়েছিল; আমার অর্ধাংগিনীর চোখ ছলছল করছিল।

বুকিং অফিসের সামনে নীরবেই পায়চারি করতে করতে স্মৃতিচারণ করছিলাম, এমন সময় মিঃ দত্তের কথা কানে গেল: যাই, একবার খোঁজ নিয়ে আসি ক্যাশ মিলল কিনা, আর ওঁকেও একবার দেখে আসি।

মিঃ দত্ত চলে গেলেন। ডালহৌসী থেকে ফেরার পর ওয়েটিং রুমের সেই দৃশ্য আবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

ডালহৌসী থেকে পাঠানকোট স্টেশনে পৌঁছেছিলাম বিকাল চারটে নাগাদ। পরদিন সকালে কাশ্মীর যাত্রা। কোন রিটায়ারিং রুম খালি আছে কিনা খোঁজ করতে গিয়ে জেনেছিলাম, সাড়ে পাঁচটায় কাশ্মীর মেল ছাড়ার আগেই কয়েকখানা খালি হবে। সুতরাং ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলেই একখানা-না-একখানা নিশ্চয়ই পাব। এই একঘণ্টা সময় কাটাবার জন্যেই ওয়েটিং রুমে ঢুকেছিলাম।

ঢুকেই দেখি দত্ত পরিবার বসে আছেন, কিন্তু মাত্র মিঃ ও মিসেস দত্ত— রুনুকে দেখতে পেলাম না। কোথায় যেন কি একটা হয়ে গেছে। মিসেস দত্তের পরিপাট্যের লেশমাত্র নেই, মিঃ দত্তের মুখে নেই সেই ঝোলানো পাইপ। দু-জনেই যেন দু-দিনে দশটা বছরকে এক লাফে অতিক্রম করে এসেছেন।

হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলাম, এক নিদারুণ আশংকায় বুকও কাঁপছিল। আমার স্ত্রীর মুখেও কথা নেই। কন্যা কিন্তু জিজ্ঞাসা করেই ফেললে, রুনু কোথায়?

ঐটুকুই যথেষ্ট ছিল। একবার মুখ তুলে চেয়ে ভদ্রমহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মিঃ দত্তকে একবার করুণ আবেদন করতে শুনলাম: একটু স্থির হও · এখানে অনেক লোক।...

কিন্তু এ কান্না কি কোন বাধা মানে? কৃত্রিম আভিজাত্যের প্রতিবন্ধক এখানে অচল মুদ্রার মতই মূল্যহীন।

জেনে লাভ নেই, তবুও জানতে চেয়েছিলাম কি করে দত্ত পরিবারের এই সর্বনাশ হল—কোন দুর্ঘটনা কি?

জেনেছিলাম, না, দুর্ঘটনা নয়—এন্‌কেফেলাইটিস্‌। পাঠানকোট থেকে বাস ছাড়ার পর মিসেস দত্ত আবিষ্কার করেন রুনুর গা গরম। পথে জ্বর উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং জম্মু পৌঁছোবার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

জম্মুতে ওঁরা নেমে পড়েন, ডাক্তার দেখানো হয়। ডাক্তার অবিলম্বে রুনুকে হাসপাতালে পাঠাতে নির্দেশ দেন। আর হাসপাতালেই—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই···। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিলেন, রোগের নাম এন্‌কেফেলাইটিস্‌।

রাত ৮টায় শিয়ালদা এক্সপ্রেসে দত্তরা চলে গেলেন। আমরা তুলে দিয়েছিলাম।

মিঃ দত্ত বাইরে এলেন; জানালেন যে হিসাবের গরমিলের মীমাংসা এখনও হয় নি—আরও কিছু সময় লাগবে। তারপর প্রস্তাব করলেন, চলুন, ভেতরে গিয়ে একধারে বসা যাক, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—ঘুমিয়ে পড়েছেন! আমার স্বরে খানিকটা বিস্ময়ই ছিল, কারণ একখানা স্টীলের কোচ ঠিক ঘুমোবার জায়গা নয়।

—না, ঠিক ঘুমিয়ে পড়েন নি,—দত্ত নিজেকে সংশোধন করলেন, তবে মাঝে মাঝে কি রকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

রিজার্ভেশান হলের মধ্যে ঢুকে মিসেস দত্তের বিপরীত কোণে একটা স্টীলের সোফায় দু-জনে বসলাম। রিজার্ভেশন-ক্লার্ক কাউণ্টারে চুপ করে বসে আছেন। বুকিং কাউণ্টারের গোলমাল এখনও মেটে নি বোঝা যাচ্ছে। না মিটলে রিজার্ভেশন কাউণ্টারে কোন কাজ নেই। মিঃ দত্তের দিকে চাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবেন?

বলার কিই বা ছিল? তবুও মন্তব্যটা করে ফেললাম: মিসেস দত্ত ঠিক সামলে উঠতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

—না, অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে, মিঃ দত্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতই উত্তর দিলেন। তারপর যেন আমার উপস্থিতি অনুভব করে বললেন,

আমাকে চোখের আড়াল করেন না, অফিসে বারবার ফোন করেন, ট্যুরে গেলে সংগে নিয়ে যেতে হয়—কার কাছেই বা রেখে যাব ?··

একটা কথা বিশেষ খোঁচা দিচ্ছিল, না বলে পারলাম না।

—আমার মনে হয় মিঃ দত্ত,—বলে একটু থামতে হল, আর একটা বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত মিসেস দত্তের সুস্থ হয়ে ওঠা· · ।

—তা আমিও জানি মিঃ মুখার্জী,—দত্ত আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে কোনমতে শেষ করলেন, কিন্তু তা আর কোনমতে সম্ভব নয়।·· রুনুর জন্মের সংগে সংগেই আমরা সে সম্ভাবনাকে নিজেরাই নির্মূল করে দিয়েছি।

দত্তের মুখের দিক তাকিয়ে নির্বাক হয়েই রইলাম।

চক্ষুষ্মান

—অভিধানে চক্ষুষ্মান্ বলে একটা শব্দ আছে যার অর্থ হল চোখওয়ালা লোক—অর্থাৎ যে ঠিক দেখতে পায় বা দেখে, বলে ভূমিকা ফাঁদলেন কাকাবাবু। কিন্তু ঠিক কি বলতে চান বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রইলাম।

—বলছিলাম কি,—কাকাবাবু ব্যাখ্যা করে চললেন, ছেলেবেলায় স্কুলের না কলেজের একটা বই-এ পড়েছিলাম ears to hear and eyes to see—অর্থাৎ কিনা, কান থাকলেই শুনতে পাওয়া যায় না, আর চোখ থাকলেই দেখা যায় না। দেখবার জন্যে চোখ খুলে আর শোনবার জন্যে কান খাড়া করে রাখতে হয়। এইজন্যেই ইংরেজীতে বলে all ears, all eyes—বুঝলেন না।

তবুও নির্বোধের মত চেয়ে আছি দেখে কাকাবাবু দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিলেন: এই যে এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি তার নাম হল নূরপুর। জাহাঙ্গীর বাদশার প্রধানা বেগম নূরজাহান বা জগতের আলো জায়গাটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নূরজাহানের নামেই এর নাম হয়েছে নূরপুর। সম্রাজ্ঞী—না ভারতেশ্বরীই বলব, কারণ নিশ্চয়ই জানেন যে রাজত্বের শেষ দিকে জাহাঙ্গীর ছিলেন নামেই বাদশা, আসলে সাম্রাজ্য চালাতেন নূরজাহান। হ্যাঁ, কি বলছিলাম?—ভারতেশ্বরী নূরজাহান জায়গাটার কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা অনুভব করবার জন্যে চোখ খুলে রাখা দরকার। কিন্তু দেখুন, এরা সবাই ট্যুরিস্ট, কিন্তু কিছুই দেখছে না—ঘুমুচ্ছে, বলে কাকাবাবু তাঁর দলের দিকে অংগুলি নির্দেশ করলেন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ভাবলাম, কি গুরুবল যে আমার ঝিমুনি ধরে নি!

পাঠানকোট থেকে মণ্ডির বাসে পাশাপাশি সীটে ভদ্রলোকের সংগে যাচ্ছিলাম মণ্ডি হয়ে কুলু-উপত্যকা। দলটির সংগে আলাপ পাঠানকোটের কুলুভ্যালি ট্রান্সপোর্ট অফিসে বা বাসস্ট্যাণ্ডে। বাসস্ট্যাণ্ডে আমরা দু-জন আর ওঁরা চার জন বাঙালী—আলাপ হবারই কথা। ওঁদের দলে একজন মহিলা আর

তিন জন পুরুষ। ভদ্রলোকই বয়োজ্যেষ্ঠ—দেখে মনে হয় বয়স ষাটের কম নয়। সবাই তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকে, দেখাদেখি আমরাও কাকাবাবু বলে সম্বোধন করতে শুরু করলাম।

পূর্বপ্রসংগের সূত্র ধরে কাকাবাবু বললেন, শুধু চোখকান থাকলেই হল না, সংগে সংগে থাকা চাই কিছুটা ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞান। এ সব কটাই হল অনুভূতির—ভ্রমণ-রস আস্বাদনের দ্বার। কোনোটাই না থাকলে বেড়ানোটা হয় দন্তহীন অবস্থায় মাংস খাওয়ার মত—পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না।

প্রতিবাদের কিছু ছিল না। বললাম, তা ত বটেই।

—তবে যদি চণ্ডীগড়ের মত আধুনিক শহর দেখতে চান,—কাকাবাবু ব্যাখ্যা চালিয়ে গেলেন, তখন অবশ্য ভূগোল-ইতিহাস কোন কাজেই লাগবে না। কিন্তু এই ধরুন কাংড়াভ্যালি বা আগ্রা শহর—এখানে চক্ষুকর্ণের সাপ্লিমেণ্ট হল ভূগোল-ইতিহাস। তবুও কিন্তু,—ভদ্রলোক যেন ছাত্র পড়াচ্ছেন বা আদালতে হাকিমকে বোঝাচ্ছেন এমনভাবে বললেন, ওরা সাপ্লিমেণ্ট, বেসিক জিনিস নয়। তা যদি হত তবে বাড়ীতে বসে ভূগোল-ইতিহাস পড়লেই চলত।

যেন মনে মনে উপমাটা ভেবে নিয়ে খানিকক্ষণ পরে কাকাবাবু আবার বললেন, মাত্র ভূগোল-ইতিহাস থেকে জ্ঞানলাভ ছেলেবেলায় সংস্কৃত বই-এ পড়া ব্রাহ্মণের সেই চার অন্ধ পুত্রের হাতি সম্বন্ধে ধারণা করার মত।

কাকাবাবুর বাক্‌পটুতা সত্যিই তারিফ করবার মত। তাঁর পেশার পরিচয় জানা না থাকলে ভাবতাম হয়ত ভদ্রলোক অধ্যাপক, কিন্তু জেনেছিলাম তিনি একজন ইনকাম-ট্যাক্সের উকিল। যুক্তিবিজ্ঞানী হলে বোধহয় সঠিক অনুমানই করতাম, কারণ ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মুগ্ধ করার চেয়ে ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিসে অফিসার ও মক্কেলকে মুগ্ধ করা আরও কঠিন।

বাস চড়াই-এর পথ ধরলে কাকাবাবু বললেন, এইবার কাংড়াভ্যালির

শুরু, তবে আসল কাংড়াভ্যালি হল শাহপুর থেকে। শাহপুর ছাড়িয়ে একটু গেলেই বাঁ দিকে ধরমশালার পথ। আমাদের বাস অবশ্য সেখান দিয়ে যাবে না।

কিছুক্ষণ পরে দুঃখ প্রকাশ করলেন, ধরমশালা হয়ে না-হয় নাই গেল—ধরমশালায় দেখবার কিছু নেই, কিন্তু কাংড়া শহর হয়ে ত গেলে পারত। কাংড়ার বজ্রেশ্বরীর মন্দিরটা দেখবার ইচ্ছা ছিল। জানেন ত মুসলমান আমলে বজ্রেশ্বরীর মন্দির তিন বার লুঠ হয়েছে?

জানতাম না। অংশত কাকাবাবুর ইতিহাসজ্ঞানের প্রশংসা এবং অংশত নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নাকারে বিস্ময়ই প্রকাশ করলাম, তিন বার।

—হ্যাঁ, তিন বার,—কাকাবাবু একটু জোর দিয়েই পুনরুক্তি করলেন, একবার গজনীর সুলতান মামুদ, আর-একবার ফিরোজ তুঘলক, আর শেষের বার যতদূর মনে পড়ে তৈমুর লং। কিন্তু দেখছেন,—ভদ্রলোক পাশের দিকে তাকিয়ে আবার তাঁর দলকে নির্দেশ করলেন, ওরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে। বই না পড়িস, এসব শুনলেও ত কিছু জ্ঞান হত।

এতক্ষণে বাসে ঘুমোনোর বিরুদ্ধে ভদ্রলোকের উষ্মার প্রকৃত কারণ যেন বুঝতে পারলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, সজাগ থাকতেই হবে—কাকাবাবুর পাশে বসে ঘুমোনো চলবে না।

তবুও একবার ঝিমুনির ভাব এসে গিয়েছিল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলাম কাকাবাবুর কণ্ঠ ও দক্ষিণ হস্তের অংগুলির খোঁচায়: কি মশাই, আপনিও যে দেখছি ঘুমিয়ে পড়লেন।

লজ্জিত হয়ে বললাম, না ঠিক ঘুমোই নি, তবে,—এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেও ফেললাম, একটু বোরড্ ফীল করছিলাম।

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর কৈফিয়ৎ তলবের সুরে বললেন, বোরড্ ফীল করছিলেন। কেন? আমার কথায়, না কাংড়াভ্যালির দৃশ্য দেখে?

—না, না,—অবস্থাটাকে যথাসাধ্য আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টায় বললাম, এতক্ষণ ধরে বাস-জার্নি কেমন যেন বিরক্তিকর লাগছিল।

জবাবদিহি কাকাবাবুর মনঃপূত হল বলে মনে হল না, তিনি কোন উত্তর দিলেন না। মেঘ কাটাবার জন্যে আমি প্রসংগের পুনরুত্থাপন করলাম: এখন আমরা কোন্‌খান দিয়ে যাচ্ছি কাকাবাবু?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চেয়ে ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, এইবার পালামপুর পৌছব।

—পালামপুর!—আমার স্বরে বিস্ময় বা আর-কোন্ উপাদান ছিল আমি নিজেই বুঝতে পারি নি। ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদাবোধকে আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন, হ্যাঁ, পালামপুর—perhaps the most delightful spot in the entire valley.

পালামপুরে বাস থামতেই কাকাবাবু ডান পাশের সামনাসামনি দুটো ডাব্‌ল সীটের প্যাসেঞ্জারদের সম্বোধন করে বললেন, ওঠ বাপমায়েরা। কাংড়া না-হয় নাই দেখলে, ফিরে গিয়ে লোককে ত বলতে পারবে, কাংড়া দেখে এলাম। এখন কিন্তু কিছু লোড না করলে আর বোধহয় চলবে না।

ঐ চারটি সীটের একটি অধিকার করেছিলেন আমারই বন্ধু। ভদ্রলোকের সম্বোধন তাঁর উদ্দেশ্যেও ছিল কি না, জানি না।

পথের ধারে একটা দেহাতী ভোজনালয়ে বসেই কাকাবাবু প্রশ্ন করলেন, তারপর! ঘুম ভাল হয়েছিল ত?

প্রশ্নটি পাইকারী হলেও উত্তর দিলেন তাঁর দলের মহিলাটিঃ আমরা ত ঘুমোই নি কাকাবাবু। সবই দেখছিলাম।

—সবই দেখছিলে?—একটু থেমে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, তা, স্বপ্নে না জাগরণে?

বৈজনাথ থেকে বাস ছাড়ার পর কাকাবাবু আমাকে নির্দেশ দিলেন, এইবার চোখ খুলে রাখুন। যোগীন্দরনগর থেকে ভ্যালিটার একটা পুরো ভিউ পাবেন।

মিনিটখানেক পরে তাঁর খেয়াল হওয়ায় অনুরোধ করলেন, মীরাকে একবার ডাকুন ত, বাইনোকুলারটা নেওয়া যাক, ওর কিটব্যাগে আছে। মীরা মানে তাঁর দলের ভদ্রমহিলা। তাঁর কাছ থেকে দূরবীক্ষণযন্ত্রটি নিয়ে কাকাবাবু গলায় ঝুলিয়ে বসলেন—অসতর্কতার দরুন কোন কিছু যেন এড়িয়ে না যায়।

যোগীন্দরনগরের পর চক্ষুষ্মানেরও একটু ঝিম ধরেছিল। লোভ সামলাতে না পেরে বলেই ফেললাম, কাকাবাবুও ঘুমোচ্ছেন নাকি ?

—Me ? Never ! কাকাবাবু তেড়ে উঠলেন,—বাসে ঘুমোব আমি ?—তারপরে ব্যাখ্যাস্বরূপ বললেন, চোখ বুজে একটা কথা ভাবছিলাম। কি ভাবছিলাম শুনবেন ?—কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে একবার তাঁর দলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুচ্চ স্বরে বললেন, God made the country and man made the town—ইংরেজ কবির সেই লাইনটার কথাই ভাবছিলাম। এরকম জায়গায় না এলে কবির বক্তব্যের তাৎপর্যই বোঝা যায় না…God made the country and man made the town, God made ··।—ভদ্রলোক আবৃত্তিই করে চললেন।

তাঁর দলের মধ্যে একজনের কাছ থেকে একটা বেয়াড়া কাশির শব্দ শোনা গেল।

মণ্ডিতে দু-দল একই হোটেলে উঠেছিলাম। নাম স্টাণ্ডার্ড হোটেল। কাকাবাবু আগে থেকে খবর নিয়ে জেনেছিলেন, ওটাই ওখানকার তাজমহল বা গ্রাণ্ড হোটেল।

নৈশভোজনের আগে কাকাবাবুর ঘরে বসে সবাই গল্পগুজব করছিলাম। ঘরে একটা পুরোনো সোফা-সেট ছিল, তবে তার স্প্রিং খুলে পড়ে নি।

একটা কোচে পা তুলে বসে কাকাবাবু মন্তব্য করলেন, না, হোটেলটা একেবারে বাজে নয়—ঘরে ঘরে সোফাটোফাও আছে। তবে খেতে দেয় কি রকম কে জানে।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?—মীরা দেবী বিনীতভাবে অনুমতি চাইলেন।

—কি কথা ?

—আপনারও খাওয়ার প্রয়োজন হয় ?

—নিশ্চয়ই,—কাকাবাবু জোরের সংগেই বললেন, aesthetics is not for empty stomach.

মণ্ডি থেকে যাত্রার সময় দেখি কাকাবাবু বাসের ড্রাইভারের সংগে কি এক শলাপরামর্শ করছেন। আমরা তখনও বাসে উঠে বসি নি। ওঁর দলের একজন সংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন: কাকাবাবু ড্রাইভারের হাতে কিছু গুঁজে দিলেন দেখলাম।

বাস ছাড়ার পর লক্ষ্য করলাম কাকাবাবু হাত তুলে অতি ভক্তিভরে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। পাঠানকোট থেকে বাস ছাড়ার সময় ভদ্রলোকের এই রকম ভক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম বলে স্মরণ হল না।

মিনিট কয়েক চলার পরই কাকাবাবু এদিক ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে আমাকে বললেন, এবার আরম্ভ হবে মণ্ডি-লার্জি গর্জ। পথটা একটু বিপজ্জনক, তাই ড্রাইভারকে একটু সাবধানে চালাতে বলে এলাম। কি, ঠিক করি নি?

—নিশ্চয়, বিচক্ষণতার কাজই করেছেন, তা,—একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, ড্রাইভারকে চা-টা খেতে কিছু দিলেন নাকি?

—সার্টেন্‌লি,—ভদ্রলোক স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না, কিছু না দিলে কি চলে?···আমি ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিশ করি, এ অভিজ্ঞতা ভালই হয়েছে যে sweet words alone···ওঃ যা বিপজ্জনক পথ!

পথ যে বিপজ্জনক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। পথ শুধু আঁকাবাঁকা নয়, বিশেষ সংকীর্ণও বটে। বিপাশা নদীর দু-ধারে উঁচু খাড়া পাহাড়, তারই একধার কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। কোন কোন যায়গায় পাহাড়ের অংশ বারান্দার মত রাস্তার ওপর ঝুলছে। অপর পাশে গর্জনকারিণী বিপাশা কোন জায়গায় কয়েক ফুট, কোন জায়গায় একশ-দেড়শ ফুট নিচে। জায়গায় জায়গায় শুঁড়িপথের মত সৃষ্টি হয়েছে—সারা দিনে একবারও সূর্যের আলো পড়ে না, আর যেখানে পড়ে সেখানে বড়জোর ঘণ্টাখানেকের জন্যে। কোন কোন জায়গায় আবার পিচ উঠে গেছে, সারানো হয় নি। আমাদের বাসের আগেই একখানা ট্রাক যাচ্ছিল। ফলে আমাদের একরকম আঁধির মধ্যে দিয়েই এগুতে হচ্ছিল।

কাকাবাবু যে পাশে বসে আছেন তা ভুলেই গিয়েছিলাম। যখন খেয়াল হল তখন ফিরে দেখি যে তাঁর চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ মুদ্রিত, ওষ্ঠদ্বয় কিন্তু জপের ভংগিতে সামান্য আন্দোলিত হচ্ছে। কাকাবাবু জপ করছেন! বাস ছাড়ার আগে তাঁর দেবতা-প্রণামের কথা মনে পড়ল।

আর-একবার তাকিয়ে দেখি কাকাবাবু চক্ষু সামান্য উন্মীলন করে ঘড়ি দেখছেন। লক্ষ্য করলাম, দু-তিন মিনিট অন্তরই তিনি ঘড়ি দেখে চলেছেন।

হঠাৎ একবার কাকাবাবু ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠে বললেন, আউট—আউট এসে গেছি।

কিছুই বুঝলাম না। আউট এসে গেছি—মানে কি? ভদ্রলোক কি আধঘুমন্ত অবস্থায় কোন স্বপ্ন দেখছিলেন? এখন কিন্তু সম্পূর্ণ জাগ্রত।

আমার বিমূঢ় ভাব বেশ দরদের সংগে লক্ষ্য করে শ-খানেক গজ দূরে অংগুলি নির্দেশ করে ভদ্রলোক বললেন, জায়গাটার নাম আউট—OUT নয়, AUT। এখানেই এই গর্জের শেষ আর কুলুভ্যালির আরম্ভ। জায়গাটায় ভাল ঘিয়ের হালুয়া পাওয়া যায়।

আবার কাকাবাবু সম্পূর্ণ চক্ষুষ্মান্ এবং আগের মত জ্ঞান-পরিবেশক। বাজৌয়ার বাশেশ্বর মহাদেবের মন্দির কবে ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল, কুলু শহরের কোন্ অংশকে বলে সুলতানপুর, নাগরে কি আছে, ইত্যাদি অনেক খবরই তাঁর মুখ থেকে শুনতে শুনতে দুপুরবেলায় পৌঁছুলাম মানালী।

মানালীতে এসে আমার বন্ধু ও ওঁদের দলের একজন গেলেন আশ্রয়ের খোঁজে—বেনন সাহেবের হোটেলে জায়গা পাওয়া যায় ত ভালই। আমরা বাজারে এক চায়ের দোকানে বসলাম। কাকাবাবু দূরবীক্ষণযন্ত্র নিয়ে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

ভগ্নদূতরা ফিরে এল—কোন আশ্রয় পাওয়া গেল না। সর্বনাশ! কাকাবাবু চীৎকার করে উঠলেন, এই শীতের দেশে মরব নাকি?

ধরা হল অ্যালুমিনিয়াম হাটের তত্ত্বাবধায়ককে। তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন বেনন সাহেবের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে একটা কটেজের। চমৎকার স্বয়ংসম্পূর্ণ কটেজ। কাকাবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। তিনি বলেই ফেললেন, এই রকম জায়গায় থাকতে না পেলে কি আর বেড়িয়ে আরাম!

—কিন্তু কাকাবাবু,—মীরা দেবী টিপ্পনী কাটলেন, Man made this cottage, although God made your beautiful Manali.

কাকাবাবুর মুখ থেকে সমর্থন বা প্রতিবাদ—কোন কিছুই শোনা গেল না।

ফেরার দিন সকালবেলা দেখি কাকাবাবু কিচেনে। তাঁর হাতে দু-টি বটিকা এবং এক গ্লাস জল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের ট্যাবলেট কাকাবাবু?

অপ্রস্তুতের ভাব কাটিয়ে কাকাবাবু স্বীকারই করলেন, অ্যাভোমিন ট্যাবলেট।

—অ্যাভোমিন ট্যাবলেট আপনি খাচ্ছেন!—আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলাম না, কি হয়েছে আপনার?

—কিছুই হয় নি। ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুব।

—কখন ঘুমুবেন? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ত আমরা বাসে উঠব।

—বাসেই ঘুমুব,—কাকাবাবুর স্বীকারোক্তি, ওঃ সেই হরিবল্ গর্জ!··· দেখতে যখন আর চাই না, তখন ঘুমোনোই ভাল।

প্রত্যাবর্তনের পথে চক্ষুষ্মান্ নাসিকা গর্জন করেই নিদ্রা গেলেন।

সূর্যোদয়

মনে আছে পরিবারটির সংগে পথে একবার দেখা হয়েছিল।

রাঁচি থেকে নেতারহাটের পথে প্রায় সবাই একবার করে লোহারডাগায় থামে মোটরযানকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেবার জন্যে। সংগে সংগে আবার জলযোগ এবং পানকার্যও সমাধা করা সম্ভব হয়।

আমরা এই দুই উদ্দেশ্যেই লোহারডাগায় থেমেছিলাম। মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকানে চা পান করছি এমন সময় কানে এল: বিহারের নম্বর-প্লেট, বোধহয় রাঁচি থেকে এসেছে।

তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, উক্তিটি করেছিলেন কয়েক হাত দূরে দণ্ডায়মান এক বংগতনয় আর-এক বংগতনয়কে উদ্দেশ্য করে।

দ্বিতীয় তনয়টি আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে খুব অনুচ্চ স্বরে নয় মন্তব্য করলেন, A short drive of hundred miles or so,—তারপর অদূরে অবস্থিত WBJ নম্বরপ্লেট লাগানো এক গাড়ীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মা। তুমি কি গাড়ীতে বসেই চা খাবে?

গাড়ী থেকে বামাকণ্ঠে উত্তর এল, নইলে কি ঐ রকম চায়ের দোকানে বেঞ্চিতে বসে চা খেতে হবে?

এবার প্রথম তনয়টির উক্তি: তা এখানে ট্রিংকা ব্রু ফক্স মোকাম্বো বা কোয়ালিটি কোথায় পাবে?

এবার মহিলাটির কণ্ঠ: তাই ত বলছি গাড়ীতে বসেই চা খাব—আর ভাঁড়ে। এইসব দোকানের কাপডিশ দেখলেই ঘেন্না করে।

গাড়ী থেকে আরও একটি বামাকণ্ঠ ভেসে এল: আমারও ভাঁড়ে। ক্রকারির যা অবস্থা—বাব্‌বা! তার চেয়ে ফ্ল্যাস্কে করে কফি আনলেই ভাল হত।

চা-পান শেষ করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ী ছেড়ে দেওয়ায় ভাঁড়ে করে মহিলাদের জন্যে চা গাড়ীতে গিয়েছিল কিনা, তা আর দেখা হয় নি। তবে গাড়ী ছাড়বার সময় যেন দোকানদারের কণ্ঠ কানে এসেছিল: হিঁয়া কুল্লট নেহি মিলতা।

নেতারহাটে পালামৌ ডাকবাংলোয় পরিবারটির সংগে আবার দেখা। পালামৌ ডাকবাংলোই সূর্যোদয় দেখবার প্রকৃষ্টতম স্থান বলে প্রসিদ্ধ। আমরা ছিলাম সিকি মাইলের মত দূরে P.W.D. বাংলোয়। সেখান থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পালামৌ ডাকবাংলোয় পৌছেছিলাম। গাড়ী থেকে নামতেই শুনলাম এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোককে বলছেন, পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয়। এখনও দশ মিনিট বাকি।

যাক। আশংকা কেটে গেল—দেরী হয় নি।

সূর্যোদয় দর্শনার্থীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ফলে যানের সংখ্যাও খুব ছিল কম—খানতিনেক স্কুটার আর আমাদের ছাড়া আর-একখানা অ্যামবাসাডার গাড়ী। গাড়ীখানা দেখে নয়, তার আশেপাশে দণ্ডায়মান বংগতনয় দু-টিকে দেখেই পরিবারটিকে চিনলাম।

ওঁবা বোধহয় পালামৌ ডাকবাংলোতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন—ঘুম থেকে উঠে সোজা চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই অনুমানেব কারণ উভয় তনয়েরই গায়ে ছিল বেড কভার জড়ানো। নিশ্চয়ই অক্টোবরের প্রথমে সমতলভূমি—এমনকি রাঁচির তুলনাতেও নেতারহাট যে কিছুটা ঠাণ্ডা হবে তা অনুমান করেন নি।

গাড়ী থেকে অনতিদূরে খাদের দিকে নীচু পোস্তার কাছে দু-জন মহিলা ছিলেন দাঁড়িয়ে—একজন প্রৌঢ়া, অপরজন অল্পবয়স্কা। প্রৌঢ়াটিব কোলে একটি শিশু, শিশুটির গায়ে একখানি শাড়ী পাট করে জড়ানো। অনুমান করলাম, শিশুটি অল্পবয়স্কা মহিলার এবং প্রৌঢ়াটির পৌত্র বা পৌত্রী হবে। মহিলা দু-জনের গায়ে বেড-কভারের পরিবর্তে সাদা চাদর জড়ানো—ডাকবাংলোর কিনা জানি না।

কোথায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দর্শন করব তা মনে মনে নির্বাচন করছি এমন সময় কানে এল: হ্যাঁরে হারু, গাড়ীর চাকায় হাওয়া ঠিক আছে ত?

বক্তাকে অনুসরণ করে হারুর দিকে তাকালাম এবং শুনতে পেলাম: একটু আগেই দেখেছি। হাওয়া ঠিকই আছে দাদা।

এবাব দাদার কণ্ঠ: মা, তুমি পিংকুকে নিয়ে গাড়ীতেই বস।

—গাড়ী থেকে দেখা যাবে?—মায়ের প্রশ্ন।

—যাবে, ভালোই দেখা যাবে,—হারুর দাদার আশ্বাস, গাড়ীর কাঁচটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। বাইরে থাকলে পিংকুর ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

ইতিমধ্যে আমরা নির্বাচিত স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। জায়গাটা ওঁদের গাড়ীর ঠিক সামনে, আর দূরত্বও বেশী নয়। সুতরাং সবই শুনতে পাচ্ছিলাম।

আবার হারুর দাদার কণ্ঠস্বর : মা, গাড়ীর চাবিটা দাও।

—গাড়ীর চাবি কি আমার কাছে?

—হ্যাঁ, তোমার কাছেই ত রাত্রে গাড়ীর চাবি দিলাম।

—গাড়ীর চাবি আমার কাছে দেওয়া কেন বাপু! তোরা রাখলেই পারিস। —কয়েক সেকেণ্ড পরে, এই নে গাড়ীর চাবি।

এবার হারুর পালা : মা! পিংকুকে নিয়ে গাড়ীতে ওঠ। দাদা গাড়ীর কাঁচ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

—যাচ্ছি বাবা, গাড়ীতেই যাচ্ছি।··তুমিও এস না বৌমা গাড়ীতে।

বৌমা নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন, ফিরে দেখি নি।

কিছুক্ষণ পরে বৌমার ভূমিকা : মা, গাড়ীর কাঁচটা নামিয়ে দেব? নইলে হয়ত ভাল দেখা যাবে না।

—না, গাড়ীর কাঁচ নামিয়ো না, পিংকুর ঠাণ্ডা লাগবে।

দুই পর্বতশৃংগের মাঝখান দিয়ে রক্তবর্ণ সূর্য উঠতে শুরু করেছে, মনে হয় যেন একটা বৃহৎ পলাশ ফুল খুব তাড়াতাড়ি ফুটছে।

—কিরে হারু, এই আলোয় ছবি উঠবে?—হারুর দাদার প্রশ্ন।

—উঠবে না মানে?—হারুর কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর, ক্যানন্ ক্যামেরা! ওয়ান পয়েণ্ট সেভেন লেন্স।···

—কালারড্ ফিল্ম ত?—হারুর দাদা যাচাই করেন।

—কাল রাত্রেই ত লোড্ করলাম, দেখ নি?

পশ্চাতে গাড়ী থেকে মহিলার নির্দেশ : বৌমা, গাড়ীর কাঁচটা নাবিয়েই দাও—ভাল দেখা যাচ্ছে না।

কয়েক সেকেণ্ড পরে বৌমা : শুনছ। গাড়ীর কাঁচটা নামানো যাচ্ছে না। একবার এসো না।

—নামানো যাচ্ছে না। মানে ? নতুন গাড়ী।

আমাদের পাশ থেকে হারুর দাদা গাড়ীর দিকে গেলেন।

আরও কয়েক মুহূর্ত পরে।

—নাও এবার দেখতে পাচ্ছ ?—হারুর দাদাব প্রশ্ন।

—খুব ভালই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ··তাকানো যাচ্ছে না যে,—বৌমার উক্তি।

—হ্যাঁ, চোখে বড লাগছে,—প্রৌঢা মহিলাব স্বীকারোক্তি।

ইতিমধ্যেই প্রায় সকলেই পালামৌ ডাকবাংলো ছেড়ে স্ব-স্ব স্থানে ফিরতে শুরু করেছেন।

আমি চঞ্চল হে

—এবার এখানেই পুরো বিশ্রাম—পাচমারীম্ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি !—উক্তি করলেন ওল্ড হোটেল ব্লকের মাস্টার মশায়। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা আর ক-দিন আছেন ?

উত্তর দিলাম, আরও দিন দশেক থাকব বলে মনে হয়।

—তাহলে ত ভালই হল। মাঝে মাঝে আপনাদের ওখানে গিয়ে সময় কাটানো যাবে। আপনিও আসবেন কিন্তু, সবাইকে ত আর আসতে বলতে পারি না। -ভদ্রলোক জ্ঞাত ব্যাপারটা উহ্যই রেখে দিলেন।

ভদ্রলোকের সংগে আলাপ ধূপগড়ে। ধূপগড় থেকে সূর্যাস্ত দেখা পাচমারীর অন্যতম আকর্ষণ, তবে এ শৈলাবাসে পূজোর সময় বেশী পর্যটক বা স্বাস্থ্যান্বেষী আসে না বলে ধূপগড়ে তেমন ভিড় হয় না। সেদিন মাত্র দু টি পরিবারই গিয়েছিল, আর দুটিই আমাদের হোটেল বা নিউ হোটেল-ব্লক থেকে।

ধূপগড়ে চৌকিদার-সহ একটি বাংলো আছে। সংস্কারের অভাবে বাংলোটির প্রায় ভগ্নদশা। সংস্কারের অবহেলার কারণ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। চৌকিদার জানালে: ইংরেজ আমলে অনেক সাহেবসুবো ওখানে রাত কাটাতেন, এখন লোকই আসে কম, আর যারা আসে তারাও সূর্যাস্ত হওয়া মাত্র নীচে নামতে শুরু করে। এখন বাংলোর বারান্দাটি মাত্র ব্যবহৃত হয়, তাও সন্ধ্যায় মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য। বাইলোগ ওখানে বসেই সূর্যাস্ত দেখেন—তাঁরা ত আর মরদানা বালবাচ্চাদের মত পাহাড়ে উঠতে পারেন না !

ওই বারান্দাতেই বসে ছিলেন ধুতি-পরা ভদ্রলোক। সুতরাং তিনি আমাদের আগেই পৌছেছিলেন। পরে জেনেছিলাম, তিনি ওল্ড হোটেল-ব্লক থেকে হেঁটেই এসেছিলেন, অনেকটা রাস্তা চার-পাঁচ মাইল হবে। আর ধূপগড়েও হেঁটে উঠেছিলেন।

কোন কাজটাই অবশ্য অ্যাডভেঞ্চারের পর্যায়ে পড়ে না, তবুও কিন্তু খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারি নি। একেবারে একা চার-পাঁচ মাইল রাস্তা

ভেঙে আসা, তার ওপর সূর্যাস্ত দেখতে চার-পাঁচ-শ ফুট পাহাড়ে চড়ে একা অপেক্ষা করা কেমন যেন অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।

ভদ্রলোকই আলাপ শুরু করেছিলেন। সোজা পাহাড়ে না চড়ে প্রথমে যখন বাংলোর বারান্দায় উঠলাম তখন ভদ্রলোক পশ্চিম দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। বহুজনের পদশব্দে একবার ফিরে তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মনে হল, বাঙালী দেখে ভদ্রলোক যেন আলাপ করতেও ইচ্ছুক, আবার সংগে মহিলা আছেন দেখে নিজে থেকে আলাপ করতেও ইতস্তত করছেন।

ভাবটা অবশ্য কাটিয়ে উঠতে দেরী হল না, আবার মুখ ফিরিয়ে আমাকেই লক্ষ্য করে বললেন, সূর্যাস্তের এখনও দেরী আছে। আপনারা কি কেউ চা খাবেন? খান ত এখনই বলতে হয়, চৌকিদার আমার জন্যে চা তৈরি করতে গেছে।

আমাদের সংগে যে পরিবারটি ছিল তার কর্তা মিঃ মজুমদার প্রশ্নাকারে সম্মতি দিলেন: তা চা খাওয়া যাক, কি বলেন?

ক-কাপ চা জেনে নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই বাংলোর পেছন দিকে গেলেন চৌকিদারকে জানাতে।

চা পান করতে করতে সামান্য আলাপ হল—কোথা থেকে আসছি, কোথায় উঠেছি, এই পর্যন্ত। পরস্পরের নাম তখনও জানা হয় নি। সূর্যাস্তের সময় হলে বাইলোগ সমেত সবাই পাহাড়ে উঠে গেলেন। মহিলারা আজকাল অন্তত স্বীকার করতে চান না যে তাঁরা এ ব্যাপারে পিছপাও।

বাংলোর বারান্দায় বসে রইলাম ভদ্রলোক ও আমি।

সবাই চলে গেলে ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, পাহাড়ে ওঠার কোন অর্থ হয় না। আমি গত দু-দিনও এসেছিলাম। পরশু দেখেছি পাহাড় থেকে, আর কাল এইখান থেকে। কোনই তফাত নেই; তবে বাচ্চাদের একটু পাহাড়ে ওঠবার শখ থাকতে পারে।···

অবাক হবারই কথা। বলেই ফেললাম, পর পর তিন দিন এসেছিলেন এতটা রাস্তা শুধু সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে!

—না, ঠিক তা নয়,—ভদ্রলোক বললেন, প্রথম দিন এসেছিলাম সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে। দ্বিতীয় দিন ভাবলাম, আর-একবার দেখা যাক। আর আজ তার হোটেলে-বসে কি করি—চলেই এলাম।

—হেঁটে ?—এবারও জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

একরকম তাই বটে,—ভদ্রলোক জানালেন, প্রথম দিন আমাদের ওল্ড হোটেল-ব্লক থেকে একদল এসেছিলেন। তবে গতকাল আর আজ হেঁটেই এসেছি।

—আর ফেরবার সময়ও কি পদব্রজে ? আমার বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে জবাব পেলাম, না, গতকাল আর পদব্রজে ফিরতে হয় নি। আপনাদের নিউ হোটেল-ব্লক থেকে একদল এসেছিলেন। তাঁরাই লিফট দিয়েছিলেন।

এবার আমি কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন : ঐ সূর্যাস্ত হচ্ছে, এবার মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই ডুবে যাবে। সংগে সংগেই ওঁদের পাহাড় থেকে নামিয়ে আনবেন কিন্তু, নইলে অন্ধকার হয়ে যাবে।

সূর্যাস্ত হওয়ার সংগে সংগেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ওঁদের ডাকুন। একসংগেই নামা যাক।

ডাকতে যাওয়ার আগে আমি বললাম, একসংগে যাওয়াও যাক। আজও না-হয় নিউ হোটেল-ব্লকের আর-একদল আপনাকে লিফট্ দিলে!

উত্তরে ভদ্রলোক শুধু বললেন, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক কেমন যেন মুখচোরা। গাড়ীতে চুপ করেই বসে রইলেন, মনে হল, মহিলাদের সামনে স্বাভাবিক হতে মোটেই অভ্যস্ত নন।

হোটেলের সামনে গাড়ী থামতেই ভদ্রলোক নেমে পড়ে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে উদ্যত হলেন। তখন ভদ্রতার খাতিরে না বলে পারলাম না, একটু বসবেন না ?

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখে প্রস্তাব করলাম : আসুন না, আর-এক কাপ চা খাওয়া যাক।

ভেবেছিলাম তিনি সবিনয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর-একদিন আসবার

প্রতিশ্রুতি দেবেন, কিন্তু দেখলাম যে রাজীই হয়ে গেলেন। বললেন, আপত্তি নেই—কিছুটা সময় ত কাটবে।

এই সময় কাটানোর ফাঁকেই ভদ্রলোকের খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলাম।

ভদ্রলোকের পেশা শিক্ষকতা—তিনি শহরতলির এক স্কুলের হেডমাস্টার। বয়স তাঁর ষাট ছোঁবছোঁব করছে। কিন্তু দেখে মনে হয় পঞ্চাশের সামান্য ওপরে।

সেদিন অবশ্য তিনি বেশীক্ষণ থাকেন নি। যাবার সময় আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গিয়েছিলেন পরের দিন তাঁর হোটেলে যাবার।

তাঁর হোটেল—যার নাম ওল্ড হোটেল-ব্লক—একটা বাড়ী নয়, ছাড়াছাড়া কতকগুলো বাংলো নিয়ে হোটেলের ব্যবস্থা। আমাদের হোটেল—যার নাম নিউ হোটেল-ব্লক—থেকে ওল্ড হোটেল-ব্লকের দূরত্ব আধ মাইলের মত।

পরের দিন প্রতিশ্রুতিমত ওল্ড হোটেল-ব্লকে গিয়ে দেখি মাস্টার মশায় আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন। 'আসুন, আসুন' বলে অভ্যর্থনা করলেন। সেদিনই আলাপের মাধ্যমে তাঁর পূর্ণ পরিচয় পেলাম।

মাস্টার মশায় অকৃতদার। তিনি সবেমাত্র কর্মজীবনে ঢুকেছেন এমন সময় একটি মাত্র শিশুপুত্র ও পত্নীকে রেখে তাঁর দাদা হঠাৎ মারা গেলেন। নিকট আত্মীয় বলতে তাঁদের আর কেউ ছিল না। কাজে কাজেই মাস্টার মশায় বিধবা বৌদি ও ভাইপোকে নিয়ে সংসার পাতলেন—নিজে সংসার করার কথা ভাববার আর সময় পেলেন না। বউদি অবশ্য পীড়াপীড়ি করতে ছাড়েন নি, কিন্তু মাস্টার মশায় তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বছর দশেক পরে ভাইপোটির বয়স যখন পনের বছর তখন বউদিও চোখ বুঁঝলেন। ফলে সংসারে রইলেন খুড়ো আর ভাইপো।

খুড়ো-ভাইপোর এই খাপছাড়া সংসার ভরে উঠল আরও বছর দশেক পরে ভাইপোটির বিয়ে হয়ে বউ ঘরে এলে। মাস্টার মশায়ের বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। ইতিমধ্যে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ পেয়েছেন।

হঠাৎ একদিন ভাইপোটি বদলি হয়ে গেল নাগপুরে—তার বদলিরই চাকরি।

একা কোথায় থাকবে, খাবে কোথায়—চিন্তা করে মাস্টার মশায় বউমাকে সংগে পাঠিয়ে দিলেন। ভাইপো অবশ্য প্রথম বারেই বৌ নিয়ে যেতে চায় নি।

এর পর থেকে মাস্টার মশায়ের কি যে হতে লাগল তা তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না। স্কুলে যেতে ভাল লাগে না, বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগে না, সহকর্মীদের সংগ ভাল লাগে না।

দু-একদিন পরে কোন এক সামান্য কারণে ছেলেরা এসে ধরল হাফ-হলিডের জন্যে—নিশ্চয়ই শিক্ষকরা তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যবার ছেলেদের এই ধরনের আবদার তিনি অগ্রাহ্য করবারই চেষ্টা করতেন, আজ কিন্তু এককথায় ছুটি দিয়ে দিলেন। তাঁর হল কি?—তিনি নিজেই ভেবে পেলেন না।

স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার পথে একটা পুকুর পড়ে। সেই পুকুরে ধোপারা কাপড় কাচে। পুকুরের পাড় দিয়ে যাবার সময় তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে প্রশ্ন করলেন, রোজ রোজ একই ভাবে কাপড় কাচা—দিনের পর দিন একই কাজ করে যাওয়া—ওদের ভাল লাগে?

সেইদিনই বিকালে ভৃত্য যখন চা করে নিয়ে এল তখন মাস্টার মশায়ের মনে হল, রোজ রোজ চা করে দিতে ওর ভাল লাগে?

রোজ সন্ধ্যায় মাস্টার মশায় গঙ্গার ধারে গিয়ে খানিকটা বসতেন। সেদিন অভ্যাসমত বেরিয়ে পড়ে তাঁর মনে হল একই জায়গায় রোজ রোজ বেড়াতে কারও ভাল লাগে?

পরদিন স্কুলে গিয়েও একই অবস্থা—সেই একই প্রশ্ন মনকে বারবার খোঁচা দিতে লাগল। মাস্টার মশায়ের দুর্ভাবনা হল: তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, অথবা কোন কঠিন রোগে পড়বেন? না, কিছুদিন ঘুরে আসতে হবে, তাতে মনটা হয়ত শান্ত হবে—মাস্টার মশায় সিদ্ধান্ত করে ফেললেন।

গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় এসে গেছে। সুতরাং সিদ্ধান্তমত কাজ করার অসুবিধা হবে না। কিন্তু একা কোথায় যাওয়া যায়? ভাইপো-বৌমার কাছে নাগপুরে?

এমন সময় খবরের কাগজে কেদার-বদরী ভ্রমণের এক বিজ্ঞাপন তাঁর নজরে পড়ল। ঠিক ছুটির সংগে সংগেই যাত্রা। মাস্টার মশায় ঐ পর্যটন-সংস্থার একখানা টিকিট কেটে ফেললেন।

যাত্রাতেও কোন পরিবর্তন হল না। কামরায় একই তীর্থযাত্রীর দল, বাসে তারাই, চটিতে তারাই, ফেরবার পথেও তারা—'the same old faces !'

ফেরার পথে মাস্টার মশায় তীর্থযাত্রীদের সংগে হরিদ্বার পর্যন্ত এলেন। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে বাড়ী ফিরলেন একেবারে ছুটি কাটিয়ে।

একা একা ঘুরে একঘেয়েমির ভাবটা অনেক কেটে গেল। নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন লোকজন—যেন এক রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে যাওয়া!

বাড়ী ফিরে স্কুলের কাজে যোগদান করে আবার সেই ভাবটা ফিরে এল। তবে আগের চেয়ে অনেকটা চাপা। মাস্টার মশায় দিন গুণতে লাগলেন, কবে আবার পূজোর ছুটি হবে।

ইতিমধ্যে একটি বিষয়ে তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল—ভ্রমণ-সাহিত্য পাঠ করা। ভ্রমণ-সাহিত্য পড়েন, মনে মনে নোট করেন আর সামনের ছুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বেড়াতে বেরিয়ে কোন জায়গাতেই দু-তিন দিনের বেশী থাকতে পারেন না, তা সে যত ভাল জায়গাই হোক না কেন। অথচ একই জায়গায় পাঁচ-সাত বার গেছেন।

এবার ঠিক করেছেন পাচমারীতেই ছুটি কাটাবেন—এখানেই পুরো বিশ্রাম—পাচমারীম্ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। অবশ্য ফেরবার পথে দু-এক দিন বেনারসে থাকার ইচ্ছে, সেখান থেকে সোজা বাড়ী। বয়স হয়েছে, দৌড়ঝাঁপ করতে আর ভাল লাগে না। আর জায়গাটাও মন্দ নয়।

বিবরণ শেষ করে মাস্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনারা আর ক-দিন আছেন?

জানালাম, দিনদশেক ত বটেই।

—তাহলে ত ভালই হল। মাঝে মাঝে আপনাদের ওখানে সময়

কাটানো যাবে। আপনিও আসবেন কিন্তু, সবাইকে ত আর আসতে বলতে পারি না।……

ফেরবার সময় মাস্টার মশায় খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। বিদায় নেবার সময় বললাম, কাল তাহলে আপনার পালা, অবশ্য যদি আবার ধূপগড়ে যাবার ইচ্ছে না থাকে।

—না, না কাল আর ধূপগড়ে যাচ্ছি না, আপনাদের হোটেলেই যাব।

—অপেক্ষা করব কিন্তু, বলে চলে এলাম।

পরের দিন সকালেই পঞ্চপাণ্ডবের গুহার কাছে মাস্টার মশায়ের সংগে আবার দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম, বিকালে আসছেন ত?

মাস্টার মশায় বললেন, ঠিক বিকালে নয়, সন্ধ্যার পর। একটু গর্জের দিকে যাবার ইচ্ছে আছে।—তারপর একটু ভেবে প্রস্তাব করলেন, আপনিও আসুন না—দু-জনে একসংগে বেড়ানো যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, গর্জটা কতদূর?

—কতদূর আবার, মাইল-দুয়েকের বেশী হবে না।

রাজী হয়ে গেলাম। কথা হল আমি বিকালে ওঁর হোটেলে যাব, আর সেখান থেকেই দু-জনে গর্জ দেখতে যাব। যাতায়াতে প্রায় চার মাইল পথ। সুতরাং আর কাউকে সংগে নেওয়া ঠিক হবে না।

যথাসময়ে ওল্ড হোটেল-ব্লকে মাস্টার মশায়ের বাংলোয় ঢুকে দেখি তিনি বারান্দায় বসে টাইমটেব্‌ল্‌ দেখছেন। আমাকে আগের মতই সাদরে অভ্যর্থনা করলেন: আসুন, আসুন!

—কি ব্যাপার, টাইমটেব্‌ল্‌ দেখছেন কেন?—যে প্রশ্নটা উঁকি দিচ্ছিল সেটা আর চাপতে পারলাম না, পাচমারীম্‌ পরিত্যজ্য কোথায় যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

—না, ঠিক তা নয়, ভাবছি,—মাস্টার মশায় আমতা আমতা করে বললেন, ভাবছি একবার জব্বলপুর গেলে হত।

—এত যায়গা থাকতে জব্বলপুর কেন?—স্বাভাবিক প্রশ্নই আমার মনে এল, আপনার ভাইপো কি এখন জব্বলপুরে?

—না, তারা এখন লক্ষ্ণৌ।

—তবে ?—আমি ছেড়ে দিলাম না।

—জব্বলপুর যাচ্ছি পূর্ণিমায় মার্বেল রকটা দেখতে, কালই ত কোজাগরী পূর্ণিমা।

—তবে কালই যাচ্ছেন ?

—না, আজই।

—আজই !—অবাক না হয়ে পারলাম না।

—হ্যাঁ, ভাবছি বোম্বে-বেনারস এক্সপ্রেসে রাত সাড়ে দশটায় উঠে আড়াইটে নাগাদ পৌছব—মাত্র চার ঘণ্টার রাস্তা। এত কাছে এসেও যদি পূর্ণিমার দিন মার্বেল রকটা না দেখি।··

বুঝলাম যে, মাস্টার মশায় সংকল্প স্থির করে ফেলেছেন। হেসে বললাম তাহলে এবারও বিশ্রাম হল না। আবার নতুন জায়গা, নতুন মুখের সন্ধানে

শেষ করতে পারলাম না, বেশ একটু অন্তরংগতার স্বরে আশ্বাস দিয়ে মাস্টার মশায় আমায় থামিয়ে দিলেন, না, না, তা কেন ? পরশু ত আবার ফিরে আসছি।··তখন একবার সবাই মিলে গর্জের দিকে যাওয়া যাবে।

'সবাই' বলতে মাস্টার মশায় কি বোঝাতে চেয়েছিলেন জানি না।

নির্দিষ্ট দিনে কেন, আমরা যতদিন ছিলাম মাস্টার মশায় পাচমারীতে ফিরে আসেন নি। নিশ্চয় সোজা বাড়ীও ফেরেন নি। জব্বলপুর থেকে কোন পূর্বপরিচিত স্থান তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল—অপরিচিত স্থান ত আর বিশেষ নেই।

হোটেলটা ভালই, তবুও মিঃ ওঝার মনঃপূত হয় নি। প্রধান কারণ, ঘরে ঘরে টেলিফোন নেই। আমাদের অবস্থানক্ষেত্র অবশ্য ঠিক হোটেল নয়, ছুটি কাটাবার জন্যে নির্মিত আবাস বা হলিডে-হোম—নাম 'রতন টাটা অফিসারস্ হলিডে-হোম', উটকামণ্ড।

টাটা কোম্পানীই এই হলিডে-হোম নির্মাণ করেছিল তাদের উচ্চতন কর্মচারীদের জন্যে। শুনেছিলাম টাটনগর থেকে অফিসাররা এতদূর পর্যাপ্ত সংখ্যায় না আসায় হলিডে-হোমটিকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারত সরকার এর একাংশ সংরক্ষিত রেখেছেন প্রতিরক্ষাবাহিনীর অফিসারদের জন্যে, আর অপরাংশ ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের মত পর্যটকদের জন্যে।

যেহেতু হলিডে-হোম—ঠিক হোটেল নয়, সেইহেতু অন্য সমস্ত বন্দোবস্ত থাকলেও ঘরে ঘরে টেলিফোন নেই। এর বোধহয় একটা পরোক্ষ উদ্দেশ্যও আছে—যাতে ব্যবসাদাররা এসে এখানে ভিড় করে এর চরিত্র নষ্ট না করে।

জাত হোটেলের অন্যতম আকর্ষণ ঘরে ঘরে টেলিফোন নেই দেখেও কেন যে সস্ত্রীক মিঃ ওঝা স্যাভয়-সিসিল ইত্যাদিতে না উঠে অপেক্ষাকৃত সুলভ এই হলিডে-হোমে আস্তানা নিয়েছিলেন, তা ঠিক জানি না। খরচ বাঁচানোর জন্যে নিশ্চয়ই নয়। তাঁদের কোনমতেই সংগতিহীন বা কৃপণ বলে মনে করা যায় না।

ওঝা-দম্পতি হোটেলেই থাকতেন না, বলা চলে। ব্রেকফাস্টের পরই তাঁরা একখানা ট্যাক্সি করে বেরিয়ে পড়তেন, আর ফিরতেন সন্ধ্যার আগে। অধিকাংশ দিন লাঞ্চও করতেন বাইরে।

সন্ধ্যার পর কিন্তু মিঃ ওঝাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যেত লবিতে টেলিফোনের ঠিক পাশের চেয়ারটিতে। কোন কোন দিন বেড়িয়ে এসে নিজেদের ঘরে যাবার সময় শুনতাম রিসিভারটি ধরে মিঃ ওঝার কণ্ঠ: Yes, yes. Urgent. PP. Mr. Narang, অথবা Just a minute. What did you

say about my ticket number—India 145?—অর্থাৎ সন্ধ্যার পর থেকেই মিঃ ওঝা ট্রাংক-কল বুক করে চলতেন যাতে নৈশভোজনের আগেই কাজ শেষ করতে পারেন।

এক একদিন রাত্রে অবশ্য তাঁকে ডিনার-টেবিল ছেড়েও উঠে যেতে হত যখন ডেভিড (হোটেলের বেয়ারা) এসে খবর দিত : ট্রাংক-কল ফ্রম ক্যালকাটা বা ধানবাদ। এক একদিন ডিনারের পরও তাঁকে টেলিফোনের পাশে গিয়ে বসতে হত।

এই প্রসংগেই মিঃ ওঝা ক্ষেদোক্তি করেছিলেন : সব ব্যবস্থাই ভাল, তবে ঘরে ঘরে টেলিফোন নেই।

শুনে ম্যানেজার প্রাক্তন আর্মি-অফিসার মিঃ মেনন একটু বক্রোক্তিই করেছিলেন : হলিডে-হোমে প্রতি ঘরে টেলিফোন না থাকাই ভাল। এখানে ত লোক ছুটি উপভোগ করতে আসে—ব্যবসা করতে নয়।—তারপর একটু মোলায়েম করে বলেছিলেন, তাছাড়া উটি মোটেই ব্যবসার জায়গা নয়।

এর উত্তরে মিঃ ওঝা বলেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ব্যবসাদাররাও এখানে আসে। উত্তরে মেজর মেনন আর কিছু বলেন নি।

সেদিন দেখি ওঝা-দম্পতি বিকেল হতেই ফিরছেন। আমরা তখন বেড়াতে যাবার জন্যে বেরিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম, আজ এত সকাল সকাল ফিরলেন যে ?

—হ্যাঁ, একটু সকাল সকালই ফিরলাম, গেছলাম লাভডেল,—বলেই মিঃ ওঝা একবার মিসেস ওঝার দিকে তাকিয়ে একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেললেন : কি রকম রোমান্টিক নাম দেখেছেন—লাভডেল ! দুঃখের বিষয় যখন এলাম তখন প্রৌঢ়ত্বকে অতিক্রম করতে চলেছি।

মিসেস ওঝা একবার তাঁর স্বামীর দিকে চেয়ে মুখ নীচু করলেন।

বলতে ভুলে গেছি, মিঃ ওঝা কলকাতার লোক এবং আমাদের মতই বাংলা বলেন।

পরের দিন সকালে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওঝাদের সংগে দেখা। ঠাট্টার সুরে বললাম, কি মিঃ ওঝা, রোমান্স ছেড়ে একেবারে বোটানি

—না, না তা ঠিক নয়,—ওঝা যেন কৈফিয়ৎ দিলেন, আজ লাঞ্চের পরই কুন্নুর যাব কিনা, তাই।

ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? উটি ছেড়ে কুন্নুর গিয়ে উঠবেন নাকি?

—না, বেড়াতেই যাচ্ছি। সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

বলেই ফেললাম, আমাদেরও একদিন কুন্নুর যাবার ইচ্ছা ছিল।

শুনে মিঃ ওঝা আমন্ত্রণই করলেন: আপনারাও আসুন না, চার জনে একসংগে যাওয়া যাবে।

এতটা ঠিক প্রত্যাশা করি নি। তাই আমন্ত্রণ গ্রহণ না প্রত্যাখ্যান করব ঠিক করতে না পেরে অর্ধাংগিনীর দিকে চেয়ে দেখি তিনি অদূরে মিসেস ওঝার সংগে আলাপে মগ্ন। নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ তাঁদেরও কানে গেছল।

কিছু বলবার আগেই দু-জনে আমাদের দিকে চাইলেন। অর্ধাংগিনী বললেন, চল কুন্নুর দেখেই আসি। একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে।

—সুযোগ বলছেন কেন?—মিসেস ওঝাই প্রতিবাদ করলেন (তিনিও ভাল বাংলা জানেন)। এ ত আমাদেরই সৌভাগ্য।

রাজী হয়ে গেলাম।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে দু-জন ভদ্রমহিলা একটু দূরে দূরে ঘুরতে থাকায় আমি আর মিঃ ওঝা পরস্পরের কাছাকাছি এলাম। এইবার মিঃ ওঝার আরও পরিচয় পেলাম। ঘুরতে ঘুরতে তিনি জানা-অজানা কত গাছগাছড়ার সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি বোটানির ছাত্র?

মিঃ ওঝা উত্তর দিয়েছিলেন, মোটেই নয়, হর্টিকালচারে ইণ্টারেস্টেড মাত্র।

শুধু হর্টিকালচার নয়, দেখলাম মিঃ ওঝার ইতিহাসজ্ঞানও উল্লেখযোগ্য। কথাপ্রসংগে তিনি বললেন, উটি আসার পথে আমার সবচেয়ে কি ভাল লেগেছে জানেন?—জায়গার নামগুলো: ভওয়ানী ব্রীজ, অ্যাডারলে, হিলগ্রোভ, ওয়েলিংটন, লাভডেল, রুণীমীড—Of course not that Runneymede where King John signed the great Charter.

অথচ মিঃ ওঝা একজন ব্যবসায়ী, উটিতে সস্ত্রীক এসেছেন ছুটি উপভোগ

করতে। তাঁর নিজের ভাষায়, A businessman is more than a servant, indeed he is a slave. এখানে এসেও কি নিস্তার আছে! দেখেন নি, সন্ধ্যার পরই ট্রাংক-কল বুক করে বসে থাকতে হয়?

বললাম, কথায় বলে, Uneasy lies the head…

শেষ করবার আগেই মিঃ ওঝা বললেন, অন্তত এখানে যতটা পারি ক্রাউনটাকে নামিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুমোবারই চেষ্টা করব।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমোবেন কদিন—মানে আছেন কদিন?

—দেওয়ালীর আগে পর্যন্ত নিশ্চয়ই, দেওয়ালীটা কলকাতায় কাটাবারই ইচ্ছা। ফেরার পথে অবশ্য দু-একদিন ম্যাড্রাসে থাকতে পারি।

ওঝারা আমাদের আগেই বোটানিক্যাল গার্ডেন ছেড়ে চলে গেলেন। মিঃ ওঝা বললেন, একবার বাজার যেতে হবে, কিছু কেনাকাটা করার আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু, সকাল সকাল লাঞ্চ সেরে বেরোবার চেষ্টা করব।

লাঞ্চে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি এমন সময় দরজায় করাঘাত। খুলে দেখি মিঃ ওঝা দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখচোখের ভাব একটু অস্বাভাবিক মনে হল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? লাঞ্চের জন্যে তাগিদ দিতে এসেছেন নাকি?

—না, তা নয়,—মিঃ ওঝা একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনাদের সংগে কুন্নুর যাওয়ার সৌভাগ্য আর হল না।

নানা আশংকা মনে ভিড় করে এল; তার একটাই অবশ্য প্রকাশ করলাম: কি ব্যাপার? মিসেস ওঝা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নাকি?

—না, আমাকে দিল্লী যেতে হবে, কলকাতা থেকে লাইটনিং কল এসেছে।—তারপর আবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, A businessman is worse than a slave—ছুটি আমাদের নেই বুঝলেন!

ওঝাদের যাবার সময় ট্যাক্সির কাছে দাঁড়িয়ে আমরা আনুষ্ঠানিক বিদায় জানিয়েছিলাম। ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে মিঃ ওঝা বললেন, দুটো বড় চিন্তা: কাল ম্যাড্রাস থেকে দিল্লীর মর্নিং ফ্লাইটে সীট পাব কি না। তার চেয়ে বড় কথা, আজ কইমবাটুর থেকে নীলগিরি এক্সপ্রেসে কোন বার্থ পাব কি না। দেখি কি হয়। হয়ত থার্ড ক্লাসেই ট্রাভেল করতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।

রঙ্গলোর বাঙ্গলা

—হাম কুচ নেহি খাতা,—একটু থেমে অনাথদা ফর্দও দিলেন, স্রেফ মাছ মাংস দুধ ফল আর · মিসটি—বুঝালিয়া সর্দারজী ?

সর্দারজী বেশ খানিকটা মুখব্যাদান করেছিলেন, 'বুঝলিয়া' শুনে মুখগহ্বরকে যথাসম্ভব সংকোচনের দ্বারা বাক্‌নিঃসরণের উপযোগী করে স্বীকার করলেন, নেহি জী, সমঝা নেহি।

—মাচ মাংস দুধ···, —অনাথদা তালিকার পুনরাবৃত্তিই শুরু করলেন, কিন্তু শেষ করবার আগেই সর্দারজী বিপরীত দিক দিয়ে সমস্যাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন, কেয়া, আপ সব্‌জি নেহি খাতা ?

—সব্‌জি ?—অনাথদা প্রশ্নাকারে শব্দটির পুনরুচ্চারণ করলেন, মানে তরকারি ? না না, আলু ছাড়া হাম কুচ নেহি খাতা হায়।

—তব ত আলু চলে গা।—সর্দারজী যেন একটু স্বস্তি বোধ করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ভিণ্ডি ?

—ভিণ্ডি মানে ত ঢ্যাড়স। নেই নেই ঢ্যাড়সট্যাড়স একদম নেই চলে গা। হাম্ ত আপ্‌কো স্রুতেই বোল দিয়া—স্রেফ মাছ মাংস···

সর্দারজী অনাথদাকে থামিয়ে দিলেন, বোধহয় তালিকাটি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। জানালেন, মাছ পাওয়া শক্ত—ভাল মছলি বড়-একটা আসে না। তবে মাংস রোজই পাওয়া যাবে—মাটন আর সপ্তাহে দু-তিন দিন মোরগা। দুধ যদি আলাদা করে নেন তবে সর্দারজী মাঙিয়ে দেবেন—মিঠা দুধ পো ভর বারা আনা (তখন নয়া পয়সা চালু হয় নি), ফিকা লেনেসে ভি একই ভাউ। লাঞ্চে সর্দারজী ফ্রুট দেবার চেষ্টাই করবেন, তবে এটা ত আর আপেলের সময় নয়, আর এখানে ভাল আমের ভীষণ দাম। অবশ্য দো দফে মিঠাই-এর ব্যবস্থা তিনি করবেন, কিন্তু বাঙ্গালকা রসগুল্লা মিলবে না—খোয়ার খাবারই মিলবে।

সর্দারজী তাঁর বক্তব্য জানিয়ে প্রস্থান করলে অনাথদা বেশ মুষড়ে পড়লেন। তারপর আমাদেরই দোষারোপ করতে শুরু করলেন: কেন এই অখদ্দের

জায়গায় নিয়ে এলাম? খাবারদাবার এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু 'সীনসিনারি' দেখে মানুষ বাঁচতে পারে? এর চেয়ে কাশী গেলেই হত। সেখানে গরমে না-হয় একটু কষ্ট হত, কিন্তু খাওয়াদাওয়া? মাছ মাংস দুধ ফল মিষ্টি—তাঁর ফর্দমত সবই। তার ওপর ল্যাংড়া উঠতে শুরু করেছে—আসবার পথেই ত মুঘলসরাই স্টেশনে দেখা গেছে।··

সর্দারজী আবার ফিরে এলেন। একটা তথ্য সংগ্রহ করতে তাব ভুল হয়ে গিয়েছিল: আণ্ডা নেহি চলে গা?

—জরুর চলে গা, প্রশ্নের সংগে সংগে অনাথদা জানালেন।

—তব ঠিক হ্যায়।

এবার প্রত্যাশিত উত্তর পেয়ে সর্দারজী কতকটা খুশী মনেই চলে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর অনাথদা অনুশোচনা করলেন, না, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, এককথায় স্বীকার করা ঠিক হয় নি—মনে হচ্ছে মাংসের বদলে ডিমেব তরকারি চালাবে।

অনাথদা আরও মুষড়ে পড়লেন।

সবে যুদ্ধবিরতির পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কাশ্মীরে পযটক যাওয়া শুরু হয়েছে। দিনে পাঠানকোট থেকে মাত্র দুখানা বাস ছাড়ে। তাবই একখানাতে সকাল ৮টায় চেপে আমরা তিন জন পরেব দিন বিকালবেলায় শ্রীনগর পৌঁছলাম। তখন বানিহালের বর্তমান ট্যানেল কেটে পথের দৈর্ঘ্য কমাবার পরিকল্পনা মাত্র করা হয়েছে, কাজে হাত দেওয়া হয় নি। ফলে ঐ রকম সময়ই লাগত। মনে আছে, পথ ছিল ২৬০ মাইলের মত।

শ্রীনগরে কোন এক হাউসবোটে থাকবাব ইচ্ছে নিয়েই গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম হাউসবোটে থাকায় শুধু বৈচিত্র্যই নেই, আরামও যথেষ্ট—অন্তত দিনকয়েক নিজেকে রাজাবাদশা, নিদেন জমিদার-তালুকদার বলে মনে হয়।

অনাথদার কিন্তু খবর ছিল অন্যরকম। তাঁর নিজের ভাষায়: হাউসবোটে থাকায় হয়ত আরাম আছে কিন্তু খেতে দেয় অতি বাজে বলেই শুনেছি। তার চেয়ে হোটেলই ভাল।

অনাথদার প্রস্তাবমত উঠেছিলাম ফার্স্ট ব্রিজের কাছে কাশ্মীরী খালসা হোটেলে। ঠিক করে দিয়েছিলেন, শ্রীনগরে বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী নিয়োগী মহাশয়। অনাথদা কার কাছ থেকে যেন তাঁর নামে একখানা পরিচয়পত্র এনেছিলেন।

অনাথদার মুষড়ে-পড়া ভাব খানিকটা কেটে গেল বেয়ারা চা নিয়ে ঢুকতে। চায়ের সংগে কুচো নিমকি ইত্যাদি দু-তিন রকমের ভোজ্য দেখে অনাথদা মন্তব্য করলেন, না, খুব খারাপ হবে বলে মনে হচ্ছে না। নিয়োগী মশাই কি আর বাজে হোটেল ঠিক করে দেবেন! তবে যাই বল, খেতে হয়ত বেনারস —মাছ মাংস দুধ দই রাবড়ি সবেরই ছড়াছড়ি!

নৈশভোজনের সময় বেয়ারা প্রথমে সব্‌জি নিয়ে এল। পাত্র হাতে নিয়ে নীরবে একজনের কাছ থেকে আর-একজনের কাছে ঘুরতে লাগল। অনাথদার কাছে গেলই না, বোধহয় তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল ঐ ভদ্রলোক সব্‌জি খান না।

অনাথদা ঠিকই বুঝেছিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সব্‌জি হে?

—মাশ্‌রুম,—বোধহয় সব্‌জি শব্দ থেকে প্রশ্নটি অনুধাবন করে বেয়ারাই জবাব দিলে।

—O mushroom! It's a delicacy, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন একজন অবাঙালী পর্যটক।

—Is it so?—বলেই অনাথদা বেয়ারাকে নির্দেশ দিলেন, ইধার লে আও—হাম থোড়াসে টেস্ট করেগা।

এমন সময় হোটেলের মালিক সর্দারজী ডাইনিং-হলে ঢুকলেন। কাশ্মীরের হোটেলওয়ালা, কিভাবে অতিথি-পরিচর্যা করতে হয় ভালভাবেই জানেন। তার ওপর বর্তমানে হোটেল-ব্যবস্থার চাহিদার চেয়ে যোগানের পরিমাণ অনেক বেশী—পর্যটকের সংখ্যা এখনও নগণ্য। একদিকে হোটেল এবং অন্য দিকে হাউসবোটগুলোর মধ্যে দামভিত্তিক প্রতিযোগিতা বা রেট-কাটিং চলছে।

এই অবস্থায় হোটেল-মালিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সযত্ন ব্যবহারে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সর্দারজী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, আপ্ তব সব্‌জি লেংগে? মগর আপ্‌কো লিয়ে এগ্‌-কারী বানোয়ায়া হ্যায়।

অনাথদার মুখে সন্দেহের ছায়া পড়ল। বললেন, স্রেফ এগ্‌-কারী? মাংস নেই?

—মীট ভি হ্যায় সবকো লিয়ে, আউর আপকো লিয়ে স্পেশাল—এগ্‌-কারী।

বলার সংগে সংগে আর-একজন বেয়ারা ডিমের ডালনার ছোট একটা বাটি অনাথদার পাশে রেখে গেল।

অনাথদা দোটানায় পড়লেন। টেবিলের ওপর ডিমের ডালনা আর পাশে বেয়ারা ডেলিকেসির পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। ভোজনকক্ষের সবগুলি জোড়া চক্ষুই তাঁর ওপরে নিবদ্ধ। অনাথদা একবার চোখ বুজলেন, তারপরই দণ্ডায়মান বেয়ারাকে আদেশ করলেন, লে যাও।—আর কিছু বলতে পারলেন না।

সর্দারজী ততক্ষণ মনসমীক্ষণের পালা শেষ করে ফেলেছেন। অনুরোধের সুরেই বললেন, উসকো ভি থোড়া চাক লিজিয়ে।

একবার সর্দারজীর দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে পরিচারককে আবার আদেশ বললেন,—আচ্ছা, লে আও।

পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় অনাথদা আবার মুশকিলে পড়লেন। দূর থেকে আধারে ভোজ্যটি দেখেই চিনে ফেলেছিলেন। যেন আপন মনেই বললেন, ছানার ডালনা বলে মনে হচ্ছে।

অবাঙালীরা তার উক্তি অনুধাবন করতে পারেন নি, আমরাও কোন উত্তর দিই নি। ফলে তিনি পরিবেশককেই জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেন, ওয়েটার, ও কোন্ সব্‌জি হ্যায়?

—পনীর, চীজ-কারী।

—ওভি, লে আও ত থোড়া, চাককে দেখি—অনাথদা আদেশ জারি করলেন।

এ দু-দিনে সব বোর্ডারই অনাথদাকে চিনে ফেলেছে। যে অবাঙালী ভদ্রলোকের কাছে পরিবেশক দাঁড়িয়ে ছিল তিনি নির্দেশ দিলেন, উনকো পহিলা দেও।

চাকতে চাকতে অনাথদা মিশ্র ভাষায় সকলেরই উদ্দেশ্যে বললেন, হাম্‌কো মুলুকমে—in our part of the country, at marriage and other feasts, সম্‌ঝে না, vegetarians and non-vegetariansকে লিয়ে আলাদা বন্দোবস্ত হোতা, though in the same hall…হাম্‌কো চীজ-কারী বহুত পছন্দ হ্যায়, উসি কো লিয়ে হাম চাজ কারী খাওয়া লেতা while, of course, sitting with the non-vegetarians.

—Why? Is it not served to you?—একজন অবাঙালী পর্যটক আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

—No,—অনাথদা কারণও ব্যক্ত করলেন, it is meant for the vegetarians alone.

—I see, বলে ভদ্রলোক একটু থেমে আর-একটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন: আপ্ পাহ্‌লা উধার বৈঠকে আউর উধার মে চীজ-কারী চাকনেকো বাদ ইধার কেঁও নেই আতে?

প্রশ্নে আর সকলে হেসে উঠলেও অনাথদা সত্যি কথাই বললেন, ইধার কোই সীট খালি নেই রতা,—তারপর একটু ভেবে যোগ করলেন, That doesn't look nice either.

—Of course! আর-এক দফা সমবেত হাসির মধ্যে সেই অবাঙালী ভদ্রলোক সমর্থন জানালেন।

মুঘল গার্ডেনস-এ বেড়াতে গেছি। শালিমার বাগানেই বোধহয় কয়েকটা কাশ্মীরী ছেলেমেয়ে তাদের সংগৃহীত সামান্য ফল বেচতে এল—চেরী আর স্ট্রবেরী। অনাথদা ভাগিয়েই দিচ্ছিলেন। আমরা দু-জনে অনাথদার কথা না শুনে কিছু চেরী কিনলাম। বাচ্চাগুলো চলে গেল। অনাথদা অনুযোগ করলেন, যখন কিনলেই তখন ঐ লিচুর মত ফলগুলো কিনলেই পারতে। আধপাকা জামের মত ঐ চেরী না কি ফল অত দাম দিয়ে কেনে নাকি?

অনাথদা নিজে থেকে চান নি, আমরাই দিয়েছিলাম গোটাকয়েক। সেগুলো শেষ করে উক্তি করলেন, আরও কিছুটা কিনলে হত।

বাগান থেকে বেরিয়ে আসার সময় আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে তাদের সংগৃহীত ফল বেচতে এল। এবার অনাথদা নিজেই কিনলেন—চেরী আর স্ট্রবেরী দুইই।

একটা স্ট্রবেরীতে কামড় দিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে মন্তব্য করলেন, এও আবার কেউ পয়সা দিয়ে কিনে খায় !

বন্ধু প্রতিবাদ করলেন,—কেন ? খেতে ত ভাল।

—নিশ্চয়ই ! ভূস্বর্গের অমৃত ফল ! তা তোমরাই খাও।

অনাথদা স্ট্রবেরীগুলো আমাদের হাতে দিয়ে নিজে চেরীগুলো শেষ করলেন।

প্রথম দিন মধ্যাহ্নভোজে সর্দারজী কোন ফলের ব্যবস্থা করেন নি, প্রতিশ্রুতি-মত মিঠাইই দিয়েছিলেন—একটি করে কালাকাঁদ। আজ টেবিলে একটা ডিশে কতকগুলো ফল দেখে অনাথদা বললেন, আজ দেখছি ফলও দিয়েছে। কিন্তু কি ফল ? ন্যাসপাতির মত দেখতে।

নামটা জানতাম। বললাম, খোবানি।

নামটা অবশ্য অনাথদার মনঃপূত হল বলে মনে হল না, কিন্তু তিনি চুপ করেই রইলেন।

টেবিল ছাড়বার সময় অনাথদা গোটাচারেক খোবানি হাতে তুলে নিলেন। ঘরে এসে বললেন, সাহেবরা ডিনার টেবিলে ফ্রুট খায় না, বুঝলে ? হাতে করে বাইরে নিয়ে এসে পরে খায়।

বন্ধু প্রশ্ন করলেন, তারা কি চার-পাঁচটা করে নিয়ে আসে অনাথদা ?—যেন শুনতেই পান নি এমন ভাব দেখিয়ে অন্য দিকে ফিরে অনাথদা একটা খোবানিতে কামড় দিলেন।

এবারও সেই আগের মত অবস্থা—তবে থু থু করে মাটিতে উচ্ছিষ্ট না ফেলে ছ্যা ছ্যা বলে দু-বার শব্দ করে খোবানিটা শেষ করে বললেন, আর না—অমৃত ফল খেয়ে আর কাজ নেই। ওঃ আমের রাজ্য ছেড়ে।...

বললাম, কাশ্মীরে ফলের সীজন হল আগস্ট-সেপ্টেম্বর, সেই বিখ্যাত কাশ্মীরী আপেল ··

শেষ করার আগেই অনাথদা কৈফিয়ৎ তলব করলেন, তবে এখন নিয়ে এলে কেন বাবা ? সেই পুজোর সময় এলেই হত।

বন্ধু বললেন, এখন ফুলের সীজন।

—ফুলের সীজন !—অনাথদা খিঁচিয়ে উঠলেন, ফুল দেখতে এতদূর আসার কোন মানে হয় ?

পরের দিন পহেলগাম যাচ্ছি আচ্ছাবলের পথ ঘুরে। আচ্ছাবলে একটি কাশ্মীরী ছেলে কয়েকটা আখরোট এবং একটা ফুলের তোড়া নিয়ে বেচতে এল, আর এল অনাথদার কাছেই।

একবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করে অনাথদা বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্নই করলেন, আবার ফুল কেন ?

বললাম, গরীব মানুষ, কিছু পয়সা চায়। শুধু চাইলে ত আর দেবেন না।...

—তাই বলে পয়সা দিয়ে ফুল কিনতে হবে ! আমরা সাহেব নাকি ?

—সাহেবরা ছাড়া অন্যেও ডিনার টেবিল থেকে ফল নিয়ে আসে, বন্ধু টিপ্পনী কাটলেন।

এবারও যেন শুনতে পান নি এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি দূরে চিনার গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পহেলগামে পৌছে এদিক ওদিক তাকিয়ে অনাথদা উক্তি করলেন, কোথায় এলাম রে বাবা, এযে দেখছি মরুভূমি !

—মরুভূমি ! তার মানে ?—জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম।

—মানে,—অনাথদা ব্যক্ত করতে দেরী করলেন না, খাবারদাবার কিছু পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ঐ নদী আর পাহাড় দেখে ত পেট ভরবে না !

বন্ধু স্মরণ করিয়ে দিলেন, কাশ্মীরী খালসা হোটেলেরই ত ব্রাঞ্চ এই পহেলগাম হোটেল। সর্দারজী ত আশ্বাস দিয়েছেন যে সবই পাওয়া যাবে।

—সেই ভরসাতেই ত এসেছি,—অনাথদা স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না, নইলে কোন্ শালা আসত !

চন্দনবারি যাবার সব ঠিক হয়ে গেছে, কালই সকালে যাত্রা, এমন সময় অনাথদা বেঁকে বসলেন,—আমার যাওয়া হবে না। তোমরা যাও।

—কেন অনাথদা ?—অবাক হয়ে দু-জনেই একসংগে প্রশ্ন করি।

খাবারের বেলায় চক্ষুলজ্জার বালাই অনাথদার কোনকালেই নেই। সোজা উত্তর দিলেন, প্যাকেট-লাঞ্চে আমার পোষাবে না। আর ওখানে দেখবারই বা কি আছে ?

—প্যাকেট-লাঞ্চ কেন ?—আশ্বাস দিই, চন্দনবারিতে এক সর্দারজীর একটা চমৎকার টেণ্ট-হোটেল আছে শুনেছি। সেখানে সবকিছুই পাওয়া যায়।

—পাওয়া যায়, বলছ ?—তার পরই একটা সমস্যার কথা তাঁর মনে পড়ে: তবে এখানকার লাঞ্চের কি হবে ? চার্জ থেকে ত বাদ দেবে না।

—সেইজন্যেই ত লাঞ্চ-প্যাকেট সংগে নিয়ে যাব, বন্ধু ব্যাপারটা পরিষ্কার করেন।

—তবে যাওয়াই যাক, কি বল ?—অনাথদা যেন আমার দিকে চেয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

অনাথদা গুলমার্গ-খিলেনমার্গ যান নি, সোনেমার্গও বাদ দিয়েছিলেন। কারণ বোধহয় শুনেছিলেন, খিলেনমার্গ ও সোনেমার্গে শুধু টেণ্ট-হোটেলই আছে—যে টেণ্ট-হোটেল সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা বাস্তবের সংগে মেলে নি।

গুলমার্গ যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিলেন, গুলমার্গে আবার দেখার কি আছে ? শ্রীনগর দেখলাম, ঐ পহেলগামও দেখলাম, বাস! লোককে ত বলা যাবে কাশ্মীর—ভূস্বর্গ (!) দেখে এলাম।

প্রশ্ন করেছিলাম, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে গুলমার্গ-খিলেনমার্গ যান নি ?

—বলব, নিশ্চয়ই গেছলাম।

বন্ধু জেরা করেছিলেন, যদি জিজ্ঞাসা করে, কি দেখলেন ?

—সে তোমাদের কাছে শুনে নেব,—অনাথদা অকপটে স্বীকার করলেন।

ফিরছি অমৃতসর হয়ে। তখন হিল-কন্‌সেসন অথবা পাঠানকোট এক্সপ্রেস কোনটাই চালু হয় নি। সন্ধ্যাবেলায় বারাণসী থেকে অমৃতসর মেল ছাড়ার পর অনাথদার দীর্ঘনিশ্বাস কানে এল। মুখ তুলে চাইতে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন, কাশীতে আর নামা হল না !

স্বাভাবিক প্রতিবাদই করলাম, এই গরমে ?

—গরমকালেই ত ভাল, সবই সস্তা—অনাথদা প্রত্যুত্তর দিলেন, তারপর ক্ষুব্ধ মন্তব্য করলেন, বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় মাছ মাংস দুধ মিষ্টি সবই অঢেল। এমন সোনার জায়গা ছেড়ে লোকে কাশ্মীর যায় কেন তাই ভাবি !
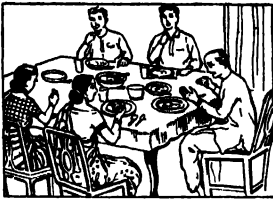
ভোজনবিলাস

ভুবনবাবুকে দেখে খুশিই হলাম। তিনি যে নৈনীতাল আসবেন তা ঠিক্ জানতাম না। তবে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবার পূজোয় কোথায় যাচ্ছ ?

উত্তর দিয়েছিলাম, ভাবছি নৈনীতালের দিকে।

—দলে, না সপরিবারে ?

—না এবার সপরিবারে। তবে,—ভেঙেই বলেছিলাম, দুটি পরিবার—আমার আর সুশীল সেনের।

—কবে যাচ্ছ, পূজোর আগে না পরে ?

—পূজোর আগেই. বোধহয় মহালয়ার পরেই।

আর কিছু কথা হয় নি।

ভুবনবাবু আমাদের পাড়ার লোক। ভদ্রলোক আলিপুর দেওয়ানী কোর্টের প্রবীণ উকীল। ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাব। পূজোর ছুটিতে আদালত বন্ধ হলেই বেরিয়ে পড়েন। তবে কখনও সপরিবারে নয়। হয় বন্ধুবান্ধবের সংগে, না-হয় একাই। এই বেড়ানোর সূত্রেই তাঁর সংগে আলাপ।

পূজোর ছুটির মাসখানেক আগে থেকেই তিনি টাইমটেব্‌ল্ দেখা শুরু করেন, ভ্রমণে অভ্যস্ত পরিচিত অর্ধ-পরিচিত সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করেন : কি, এবার কোথায় যাবেন, অথবা কোথায় যাওয়ার কথা ভাবছ ? একা না সস্ত্রীক ? সংগে কাউকে পেলে ?—ইত্যাদি।

ভুবনবাবুকে এতদিন ভ্রমণরসিক বলেই জানতাম, কিন্তু তিনি যে ভোজন-বিলাসীও বটে তা মোটেই জানা ছিল না। সে জ্ঞানলাভ হল নৈনীতালে।

ঠিক নৈনীতালে নয়, ভীমতালে ভুবনবাবুর সংগে দেখা।

—কি ভুবনবাবু, কবে এলেন ?—দেখা হওয়ার পর একটু উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করে ফেলেছিলাম।

—কাল এসেছি, আর এসেই তোমাদের খোঁজ করেছি। তা উঠেছ কোথায় ?

হোটেলের নাম বলাতে ভুবনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তা খাওয়াদাওয়া কেমন, চার্জই বা কত ?

উত্তর দিলাম, খাওয়াদাওয়া মন্দ নয়—বাঙালীর টেস্টের সংগে মেলে, আর চার্জও কম—পার হেড···।

চার্জ শুনে ভুবনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের হোটেলে জায়গা আছে ? তবে হ্যাঁ, সিংগেল সীটেড্ রুম চাই, বুঝলে।

পরদিনই ভুবনবাবু আমাদের হোটেলে একটা সিংগল্-বেড রুম দখল করলেন, এবং আমাদের ঘর-দুটোর পাশেই।

ছোট হোটেল, ডাইনিং রুমের বালাই নেই—যার যার নিজের ঘরে খাওয়া। আমরা দুই পরিবার একই সংগে খেতাম। একদিন পরে ভুবনবাবুকে বললাম, আমাদের ঘরেই আসুন না, একসংগে খাওয়া যাবে।

ভুবনবাবু এককথায় রাজী হলেন।

খাওয়ার ব্যাপারে দেখলাম ভুবনবাবু বেশ খুঁতখুঁতে, আবার রসিকও বটে। এটা ভাল হয় নি, পাহাড়ে এটা খাওয়া উচিত নয়, মনে হচ্ছে পাউডার এগ্ থেকে অমলেট করে পরে কারী বানিয়েছে, মাংসটা যেন কি রকম—হাড়গুলো মোটামোটা, মা ভগবতী নয় ত !—ইত্যাদি মন্তব্য তাঁর ওষ্ঠাগত। অন্য দিকে আবার যেটা তাঁর ভাল লাগে তার তারিফ করতেও কুণ্ঠা নেই : বাঃ স্যালাড্‌টা বানিয়েছে ভাল, আজকে মাংসটা গ্রাণ্ড লাগছে, ইত্যাদি।

সব মিলিয়ে খাবার টেবিলে ভুবনবাবুকে আমার মন্দ লাগত না, তবে যখন তিনি রন্ধনবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করতেন তখন মহিলা দু জন একটু বিরক্ত হতেন লক্ষ্য করেছিলাম।

সন্ধ্যা ৭টার পরই ভুবনবাবু আমাদের ঘরে এসে বসতেন। খাবার সময় ছিল আটটা সাড়ে আটটা।

সেদিন আটটা বেজে গেলেও ভুবনবাবু যখন এলেন না তখন তাঁর ঘরে ডাকতে গেলাম। খাবার অবশ্য তখনও আসে নি, তবে পাশের ঘর থেকে বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রী অনেকক্ষণ এসে গেছেন।

সাড়া পেয়েই ভুবনবাবু বেরিয়ে এলেন। দেখলাম তিনি তখনও তৈরি নন।

—কি ব্যাপার ভুবনবাবু, খেতে যাবেন না ?—আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করি।

—না, আজ আর খেতে যাব না, শরীরটা ভাল নয়।—ভুবনবাবু একটু দুঃখের সংগেই জানান।

—শরীর খারাপ ? জ্বরটর নয় ত ?—উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না।

—না, জ্বরটর নয়,—ভুবনবাবু আশ্বস্ত করেন, তবে পেটটা ঠিক ভাল নয়।

—তাহলে কিছুই খাবেন না ?

—কিছু খেতে হবে বৈকি !—একটু থেমে ভুবনবাবু আবার বলেন, আমি খানকয়েক পরটা আর সামান্য একটু ডিমের কারী করতে বলে দিয়েছি। তা সে ঘরে বসেই খেয়ে নেব—তোমাদের আর জ্বালাতে যাব না।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করি নি বা বলি নি, নিজের ঘরেই ফিরে এসেছিলাম। ঘরে ঢোকার সংগে সংগে বন্ধুপত্নী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি ব্যাপার ? মুখব্যাদান করে কেন ?

বাঙালীটোলার দ্রৌপদী

ওরাই যায়গাটার নাম দিয়েছিল বাঙালীটোলা, আর আমাদেরই কেউ মেয়েটির (বা বধূটির) নামকরণ করেছিল দ্রৌপদী। বোধহয় তা ওদের কানে যায় নি। গেলে, আমাদের প্রতি উপেক্ষার চেয়ে বিরূপ ভাবই লক্ষ্য করতাম।

সেবার রাণীক্ষেতে লোয়ার মেন রোডে মিসেস্ ক্লার্কের রাস্টিক কাফে পেরিয়ে একটা কটেজ নিয়েছিলাম। কাছাকাছি আরও কয়েকটা কটেজ ছিল। মহালয়ার পরদিনই যখন পৌছোই তখন কটেজগুলো খালিই ছিল। পূজোর মধ্যেই সব ভরে গেল। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মত সব ভাড়াটেই ছিলেন বাঙালী।

আমাদের কটেজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে পূর্বদিকের প্রান্তিক কটেজটিতে এলেন পঞ্চপুত্রসহ এক কন্যা। সীমন্তে সূক্ষ্ম পরিণয়-প্রতীক-সমন্বিত কন্যাটি যে ঐ পাঁচজনের কারও বধূ তা বোঝা গেলেও, ঠিক যে কার তা নির্ধারণ করা যায় নি। চার জন তাকে বৌদি বলে ডাকতেন। একজন নিশ্চয় ডাকতেন না। কিন্তু তিনি কোন্ জন ?—তাই ছিল আমাদের গবেষণার বিষয়।

গবেষণায় অকৃতকার্য হয়েই শেষ পর্যন্ত একজন কন্যাটির নামকরণ করেছিলেন দ্রৌপদী। শুনে আর একজন বলেছিলেন, ঐ পাঁচ-জন হল পঞ্চপাণ্ডব।

দ্রৌপদীরা প্রথম যখন আসেন তখন বিকালবেলা। একটা ট্যাক্সিতেই এসেছিলেন ওঁরা ছ-জন আর ড্রাইভার—মোট সাত জন। ড্রাইভারসহ ছ-জনের অধিক যাত্রী বহন করা বেআইনী, তবে ওঁরা ম্যানেজ করেছিলেন নিশ্চয় !

প্রথম দর্শনে ঠিক ঐ জায়গাটি ওঁদের ভাল লাগে নি। আমরা তখন এর ওর কটেজ থেকে বেড়াতে বেরোবার উদ্যোগ করছি। মনে আছে, এক চকিত

চারধার দেখে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের একজন নিম্নস্বরে মন্তব্য করেছিলেন, এ কোথায় এলাম রে বাবা! এযে দেখছি বাঙালীটোলা।

সেই দিন থেকেই বাঙালীটোলা নামটি পরিচিতি লাভ করল, যদিও দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডব নামকরণ হয়েছিল দু-দিন পরে।

বাঙালীটোলায় দ্রৌপদীরা কারও সংগে মিশলেন না, এমনকি আলাপ পর্যন্ত করলেন না। কয়েকজন মহিলা এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। রাস্তায় ও বাজারে অনেকের সংগে দেখাও হয়েছিল, কিন্তু তাও ফলপ্রসূ হয় নি—পরিচয়জ্ঞাপক মৃদু হাসির কোন প্রত্যুত্তরই দ্রৌপদীরা দেন নি। ফলে সকলেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাঙালীটোলায় বাস করেও যে দ্রৌপদীরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন তাতেই রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

দ্রৌপদীরা সকাল ৮টা নাগাদ ছ-জনেই দল বেঁধে বাজার যেতেন, ফিরতেন ঘণ্টা দুয়েক পরে। তারপর অনুমান করা যায়, রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া হত। বিকেল তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ আবার তাঁরা দলবেঁধে বেরুতেন, আর ফিরতেন বেশ রাত হলে। রাতে ফেরার সময় একজনের হাতে থাকত একটা টিফিন কেরিয়ার, নিশ্চয়ই বাজার থেকে কিছু ভোজ্য সওদা করে আনতেন। রাত্রে বোধহয় বেশী কিছু রান্না করা হত না।

বাঙালীটোলার মধ্যে কেউ কেউ নাকি লক্ষ্য করেছিলেন যে রাতে ফেরার সময় দ্রৌপদীরা অনেক দিন ছাড়াছাড়ি ভাবে ফিরতেন। এক একদিন নাকি কোন পাণ্ডবের সংগে দ্রৌপদী ফিরতেন সবার পরে।

এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়ত ঐ পাণ্ডুপুত্রই দ্রৌপদীর স্বামী, —দেবররা তাঁদের একটু একান্তে বিচরণের সুযোগ দিয়েছে মাত্র।

এই অনুমানের বিরুদ্ধে বাঙালীটোলার বয়স্ক অধিবাসী তুলসীবাবু বলেছিলেন, না মশাই, আমি দেখেছি আলাদা আলাদা ছোকরার সংগে ফিরতে —ব্যাপার ঠিক সিধে নয়!

দ্রৌপদীকে রান্নাবান্না করা ছাড়াও বোধহয় থালাবাসনও মাজতে হত, কারণ

কোন পার্ট-টাইম ভৃত্যও দ্রৌপদীরা রাখেন নি। তবে মনে হয় পাণ্ডবদের কেউ কেউ দ্রৌপদীকে সাহায্য করতেন। কারণ, মাঝে মাঝে ঐ কটেজ থেকে পুরুষ-কণ্ঠ ভেসে আসত: ভাতটা বোধহয় নামাতে হবে, অথবা বৌদি কোথায় গেল? মাংসটা একবার দেখতে হবে।

এ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। একজন মন্তব্য করেছিলেন, মেয়েটি ভাল, সব কাজই নিজের হাতে করে। আজকালকার দিনে এরকম বড় একটা দেখা যায় না।

প্রতিবাদে তুলসীবাবু বলেছিলেন, ব্যাপারটায় মিস্ট্রি আছে মশাই! আজকালকার মেয়েরা হাঁড়ি ঠেললেও বাসন মাজতে চায় না।

মনে আছে সেদিন ছিল সপ্তমীর দিন। মনটা কেমন যেন মুষড়ে ছিল। ভাবছিলাম, ঠিক পূজোর সময় ছেলেমেয়েকে বাংলা দেশ থেকে ঠেলে এই পাহাড়জংগলে না আনলেই হত। সকালেই আমার কন্যা জিজ্ঞাসা করেছিল, এখানে পূজো হয় না বাবা? এই কথাটাই বারবার মনে পড়ছিল।

অন্য দিন বেড়িয়ে এসে এই সময় ঘরে বসে ওদের সংগে গল্পগুজব করতাম বা বইটই পড়তাম। আজ তা ভাল না লাগায় বাইরে পায়চারি করছিলাম।

এমন সময় দেখি দ্রৌপদী বেরুচ্ছেন এক পাণ্ডবের সংগে—কোন দেবর, না স্বয়ং স্বামী জানি না।

বোধহয় দ্রৌপদীরা প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করেন নি। একটু এগিয়েই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন দেখলাম। তারপর সেই পাণ্ডুতনয়ের কণ্ঠ শোনা গেল: সমীর, আমি বউদিকে নিয়ে একবার বাজারের দিকে যাচ্ছি। কেরোসিন তেল একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

মনে হল ঘোষণায় কৈফিয়তের সুর সুস্পষ্ট। কিন্তু কৈফিয়ৎ কার কাছে —সমীর নামে পাণ্ডুতনয়ের কাছে, না আমার কাছে? ঐ সমীর নামক পাণ্ডুপুত্রকেই দ্রৌপদীর স্বামী বলে ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু তবুও একটা বিষয়ে খটকা গেল না: কেরোসিন তেল ফুরোলে কোন পাণ্ডবভ্রাতার পরিবর্তে দ্রৌপদীকে নিয়ে বাজারে যাবারই বা প্রয়োজন কি?

দ্রৌপদীরা আমার পাশ দিয়েই সপ্তমীর আধা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। রাচীক্ষেতের ঐ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলো নেই—অন্তত তখন ছিল না।

পরদিন সকালেই দ্রৌপদীর দল বেরিয়ে গেলেন। সাজসজ্জা দেখে বোঝা গেল বাজারে নয়, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন।

প্রত্যেক দিনের মত বাজার সেরে তুলসীবাবু আমাদের কটেজে এলেন। এই সময় দু-জনে বসে দ্বিতীয় দফা চা পান করতে করতে গল্পগুজব করি।

চায়ে চুমুক দিয়ে তুলসীবাবু বললেন, দ্রৌপদীরা দেখলাম কৌশানীর বাসে উঠল। আচ্ছা মশাই, লক্ষ্য করেছেন, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একজনের পোশাক-আশাক কি রকম খেলো? অথচ ঐ ছোকরাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। ব্যাপারটায় মিস্ট্রি আছে মশাই!

হ্যাঁ, খানিকটা লক্ষ্য করেছিলাম। শুধু পোশাকে নয় ছেলেটি যেন সবদিক দিয়েই দলের সংগে বেমানান। ওরা যখন বেরুত বা ফিরত তখন দ্রৌপদী থাকতেন মাঝখানে, আর ছেলেটি সব সময়ই থাকত একটু পেছনে। রাস্তায় একদিন নজরে পড়েছিল ওরা সবাই কোন রসিকতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঐ ছেলেটি যেন তাতে যোগ দিতে পারছে না।

তুলসীবাবু আবার মন্তব্য করলেন, আমার কি মনে হয় জানেন—ছেলেটি গরীব, বেড়াবার লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। হয়ত ওকে দিয়েই বাসনটাসন মাজায়।

দশমীর দিন বাঙালীটোলায় বিজয়া সেরে দূলীক্ষেতের ওধারে রাই এস্টেটে প্রতিশ্রুতিমত গিয়েছিলাম একজন পরিচিত ভদ্রলোককে শুভেচ্ছা জানাতে। ওঁরা ওই ধারে কটেজ নিয়ে বাস করছিলেন।

যাতায়াতে চার মাইলের মত পথ, ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। বাঙালীটোলার কাছাকাছি এসে পাহাড়ী রাস্তার এক বাঁকে অশ্রুরুদ্ধ নারীকণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। পাথরের আড়াল থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তবুও বুঝলাম দ্রৌপদী। হয়ত সোজা চলে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু পারি নি —দাঁড়িয়েই গেলাম।

শুনলাম দ্রৌপদী কাকে বলছেন, তুমি এত কাপুরুষ!

অতি মৃদুস্বরে জবাব এল, কোন উপায় নেই। চাকরি গেলে দাঁড়াব কোথায়?

—তাই বলে নিজের স্ত্রীকে ?—দ্রৌপদী আর বলতে পারলেন না।

এর পর পুরুষটির কাছ থেকে খানিকটা আশ্বাস,—অত অধৈর্য হয়ো না, দেখি কি করা যায়।

—কখন আর দেখবে ?—দ্রৌপদীর অশ্রু বাঁধ মানল না। অশ্রু অবশ্য নীরব নয়, সরবই ছিল, কিন্তু ঐ অবস্থাতে তাঁর অধিকাংশ কথা দূর থেকে বুঝতে পারি নি।

এ পালা যে সহজে শেষ হবে না তা ধরে নিয়েছিলাম। সুতরাং আমার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কতক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ পেছন থেকে অতি মৃদুস্বরে শুনতে পেলাম, চলুন যাওয়া যাক।

ফিরে দেখি তুলসীবাবু। তাঁকে ফিসফিস করে কথা বলতে আগে কখনও শুনি নি বলে গলার স্বর বুঝতে পারি নি। আর পায়ের শব্দও যে পাই নি তার কারণ তিনি সর্বদাই কেডস্ ব্যবহার করতেন।

যেন আমরা সোজাই আসছি এইভাবে দ্রৌপদীদের পেরিয়ে এলাম। নীরবেই আসছিলাম। বাঙালীটোলার কাছে এসে তুলসীবাবু বললেন, ওঃ বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বাজার থেকে আরও একটা জিনিস আনবার বরাত ছিল। যাই, আবার যাই।

—আবার যাবেন এতটা রাস্তা এই অন্ধকারে—কাল সকালে গেলে হয় না ? —আমি না বলে পারলাম না।

—টর্চ সংগে আছে,—শুধু এইটুকুই বলে তুলসীবাবু ফিরে গিয়েছিলেন।

পরের দিন সকাল ১০টা নাগাদ নিয়মিত দ্বিতীয় দফা চা পান করতে তুলসীবাবু আমাদের কটেজে এলেন না। চিন্তা হল ভদ্রলোকের অসুখবিসুখ করেনি ত। ভাবলাম, ওঁদের কটেজে গিয়ে একবার খোঁজ নিই।

সবে বেরিয়েছি, দেখলাম দ্রৌপদীর দল ফিরছেন, কিন্তু দ্রৌপদী নেই—আর পাণ্ডবদের সংখ্যাও পাঁচ নয়, চার। তুলসীবাবু দ্বারা 'বেমানান' বলে বর্ণিত ছেলেটি দলে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়। ওঁদের মধ্যে সেই উচ্ছলতার বিন্দুমাত্র নেই, কোথায় যেন কি হয়ে গেছে। কিন্তু কি হয়ে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে

কোন কিছু কল্পনাও করতে পারলাম না। দ্রৌপদী কিংবা দলে অনুপস্থিত পাণ্ডবের অসুখবিসুখ করেছে নাকি? এঁরা কি ডাক্তারের সন্ধানে গিয়েছিলেন? চার জনে কি একসংগে ডাক্তার ডাকতে যায়? গত রাতের ঘটনাও মনে পড়ল।

তুলসীবাবুর ওখানে গিয়ে খোঁজ না নিয়েই আবার নিজের ডেরায় ফিরে এলাম।

তুলসীবাবু নিজেই এলেন। মধ্যাহ্নভোজনের অনেক পরে সামনের ঘরে বেতের চেয়ারে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় একখানা পূজাসংখ্যা নিয়ে পাতা ওল্‌টাচ্ছিলাম, এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তুলসীবাবু হাঁক দিলেন, আছেন নাকি?

—আসুন, আসুন।—উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ অসময়ে যে? আর সকালেই বা সাক্ষাৎ পাই নি কেন?

কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুলসীবাবু পাশের চেয়ারে ধীরে সুস্থে বসে বললেন, এক গেলাস জল খাওয়ান ত মশাই। উঃ অবেলায় খেয়ে কেবল তেষ্টা পাচ্ছে।

জলপান করে তুলসীবাবু শোবার ঘরে ঢোকার দরজাটা বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিলেন। কৈফিয়ৎস্বরূপ বললেন, বাচ্চাদের কানে না যাওয়াই ভাল।

নির্দেশ পালিত হলে এদিক ওদিক চেয়ে ঘোষণা করলেন, দ্রৌপদী তার বরকে নিয়ে সরে পড়েছে।

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিই তুলে দিয়ে এলাম। তারপর ফিরে এসে খেতে প্রায় দুটো বেজে গেল···ওঃ এত অবেলায় খাওয়া!······

ঘনান্ধকারে একটিমাত্র আলোর রশ্মি, দয়া করে আবরণ উন্মোচন করুন—এই রকম আবেদনের ভাব নিয়ে তুলসীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

—দিন, আপনার একটা সিগারেট দিন, আজ একটা খাওয়া যাক,—তুলসী-বাবু সিগারেট নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তুলসীবাবুকে কখনও ধূমপান করতে দেখি নি, কিন্তু সে কথা তখন মনেই এল না। যন্ত্রচালিতের মত একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম, দেশলাই দিতেও খেয়াল ছিল না।

—কই দেশলাই দিলেন না ?

লজ্জিত হয়ে দেশলাইটা এগিয়ে দিলাম।

—কই আপনি ধরালেন না ? একযাত্রায় পৃথক ফল !

এবার তুলসীবাবুকে ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালাম। ভদ্রলোকের ঠিক অভ্যাস নেই, প্রথম ধোঁয়া লাগতেই দু-একবার কেশে উঠলেন, তারপর সামলে নিয়ে শুরু করলেন :

কাল মশাই আপনাকে যে বললাম বাজারে একটা জিনিসের বরাত আছে, একদম বাজে কথা। বরাত অবিশ্যি ছিল, আর তা নিয়েই ফিরছিলাম। নাতিটা রাবড়ি নইলে রাত্রে রুটি খেতে চায় না। রাবড়ি নিয়েই ফিরছি, দেখি আপনি আড়ালে দাঁড়িয়ে। প্রথমে লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছলাম। কি ব্যাপার ! আপনি দাঁড়িয়ে কেন ? পা টিপে টিপে কাছে এসে ব্যাপারটা বুঝলাম। সংগে সংগে এতদিনের মিস্ট্রি একেবারে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

আপনার সংগে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এসে আর ঢুকতে পারলাম না, আবার ফিরে গেলাম। একবার মনে হল রাবড়িটা দিয়ে আসি, নাতিটা খেতে পাবে না। আবার ভাবলাম একবার ঢুকলে জবাবদিহি না করে আবার বেরোনো শক্ত। বরং বলব, আজ দশমীর দিন রাবড়ি করতে দেরী করেছিল।

—ফিরে গিয়ে দেখি দ্রৌপদী আর সেই সুন্দর ছোকরাটা তখনও দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে সরে যাবার উপক্রম করল। আমি বললাম, দাঁড়াও মা, যেও না। তোমাদের কি ব্যাপার আমায় বল। আমি বুড়ো মানুষ, কথা দিচ্ছি, সাধ্যের অতীত না হলে আমি তোমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করব।

ছেলেটা কোন কথা বলল না, মেয়েটা কিন্তু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর মশাই আস্তে আস্তে সবই শুনলাম।...ঐ যে কালো ভুসকো হনুমান-মার্কা ছোঁড়াটা, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যার সাজপোশাকের সবচেয়ে বেশী বাহার, ওদেরই অফিসে সুন্দর ছেলেটি বেয়ারার কাজ করে। মাইনে পায় শ-দেড়েক টাকা। তবে ছেলেটি লেখাপড়া জানে—আই.এ. পাস। আর মেয়েটি ঐ অফিসেরই টেলিফোন অপারেটার। দু-জনে ভাব-ভালবাসা হয়ে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে মাত্র মাস-দুয়েক আগে।

মেয়েটির ওপর ঐ হনুমান-মার্কা ছোঁড়াটার অনেক দিন ধরেই তাক ছিল ! হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়াতে মুষড়ে পড়েছিল, বুঝলেন। তারপর এক

মতলব ঠাওরালে। ছেলেটিকে খাস বেয়ারা বানিয়ে খুব দরদ দেখাতে শুরু করলে। তারপর পুজোর ক-দিন আগে বললে, সমীর, এবার আমি রাণীক্ষেতে যাচ্ছি। তুমি সংগে যেতে পারবে ?

সমীর আমতা আমতা করায় বললে, তোমার বৌকেও না-হয় নিয়ে চল না —সেই না-হয় আমাদের রান্নাবান্না করে দেবে, ঠাকুরচাকর না-হয় সংগে নেব না। তোমাকেও নতুন বৌ ছেড়ে থাকতে হবে না।

ছোকরা বা মেয়েটি অতশত বোঝে নি। অফিস-বস্ রাণীক্ষেতে যেতে বলছেন, না গেলে চাকরি না যাক, পরে অসুবিধা হতে পারে। আর গরীবের মেয়ে বিদেশে গিয়ে যদি অপরের জন্য ক-দিন রান্নাবান্না করে, তাতেই বা ক্ষতি কি ? কেউ ত আর জানবে না ! তবে সাহেবের সংগে কে কে যাবে, তা জিজ্ঞাসা করে নি—বোধহয় সাহসে কুলোয় নি।

হাওড়ায় এসে দেখে সাহেবের সংগে আর তিন জন বন্ধু—বাড়ীর কোন লোক নেই। দেখে ওরা দু-জনে একটু ঘাবড়ে গেছল। তারপর, বুঝলেন না, জীবনে যা পায় নি—ফার্স্ট ক্লাসে চড়া, লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট খাওয়া—কেমন যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল।

ট্রেনেই ঐ সাহেব ছোঁড়া বলেছিল, আরতি ! বাইরে তোমাকে সবাই আমরা 'আপনি' আর 'বৌদি' বলে ডাকব, মনে থাকে যেন।

মেয়েটি শুধু বলেছিল, আবার 'আপনি' কেন ?

—বাইরে একটা 'শো' বজায় রাখা দরকার। বুঝলে না !—ঐ জাম্বুমান উত্তর দিয়েছিল।

রাণীক্ষেতে ওদের ঐ সাহেব আগেও এসেছে, এই ধরনের কোন কটেজে থেকেও থাকবে। তবে পূজোর সময় নিশ্চয় আসে নি। এবার এসেই বাঙালীদের ভিড় দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ে। বাঙালীটোলায় ত আর বেহায়ার মত ফুর্তি করা চলবে না।

মেয়েটি রান্নাবান্না সবই করত, আর—আমি যা ধরেছিলাম—ওর বরই চাকরের কাজ করত। এর মধ্যেই আবার মেয়েটিকে এ-ব্যাটা ও-ব্যাটার সংগে বেড়াতে যেতে হত। সমীর বেচারা তখন হয়ত হাঁড়ি ঠেলছেন !

ওরা সবই বুঝে ফেলেছিল। কিন্তু উপায় কি ? নিজেদের হাতে টাকা-পয়সাও নেই যে কেটে পড়বে, রিটার্ন টিকিটও ওই বদমায়েশটার হাতে। আর

পালিয়ে গেলেও ফিরে গিয়ে হয়ত চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। কুমীরের সংগে বিবাদ করে কি আর জলে বাস করা যায় ?

ওরা দু-জনে পরামর্শ করে ঠিক করলে যে ক'টা দিন সাবধানে কাটিয়ে দেবে।

একদিন আর মেয়েটি পারল না। এখানে নয়, কৌশানীতে গিয়ে বড়লোকের ঐ অপগণ্ডটা সত্যি সত্যিই একদিন,···বুঝলেন না, জোর করতে লাগল···খুব টেনেছিল বোধহয়। মেয়েটি কোনমতে হাতে পায়ে ধরে সেদিন বেঁচে গেল। তারপর ওরা ফিরে এল দশমীর দিন। ট্যাক্সি পায় নি, বাসেই ফিরেছিল। বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে মেয়েটি আর ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে ঐ মর্কট ও তার সাংগোপাংগো সোজা আমাদের এই বাঙালীটোলায় চলে এসেছিল। ওরা দু-জনেও ফিরতে বাধ্য হয়েছিল। এই বিদেশে যাবেই বা কোথায় !

ফেরবার সময় ঐ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি যখন তার স্বামীকে সব কথা বলছিল তখন আপনিও দাঁড়িয়ে পড়ে দু-একটা কথা শুনেছেন।

এই পর্যন্ত একটানা বলার পর তুলসীবাবু থামলেন। ভেবেছিলাম দম নেবার জন্যে, না দেখি চুপ করেই আছেন। আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। বললাম, তা আপনি কি করলেন ? ওরা গেলই বা কি করে ? বলছেন পয়সা নেই, টিকিট নেই।

তুলসীবাবু আর এক গ্লাস জল আনতে নির্দেশ দিলেন। জলপান করার পর যেন খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন, আমি আর কি করব !·· সব শুনে বললাম, কাল ভোরেই তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে ঠিক এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

তারা বুড়োমানুষের কথায় বিশ্বাস করে ঠিক দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে একটি মাত্র ছোট স্যুটকেশ—মালপত্র বলতে ঐ।···

তুলসীবাবু আবার থামলেন, অবশ্য আবার নিজেই শুরু করলেন : সেখান থেকে ওদের নিয়ে গেলাম ট্যুরিস্ট-অফিসে। বেয়ারা ধনসিং আমার চেনা। যখন এই কটেজ নিয়েছিলাম, ট্যুরিস্ট-অফিস থেকে সে এসে সব ব্যবস্থা করেছিল। কিছু বকশিশও দিয়েছিলাম। আমায় খাতির করে, রাস্তায় দেখা হলেই সেলাম ঠোকে।

ধনসিং-এর হাতে আগাম দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে রবিবার দিন ভিজিটার্স রুম খুলিয়ে ওদের বসালাম। বলে দিলাম, আর যেন কেউ না আসে। ধনসিং বললে, এতোয়ারমে কোই নেহি আয়েগা।

বারটায় বাস। বাজার থেকে খাবার কিনে নিয়ে ওদের একটু খাওয়ালাম। ওখানে একটা গোসলখানাও আছে। ওরা বসে রইল। কাঠগুদামের দুখানা টিকিট কেটে এনে ছেলেটির হাতে দিলাম। কাঠগুদাম থেকে ট্রেনভাড়াও দিয়ে দিলাম, কি আর করি!···ওরা বসে রইল, আমি বাজারে ঘুরতে লাগলাম।

নটা নাগাদ দেখি সেই চারটে ছোঁড়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে কি জিজ্ঞাসা করছে। জিজ্ঞাসা করে ফিরে একজন বলল, মনে হচ্ছে ফার্স্ট বাসেই নৈনীতাল গেছে।

—কিন্তু, টাকা কোথায়?—একজন জিজ্ঞাসা করলে।

—সংগে কিছু নিশ্চয়ই ছিল, আর-একজন উত্তর দিলে।

—নৈনীতাল থেকে কি করে ফিরবে?—এবার সেই মর্কটের প্রশ্ন।

—বোধহয় চুড়ি দুল বেচে দেবে।

একজন প্রস্তাব করলে, চল, আমরাও নৈনীতাল যাই।

—কি লাভ?—কুষ্মাণ্ডটা অল্প কথায় সেরে দিলে, তারপর বললে, কালই ফিরে যাব। দেখি রিজার্ভেশান পাওয়া যায় কি না।

ওরা রিজার্ভেশান অফিসের দিকে চলে গেল। আধঘণ্টা পরে দেখি ফিরে আবার বাঙালীটোলার দিকেই হাঁটছে।

তুলসীবাবু থেমে পড়াতে এবার আমিই খোঁচা দিলাম: তারপর?

—তারপর আর কি? বাসে তুলে দিলাম। ছেলেটিকে আমার ঠিকানা দিয়ে বললাম, চাকরি যদি যায়ই, আমার সংগে কলকাতায় দেখা ক'রো। চাকরি হয়ত দিতে পারব না, তবে কাগজের দালালি করে যাতে মাসে '-দুই রোজগার করতে পার তার ব্যবস্থা করে দেব। তবে হ্যাঁ, খাটতে হবে!

—আপনার কি কাগজের ব্যবসা?—জিজ্ঞাসা করলাম।

—আমার আর কোথায়—ছেলেদের। আমি ত রিটায়ার্ড লোক। আর নাতীনাতনী নিয়ে সময় কাটাই।

—আর মিষ্টি সলভ্ করেন !—আমি হেসে বললাম।

—তা যা বলেন, তুলসীবাবুও হাসলেন। নির্মল হাসি। এতক্ষণে তাঁর চরিত্রের কিছুটা যদি প্রচ্ছন্ন থেকে থাকে তা যেন এই হাসিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মনে হল ভদ্রলোককে একটা প্রণাম করি, কিন্তু কোথায় একটা বাধা পেলাম। প্রণামের পরিবর্তে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, আর একটা ধরান তুলসীবাবু। চায়ের সময়ও ত হল। চা করতে বলব ?

—তা বলুন। অবেলায় খাওয়া, চা খেলে তেষ্টাটা কমবে।

তুলসীবাবু দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন।

আলোর নীচেই

ব্যাপারটা যখন আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তখন নিতাইহরিবাবুর নজর এড়াবে কি করে?

নিতাইহরিবাবু রাণীক্ষেতের বাঙালীটোলার তুলসীবাবুর সগোত্রীয়—দুজনেই রহস্যসন্ধানী, কিন্তু এঁদের দু-জনকে যমজ ভাই, এমনকি সহোদর ভাই বলেও কল্পনা করা অসম্ভব। তুলসীবাবুকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু নিতাইহরিবাবু জীবনে কারও অন্তরের প্রণাম পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

প্রথমে নিতাইহরিবাবুকে পুলিসের অবসরপ্রাপ্ত দারোগা বলেই ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু পরে জেনেছিলাম যে আমার অনুমান পুরোপুরি ঠিক নয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত বটে, তবে দারোগা নন—পেশকার। তাও আবার ফৌজদারী আদালতের নয়, দেওয়ানী আদালতের। অবশ্য হাবভাবে দারোগার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও পোশাক ছিল মার্কামারা বড়বাবুর—কলারহীন শার্টের ওপর ধুতি-পরা, তার ওপর গলা-খোলা সোয়েটার, বুক-খোলা কোট এবং পায়ে মোজা ও সু। ঘরে তিনি কি পরতেন জানি না, তবে বাইরে যখনই আসতেন তখনই থাকত ঐ টিপিক্যাল পোশাক। বিকেল বেলা বেড়াতে বেরোবার সময় ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এর ওপর চড়াতেন মংকি-ক্যাপ, আর-একটা গলাবন্ধকে পেঁচিয়ে গলদেশকে যথাসম্ভব সংরক্ষিত করতেন।

সন্ধ্যায় যখন নিতাইহরিবাবু ফিরতেন তখন ঐ হনুমান-টুপির ফাঁক দিয়ে তাঁর নিরত পর্যবেক্ষণরত ছোটছোট চোখ দু-টো এমন দেখাত যে সামনে পড়লে অস্বস্তি বোধ না করে পারা যেত না।

একদিক দিয়ে ভাগ্য নিতাইহরিবাবুর প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করেছিল, নইলে তাঁকে পুলিসের চাকরি না দিয়ে—অন্তত ফৌজদারী আদালতের পেশকার না করে সারা জীবন দেওয়ানী আদালতে জীবন কাটাতে বাধ্য করবে কেন? ঐ রহস্যসন্ধানী মন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সবই সেই কারণে ফলপ্রসূ হয় নি।

আর-একদিক দিয়ে ভাগ্য বোধহয় এই লোকসানটুকু পুষিয়ে দিয়েছিল, কারণ

লোকে বলে, ফৌজদারী আদালতের চেয়ে দেওয়ানী আদালতেই লক্ষ্মীর পদধ্বনি বেশী শোনা যায়।

নিতাইহরিবাবুর মুস্থরী আগমন ঠিক ইচ্ছাকৃত নয়, কতকটা দুর্ঘটনা বলেও অভিহিত করা চলে। এ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তা এই রকম: অবসর-গ্রহণের কিছু দিন পরে তিনি গৃহিণীকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরুবেন ঠিক করলেন। কে একজন পরামর্শ দিয়েছিল, সোজা দেরাদুনের টিকিট কাটুন, হিল-কন্‌সেসন পাবেন—অর্থাৎ দেড়া ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন, ফেরার পথে অযোধ্যা-কাশী-গয়া নামতেও পারবেন। সে আরও পরামর্শ দিয়েছিল, মুস্থরীটাও দেখে আসবেন।

মুস্থরীর নাম নিতাইহরিবাবু শুনেছিলেন, তবে সন্দেহ হল: মুস্থরীও কি কোন তীর্থস্থান? পরামর্শদাতার কাছ থেকেই জানলেন, না, মুস্থরী কোন তীর্থস্থান নয়, একটা নামকরা হিল-স্টেশন।

হিল-স্টেশন জিনিসটা কি রকম সে-সম্বন্ধে নিতাইহরিবাবুর একটা আবছা ধারণা ছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দার্জিলিং-এর মত? সেই ছোট ট্রেনে করে যেতে হয় শুনেছি।

পরামর্শদাতা বোধহয় প্রশ্নের পরবর্তী উক্তিটুকুর প্রতি মনোযোগ দেয় নি। বলেছিল, হ্যাঁ, দার্জিলিং-এরই মত।

দেরাদুনে পৌঁছে নিতাইহরিবাবু ছোট রেলের খোঁজ করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত বাসে ল্যাণ্ডুর বাজার বাসস্ট্যাণ্ডে (যাকে পিক্‌চার প্যালেস বাসস্ট্যাণ্ডও বলা হয়) এসে ওঠেন এবং সেখান থেকে এক হোটেল-গাইডের 'ভাঁওতায়' পড়ে আমাদের এই হোটেলে।

এসেই নিতাইহরিবাবু মহাখাপ্পা। আমার সংগে প্রায় দেখা হওয়াতে আমার কাছ থেকেই কৈফিয়ৎ চাইলেন: কোথায় মশাই হিল-স্টেশন? বাসে আসতে হল। বললেই হত পাহাড়ের ওপর শহর। আর হোটেলের সেই দালালটা যে বললে অনেক বাঙালী আছে—তা বাঙালীই বা কোথায়? আপনাকে ছাড়া ত আর কাউকে দেখছি না।

হিল-স্টেশন সম্বন্ধে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বাঙালীদের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, অনেক বাঙালীই ত আছেন। ঐ ৮নং ঘরে আছেন জনার্দনবাবু, দোতলায় আছেন আরো দু-তিনটি পরিবার। এই পূজোর সময় ত বাঙালীদেরই সীজন।

নিতাইহরিবাবু বিশেষ আশস্ত হয়েছেন বলে মনে হল না। বললেন, কিন্তু বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আসতে আসতে দেখলুম পাঞ্জাবী-টাঞ্জাবীরই ভিড়। আর মশাই, ওদের ছোঁড়াছুঁড়িগুলো যেভাবে বেহায়ার মত জড়াজড়ি করে রাস্তায় চলে তা দেখলে লজ্জায় মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে।

এই সময়ই আমাদের সামনে দিয়ে একটি যুগল ঠিক ঐ ভাবেই হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু নিতাইহরিবাবু লজ্জায় মুখ না লুকিয়ে হাঁ করে তাদের নিষ্ক্রমণের দিকে তাকিয়েই রইলেন—আমি যে পাশে দাঁড়িয়ে আছি তা খেয়ালই নেই।

সেদিন বিকেল থেকে নিতাইহরিবাবু বাঙালী বোর্ডারদের ঘরে ঘরে গিয়ে আলাপ করা শুরু করে দিলেন। তবে কোথাও বিশেষ পাত্তা পেলেন বলে মনে হল না। তাই আমাকেই আশ্রয় করে রইলেন। সন্ধ্যের পর আমাদের স্যুইটে খানিকক্ষণ কাটানো তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দুখানা ঘর নিয়ে স্যুইট হওয়াতে কোনরকমে ভদ্রতা করে চললাম—নিতাইহরিবাবু এলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিতাম। তাতেও ঠিক নিষ্কৃতি ছিল না; মাঝে মাঝে তাঁর চাপা হাসি ও ইংগিতপূর্ণ উক্তি সার্সি ভেদ করেও ঐ ঘরে পৌছুত বলে স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন।

নিতাইহরিবাবুর স্ত্রী হয় অসূর্যম্পশ্যা, না হয় অসামাজিক। তাঁর মুখই ভাল করে দেখি নি, কথা বলা ত দূরের কথা। তিনি ঘরেই থাকতেন, ক্বচিৎ কখনো বিকেলের দিকে স্বামীর সংগে সামান্য সময়ের জন্যে বাইরে যেতেন, সে সময়েও যথাসম্ভব ঘোমটা টেনে। টাউনহলের পূজোমণ্ডপেও একদিন দেখেছিলাম ঐ একই রকম ঘোমটা-টানা মুখ। মনে হয়েছিল, ভদ্রমহিলা প্রথম বাইরে এসে নতুন পরিবেশের সংগে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন নি।

তবুও কিন্তু ওঁরা মুস্থরীতে থেকে গেলেন। নিতাইহরিবাবু জানালেন: পূজোটা এখানেই কাটাবেন ঠিক করেছেন। অন্তত একখানা পূজোও ত হয়—মায়ের মুখ দেখা যাবে। তিনি শুনেছেন, হরিদ্বারে পূজোই হয় না।

নিতাইহরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ আপনাদের ছড়ি-হাতে জনার্দনবাবু মুস্থরী এসেছেন কেন জানেন?

—কি করে জানব বলুন!—আমি নিস্পৃহভাবেই জবাব দিই।

—তা ত বটেই, কি করেই বা জানবেন,—নিতাইহরিবাবু স্বীকার করেন, তারপর বলেন, আমি কিন্তু বের করে ফেলেছি।

—আপনি বের করে ফেলেছেন! কি করে?

—জেরা করে।—নিতাইহরিবাবু জবাব দেন।

কৌতুহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেই ফেলি, কি জেরা করলেন?

অবস্থাটা যেন উপভোগ করে নিতাইহরিবাবু বলেন, শুনবেন? আচ্ছা তাহলে শুনুন।·· কাল ষষ্ঠীর দিন বিকেলে আমি প্রতিমা দর্শন করতে টাউন-হলে গেছলাম। গিয়ে দেখি জনার্দনবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছেন, একে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন, ওকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন। · ব্যাপারটা বুঝে ফেললুম—মাতব্বরী করবার জন্যে ভদ্দরলোকের মন ছোঁকছোঁক করছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম, কি জনার্দনবাবু! বারোয়ারী পূজোয় পাটটাট নিয়েছেন কখনো? শুনে মশাই, ভদ্দরলোক মহাখাপ্পা। বললেন, তার মানে? জানেন আমি পরপর আট বছর পাড়ার পূজো-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তা এবার আপনাদের পাড়ায় পূজো হচ্ছে না? ধড়িবাজ লোক মশাই! বললে, হবে না কেন? তবে এবছর বেড়াতে আসতে হল বলে আর প্রেসিডেণ্ট থাকতে পারলাম না। ঘুরিয়ে বলা, বুঝলেন না। প্রেসিডেণ্ট হতে পারল না বলেই বেড়াতে আসা!

রাত্রে টাউন-হলের পূজোমণ্ডপে জনার্দনবাবুর সক্রিয় ভূমিকা দেখে মনে হল নিতাইহরিবাবুর কথাই ঠিক—জনার্দনবাবু মুস্থরীর বারোয়ারী পূজোয় যেন নিজের হারানো সত্তা খুঁজে পেয়েছেন।

অষ্টমীর দিন রাত্রে একা বসে আছি—পুত্রকন্যাসহ স্ত্রী আরতি দেখতে গেছেন, এমন সময় ঢুকলেন নিতাইহরিবাবু। বোধহয় ওঁদের বাইরে যাওয়া লক্ষ্য করে থাকবেন। বললেন, ঘরে কেউ নেই ত ?

একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিলাম, না। কেন বলুন ত ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে নিতাইহরিবাবু বললেন, ইল্লিগ্যাল ব্যাপার মশাই।

কোথায় কার ইল্লিগ্যাল ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলাম। নিতাইহরিবাবুরও পেট ফুলছিল, তিনি দেরী না করে বলেই ফেললেন, ঐ যে জহর কুণ্ডু লোকটা একটা বিধবা মেয়েছেলে সংগে করে এনেছে, বলে পিসতুতো বোন না কে হয়—একদম বাজে কথা।

—আপনি জানলেন কি করে ?—একটু কড়া স্বরেই জিজ্ঞাসা করি।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে নিতাইহরিবাবু বলেন, কায়দা করে মশাই, কায়দা করে।

কায়দাটা কি, তা আর জিজ্ঞাসা করতে হল না, ভদ্রলোক নিজেই ব্যক্ত করলেন : মেয়েছেলেটি বেয়ারাকে একখানা চিঠি ছাড়তে দিয়েছিল—পোস্টোকার্ড। বেয়ারাটা যাচ্ছিল চড়াই ভেঙে রাস্তার ঐ ডাকবাক্সে ছাড়তে। তাকে বললাম, চিঠি ছাড়তে যাচ্ছ বুঝি ? তা দাও, আমাকেই দাও—আমিই ছেড়ে দেব, আমিও ত চিঠি ছাড়তে যাচ্ছি।...পোস্টোকার্ডখানা নিয়ে পকেটস্থ করলুম, বুঝলেন না। রাস্তায় উঠে পড়ে দেখি নাম কল্যাণী চ্যাটার্জি।

—তাতে কি হল ?—আমি বেশ অসহিষ্ণুভাবেই প্রশ্ন করলাম।

—নাও কথা, তাতে কি হল! আরে মশাই, চাটুজ্যের মেয়ে কি কুণ্ডুর বোন হতে পারে ?

—কেন পারে না ?—আমি আরও অসহিষ্ণুভাবে বলি, ভদ্রমহিলার কোন চ্যাটার্জির সংগে বিয়ে হয়ে থাকতে পারে—ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ ত আর ইল্লিগ্যাল নয়।

—তা না-হয় পারে,—নিতাইহরিবাবু যুক্তি মেনে নেন, কিন্তু মামাতো ভাই-এর সংগে একসংগে শোওয়া !

—সে খবর কোথায় পেলেন ?—এবার আমার স্বর আরও তীব্র।

নিতাইহরিবাবু কিন্তু মৃদুস্বরেই বলেন, ঘর ত একখানা, শোবে কোথায় ?

অকাট্য যুক্তিতে চুপ করে গেলাম। সত্যিই জহরবাবুদের ব্লকে একখানা করে ঘর—স্যুইট নয়।

এই নিতাইহরিবাবুই নিয়ে এলেন কাপুর ছেলেটি আর মিসেস ভাটের খবর। ব্যাপারটা আমাদেরও অনেকের নজরে পড়েছিল।

নিতাইহরিবাবুকে একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টাই করেছিলাম কিন্তু সফল হই নি। সন্ধ্যার পর ঠিক সময়ে তিনি ঘরের সামনে এসে 'আছেন নাকি?' বলে হাঁক দিতেন, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা ঠেলাঠেলি করতে শুরু করতেন। ফলে বাধ্য হয়েই দরজা খুলতে হত, এবং তিনি আমাকে একরকম ঠেলে দিয়েই ঘরে ঢুকে নির্দিষ্ট আসনখানা অধিকার করতেন।

সেদিন দরজা অর্ধেক খুলে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার! কোন কাজটাজ আছে নাকি?

নিতাইহরিবাবু জবাব দিলেন, না, কাজ আর কি! গল্প করতে এলুম।

মনের ভাব গোপন করে যথাসাধ্য মোলায়েম স্বরেই বললাম, আজ আমি একটু ব্যস্ত।...

—ও ব্যস্ত!—নিতাইহরিবাবু উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলেন,—আচ্ছা তবে থাক, কালই হবে।

কাল সন্ধ্যাবেলা অবধি ভদ্রলোক আর অপেক্ষা করতে পারেন নি বলেই মনে হল। সকালবেলা ১০টা নাগাদ বাজারের দিকে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি তাঁর ঘরের সামনে নিতাইহরিবাবু। আমাকে দেখে দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি?

—না, একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি।

—আমিও বাজার যাচ্ছি, চলুন একসংগে যাওয়া যাক।

নিতাইহরিবাবুকে এড়ানো গেল না।

হোটেলের বাইরে এসে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে নিতাইহরিবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, জায়গাটা ভালই লেগেছিল, কিন্তু আর থাকা গেল না।

—কেন, কি হল ?—জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

—কি আর হবে ?—একটু থেমে তারপর নিতাইহরিবাবু জলদ বলে গেলেন, একেবারে কনজুগ্যাল ব্যাপার মশাই।

—কনজুগ্যাল ব্যাপার! তার মানে ?—বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ, কনজুগ্যাল ব্যাপার,—নিতাইহরিবাবু দৃঢ়স্বরেই পুনরুক্তি করেন এবং তারপর ভাঙেন, বলছিলাম ঐ মেমসাহেব আর ঐ ছোঁড়াটার কথা। কেলেংকারীর একশেষ মশাই। আর ঐ আর্টিস্ট সাহেবটাই বা কি ?···

বুঝলাম, নিতাইহরিবাবু মিসেস ভাট ও কাপুর ছেলেটির কথাই বলছেন। ওঁদের কিছু কিছু ব্যাপার যখন আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছিলাম তখন নিতাইহরিবাবুর দৃষ্টি এড়াবে কি করে ?

তবুও বললাম, তাতে আপনার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে ?

—হচ্ছে না !--আমার অর্বাচীনের মত উক্তিতে নিতাইহরিবাবুর বিস্ময়ের সীমা নেই; কিছুক্ষণ তিনি কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অবশ্য আপত্তির কারণ প্রকাশ করলেন: এরকম বেহেল্লাপনার মধ্যে পরিবার নিয়ে কোন ভদ্রলোক বাস করতে পারে ?

সত্যিই মিসেস ভাট ও কাপুর ছেলেটির আচরণ বেশ একটু অশোভন। মিঃ ভাটের ব্যবহারও কতকটা অস্বাভাবিক—তিনি যেন সবকিছু দেখেও দেখেন না।

মিঃ ভাট গুজরাটের কোন আর্ট কলেজের অধ্যাপক। মিসেস ভাটকে দেখে মনে হয় পার্শী মহিলা। বয়সের দিক দিয়ে মিঃ ও মিসেস ভাট সম্পূর্ণ বেমানান। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কম নয়, আর ভদ্রমহিলাকে ত্রিশের বেশী মনে হয় না।

অধ্যাপক ভাট শুধু আর্ট কলেজের অধ্যাপকই নন, তাঁর প্রকৃতিটিও সম্পূর্ণ শিল্পীর। তিনি যেন এক অন্য জগতের লোক। সকালে ব্রেকফাস্ট করে তিনি কাঁধে একটা ব্যাগে ছবি আঁকার জিনিসপত্র এবং হাতে একটা ছোট ইজেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কোন দিন ফেরেন লাঞ্চের সময়, কোন দিন বা বিকেলের দিকে। যেদিন বিকেলে ফেরেন সেদিন প্যাকেটে করে তাঁর লাঞ্চ নিয়ে যান—একদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলেই বেয়ারার কাছ থেকে তাঁকে লাঞ্চ-প্যাকেট নিতে দেখেছি। মিসেস ভাটের সংগে অধ্যাপক মহাশয়কে কখনও বেরোতে দেখি নি।

ভাটরা থাকতেন দোতলায় আমাদের ছুটো স্যুইট পরে। সন্ধ্যার কিছু

আগে অধ্যাপক ভাট বারান্দাতেই একটা বিয়ারের বোতল নিয়ে বসতেন, আর যে ছবিখানা আঁকছেন সেটাকে বারান্দার এক কোণে ইজেলের ওপর খাটিয়ে তার দিকে বারবার তাকাতেন।

মিসেস ভাট রোজই বিকেলের দিকে বেড়াতে যেতেন কাপুর ছেলেটির সংগে। কাপুর থাকত জনার্দনবাবুদের ব্লকের একটা ঘরে। কাপুরের সংগে আমার আলাপ অধ্যাপক ভাটেরই মাধ্যমে। কাপুর বলেছিল, সে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. না এল-এল.বি. কি-একটা পরীক্ষা দিয়ে শ্রান্তি দূর করতে মুসুরী এসেছে।

কি করে ভাটদের সংগে কাপুরের আলাপ হল জানি না। কাপুর মিসেস ভাটেব চেয়ে বয়সে যে ছোট সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন তাঁরা বেড়াতে বেরোতেন তখন সাজসজ্জা ও প্রসাধনের গুণে মিসেস ভাটকেই বয়সে ছোট—অন্তত সমবয়সী মনে হত। মিসেস ভাট আবার রকমারি পোশাক পরতেন—কোন দিন ব্রিচেস, কোন দিন বা শালোয়ার-পাঞ্জাবী, কোন দিন বা শাড়ী, ইত্যাদি।

সকালে ওঁরা কোন দিন বেরুতেন না। ব্রেকফাস্টের পর কাপুর ও বয়নরত মিসেস ভাট বারান্দায় বসে গল্প করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক একদিন ভাটদের স্যুইটের বসবার ঘর থেকেও দু-জনের আলাপ কানে এসেছে।

সকাল সকাল বেড়িয়ে ফিরলে মিসেস ভাট কোন কোন দিন স্বামীর সংগে বারান্দায় বসতেন। তবে তা বেশীক্ষণ নয়। আর দেরী করে ফিরলে দেখেছি সোজাই ঘরে চলে যেতেন—বোধহয় পোশাক পরিবর্তন করতেই। এর কিছুক্ষণ পরেই কাপুর আসত। এক একদিন অধ্যাপক ভাটের একা বারান্দায় বসা অবস্থায় তাঁদের বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে কাপুর ও মিসেস ভাটের অনুচ্চ কণ্ঠে আলাপ এবং দু-একবার মৃদু হাসিব শব্দও কানে এসেছে।

ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু, অন্তত আমরা এতে অভ্যস্ত নই। হোটেলের বাঙালীরা এই নিয়ে বলাবলি করতে ছাড়ে নি। কিন্তু এর মধ্যে নিতাইহরিবাবু 'কনজুগ্যালের' কি সন্ধান পেলেন জানি না।

আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নিতাইহরিবাবু বললেন এর একটা বিহিত করুন। এ ত আর এলাউ করা যায় না।

--কি বিহিত করব, নিতাইহরিহাবু ?—আমি কতকটা তার্কিকের ভূমিকাই

নিলাম, এটা হোটেল। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সংগে কথাবার্তা বলতে দেয়—বেড়াতে এলাউ করে, তবে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে ?

রুষ্ট ভাব গোপন না করেই নিতাইহরিবাবু বললেন, শুধু কি কথাবার্তা বলা আর বেড়ানো ? সেই যা বল্লুম—একেবারে কনজুগ্যাল ব্যাপার। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—কি দেখেছেন ?—জেরার ভংগিতেই প্রশ্ন করলাম।

উত্তরে যা শুনলাম তা হল এই রকম : গতকাল বিকালে নিতাইহরিবাবু মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন—যাকে ওখানকার সাধারণ লোকে বলে কোম্পানী বাগ—দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে কাপুর ও মিসেস ভাট 'কনজুগ্যাল ভাবে' বসে—'হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ না-হলে সে-ভাবে বসা উচিত নয়'।

নিতাইহরিবাবু হোটেল থেকে ওঁদের অনুসরণ করেছিলেন কিনা, ঠিক বুঝলাম না। যা হোক শুনে বললাম, এতে আমাদের করণীয় কিছুই নেই—কোন্ ঝোপঝাড়ে কে কি করছে তার ওপর দৃষ্টি রাখার ভার আমাদের ওপর নেই।

শুনে নিতাইহরিবাবু ক্ষুণ্ণই হলেন, বললেন, তা হলে মুসুরী ছাড়তেই হল। ভেবেছিলাম লক্ষ্মীপূজো অবধি কাটিয়ে যাব।

একবার মনে হল বলি, অন্য হোটেলে যান না কেন, কিন্তু তা আর বলা হল না।

কথা বলতে বলতে আমরা ততক্ষণে বাজারের কাছে এসে গেছি। নিতাইহরিবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আমি আর যাব না। দেখি বিকেলেই মুসুরী ছাড়া যায় কিনা। পরের দিন সকালেও দেখলাম তিনি মুসুরী ছাড়েন নি।

বিকালে ল্যাণ্ডুর বাজারের এক দর্জির দোকান থেকে ফিরছি, দেখি একটু দূরে নিতাইহরিবাবু সেই মার্কামারা পোশাক পরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হোটেল থেকে বেরুচ্ছেন। উঁচুর দিকে চান নি বলে তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আমার সামনেই ছিল জন-চারেক তরুণ—রকবাজ ছোকরা বলেই মনে হল। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল :

—তোর যে দেখছি একেবারে ইটালীয়ান সেলুনের ছাঁট, মুসুরীতে ছাঁটলে কি হয় ?

—ইটালীয়ান সেলুন, মাইরি আর কি ! টু রুপিজ নিয়েছে জানিস।

—ইটালীয়ান সেলুনে টু রুপিজ ?—তৃতীয় জন বিস্ময় প্রকাশ করল, তা হাতে ইঁট দিয়ে নাড়ুগোপাল করেছিল নাকি ?

এর কোন প্রতিবাদ না করে ইটালীয়ান সেলুনের ছাঁটওয়ালা তরুণটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : আরে বাড়ুজ্যেবাবু যে রে ! পয়লা নম্বরের হারামী লোক মাইরি। দাঁড়া শালাকে ধরছি।

জোর পা চালিয়ে তরুণটি নিতাইহরিবাবুকে ধরল। নিতাইহরিবাবুর বিস্ময় কাটবার আগেই সে বলল, কি বড়দা, মুসুরী বেড়াতে এসেছেন ? ওরা যে বললে, আমাদের কচি বৌদিকে নিয়ে তিথ্যি করতে বেরিয়েছেন।

নিতাইহরিবাবুর চাপা ধমকানি শোনা গেল, চুপ কর, ফাজলামি কর না।

ছেলেটি ধমকানিকে কেয়ার না করেই বলে চলল, তা এখানেও কি বৌদিকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখেন ? রাখবেন না, পাড়ার চ্যাংড়ারা ত এখানে নেই। এসেছেন এই রকম হাই ক্লাস জায়গায়—একটু বাইরেটাইরে না-হয় যেতেই দিলেন। মেয়ের বয়সী ওয়াইফ—মায়াও হয় না আপনার ?

নিতাইহরিবাবু এবার গর্জনই করে ওঠেন, বলছি, চুপ কর।

ছেলেটিও এবার শাসায়, বেশী রোয়াবি নেবেন না বাড়ুজ্যেবাবু। হাটে হাঁড়ি ভাঙব—হোটেলে গিয়ে সবাইকে ব্যাপারটা জানিয়ে আসব।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই যেন নিতাইহরিবাবু মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেলেন, এবং কোনরকমে ঐ দলটাকে অতিক্রম করে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে জোর পা চালিয়ে দিলেন।

তাঁর পলায়ন উপভোগ করে সবাই টিটকারি দিয়ে হেসে উঠল, আর সেই ছেলেটি চেঁচিয়ে অপর সকলকে আশ্বাস দিল : পালাবে কোথায় বেটা ? ঠিক বের করে নেব কোন্ হোটেলে আছে।

কথাগুলো নিশ্চয়ই নিতাইহরিবাবুর কানে গেছলো।

পরের দিন সকালে দেখলাম, প্রথমে মাল মাথায় একজন কুলি, মধ্যে তাঁর অসূর্যম্পশ্যা স্ত্রী এবং পেছনে নিতাইহরিবাবু হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিতাইহরিবাবুর দৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণরত নয়। তাতে সুস্পষ্ট আতংকের ছায়া।

বৃহত্তোলনীয় প্রীতিইচ্ছা

কয়েক গজ দূরে, অবশ্য একটু নীচের দিকে, আরও আকর্ষণীয় দৃশ্য থাকলেও মংকি মিত্তিরের ওপরই প্রথম নজর পড়ল। তাঁর ছানাপোনা নিয়ে জল থেকে কয়েক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে হাওয়াই শার্ট ও কাবলি জুতো-পরা মংকি মিত্তির সিগারেট টানছেন। ছানাপোনারা অদূরে জলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুমানমতই দৃশ্য দেখতে গেলাম—মিত্রজায়া স্নানরতা, তবে কস্ট্যুম পরিধান করে নয়, সাধারণ শাড়ীকেই দেহাবরণ করে।

স্নান করার জন্যে এই জায়গাটাই নিরাপদ। মোটামুটি চার ধারে পাথরের স্বাভাবিক প্রাকারের দরুন ঢেউয়ের প্রাবল্য কম, আর লোকে বলে হাঙরের ভয়ও নেই।

তবুও ঢেউয়ের দাপটে মিত্রজায়া বেশ খানিকটা নাস্তানাবুদ হচ্ছিলেন। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর পরিধান সকল সময় যথাস্থানে থাকছিল না।

শাড়ী-পরা আরও মহিলা থাকলেও বাঙালী ধরনে শাড়ী-পরা ছিলেন একমাত্র মিত্রজায়া। আরও যে দু-তিন জন মহিলা একই সংগে স্নান করছিলেন তাঁরা কচ্ছ-সমন্বিত হওয়ার দরুন তাঁদের বিবসনা হওয়ার আশংকা ছিল কম। মিত্রজায়াকে তাঁদের দিকে একবার তাকাতে দেখলাম। মনে হল, ভাবলেন ঐ ভাবে শাড়ীটা পরে নেওয়া যায় কিনা। কিন্তু ঢেউ-এর মধ্যে, এত লোকের সামনে সেটা কি করে সম্ভব, তা চিন্তা করেই বোধহয় পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে ঢেউ-এর সংগে লাফিয়ে উঠলেন। বুঝলাম, ভদ্রমহিলার সমুদ্রস্নানের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। অবশ্য তাতে সবদিক রক্ষা পেল না। ঢেউ-এর সংগে বৃত্তাকার হয়ে তাঁর শাড়ী ও অন্তর্বাস ভেসে উঠেছিল, ঢেউ সরে যাবার পর বস্তুদ্বয়ও যথাস্থানের দিকে ফিরতে লাগল, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন ঠিক ততটা তাড়াতাড়ি নয়। ফলে যে-দৃশ্যটা রূপ গ্রহণ করল তা আকর্ষণীয় হলেও আমার কাছে ঠিক উপভোগ্য বলে মনে হয় নি—বাঙালী মহিলা বলে, না সংগে স্ত্রী থাকার দরুন ঠিক বুঝতে পারি নি।

আমরাও সমুদ্রস্নান করতে এসেছিলাম। কিন্তু ঐ সময়ে মিত্রজায়াকে দেখে জলে নামতে ইতস্তত করছিলাম। অর্ধাংগিনী ত স্পষ্টই বলেছিলেন, উনি জল ছেড়ে উঠুন, তারপর আমরা নামব।

মংকি মিত্তির নামটা আমারই মনগড়া। আগের দিন গান্ধীঘাটে সূর্যাস্ত দেখতে এসে পরিবারটিকে দেখে মনে পড়েছিল পরশুরামের কচিসংসদের সেই লাইনটার কথা: 'মংকি মিত্তিরের বউ তার তেরোটা এঁড়িগেঁড়ি ছানাপোনা নিয়ে ···।'

বর্তমান আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করলে সত্যিই দম্পতিটির সন্তানসংখ্যা যথেষ্ট বেশী—সংখ্যায় তের বা এক ডজন না হলেও তার দুই-তৃতীয়াংশের কম হবে না। তাও আবার বেশ থাকে থাকে সাজানো—চোদ্দ-পনের থেকে আরম্ভ করে একেবারে কচি বছরখানেক পর্যন্ত। দেখে আমার স্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, বাব্বা! এত নেণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে এতদূর আসার শখও আছে। উত্তর দিয়েছিলাম, কুঁজোরও কি চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে যায় না? অর্ধাংগিনী আর কিছু বলেন নি। আজ স্নানরতা মিত্রজায়াকে দেখে আবার মন্তব্য করলেন, ভদ্রমহিলার দেখছি শখের অন্ত নেই।

এবার আর আমি প্রতিবাদ করি নি, কারণ প্রতিবাদ করার কিছুই ছিল না।

শেষ পর্যন্ত মিত্রজায়া জল ছেড়ে উঠলেন। মংকি মিত্তির বাঁ হাতে কোলেরটিকে বুকে নিয়ে ডান হাতে সিগারেট টানতে টানতে একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ অর্ধাংগিনীকে উঠে আসতে দেখে সচেতন হয়ে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি ফেলে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরাও জলে নামলাম।

জল থেকে তাকিয়ে দেখি মিত্রজায়া সাড়ম্বরে বস্ত্র পরিবর্তন করছেন, আর মংকি মিত্তির কোলেরটিকে বয়স্কা কন্যাটির কাছে স্থানান্তরিত করে তাঁকে একরকম সাহায্য করবারই প্রচেষ্টা করছেন।

খানিক পরে আবার তাকিয়ে দেখি মিত্র-পরিবার ফিরে যাচ্ছেন। সে যেন এক শোভাযাত্রা। সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে মিত্রজায়া এক কন্যাসন্তানের হাত ধরে, মধ্যে অন্য সন্তানসন্ততিরা এবং শেষে কনিষ্ঠ সন্তানটিকে কোলে নিয়ে মিত্র

মহাশয় স্বয়ং। এবার আর তাঁর মুখে সিগারেট নেই। স্নানরতা সহধর্মিণীর দিকে তাকিয়ে বলেই ফেললাম, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।

সহধর্মিণী একবার অপস্রিয়মান মিত্র-পরিবারের দিকে, তারপর আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, নিশ্চয়। তবে প্রসেশানটা একটু ছোট, এই যা!

বিকালে আবার কন্যাকুমারীর মন্দিরের কাছে মিত্র-পরিবারের দেখা পেলাম। দেখি একটা দোকানের সামনে ব্যাটালিয়ান-সহ কনিষ্ঠ সন্তানটিকে কোলে নিয়ে মংকি মিত্তির দাঁড়িয়ে। মিত্রজায়া অবশ্য দলে নেই। বুঝলাম তিনি কোন দোকানে ঢুকেছেন। অনুসন্ধানরত দৃষ্টি সহজেই তাঁকে খুঁজে বের করল—তিনি একটা মাদুরের দোকানে ঢুকে মাদুর বাছাই করছেন।

আমরা আসছিলাম তাদের পেছন দিক থেকে। দেখি মিত্রমশায় একবার মাদুরের দোকানের দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন এবং তা থেকে সিগারেটের পরিবর্তে একটা বিড়ি বের করে বোধহয় দেশলাই-এরই সন্ধান করতে, বুকে-ধরা কনিষ্ঠটিকে ডান হাতে জড়িয়ে বাঁ ধারের প্যাণ্টের পকেটে হাত দিলেন। ঠিক এই সময়েই মিত্রজায়া ঘুরে রাস্তার দিকে মুখ ফেরালেন। মংকি মিত্তিরের মুখ থেকে বিড়িটা খসে রাস্তায় পড়ল, আর মিত্রজায়া জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সেই পতিত বিড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন।

তাদের অতিক্রম করে পর্যাপ্ত পথ এসে আমার গৃহিণী শুধুমাত্র একটি শব্দের সাহায্যে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করলেন: বেচারা।

রাত্রে কন্যাকুমারীর মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়ে দেখি তাঁর ছানাপোনাদের পেছনে রেখে যুক্তকর প্রার্থনার ভংগিতে দাঁড়িয়ে আছেন মংকি মিত্তির। অদূরে মহিলাদের দলে মিত্রজায়াও অনুরূপ ভংগিতে। সংখ্যায় একটু বেশী হলেও ছেলেমেয়েগুলো সম্পূর্ণ নিয়মানুবর্তী—তারা স্থির হয়েই আছে, এমনকি জ্যেষ্ঠা কন্যার কোলে কনিষ্ঠ সন্তানটিও গোলমাল করছে না।

হ্যাঁ, মিত্তির প্রার্থনাই করছিলেন, তা তাঁর ওষ্ঠের মৃদু কম্পন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু অল্প দূরে থাকলেও আরতির বাদ্যের জন্য কোন শব্দ বিশেষ কানে আসছিল না। মিত্রজায়ার দিকে তাকিয়ে দেখি যে তাঁর ওষ্ঠও সামান্য আন্দোলিত হচ্ছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে গৃহিণী আবার মন্তব্য করলেন, ভদ্রমহিলার ভক্তির পরিমাণ একটু বেশীই মনে হচ্ছে। আর ভদ্রলোকই বা কি—মেয়েদেরও অধম !

মিত্র-পরিবারের সংগে কন্যাকুমারীতে আর দেখা হয় নি, হয়েছিল তিরুচুরা-পল্লীর শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে।

মন্দিরে ঢুকেছিলাম দুপুরবেলা, তাই বিশেষ ভিড ছিল না। দরজার কাছে দেখি সেই ব্যাটালিয়ন দাঁড়িয়ে এবং কনিষ্ঠটি জ্যেষ্ঠা কন্যার অংকে। মিত্তির বা মিত্রজায়ার কোন পাত্তা নেই।

মণ্ডপের মধ্যে ঢুকেই একটা দৃশ্য চোখে পডল—একটু দূরে ফাঁকা চত্বরে কে একজন সাষ্টাংগ প্রণিপাত করছে, তারকেশ্বরের পথে যেভাবে দণ্ডি কাটে, ঠিক সেইভাবে। পরনে তার আধুনিক সাহেবী পোশাক—অর্থাৎ প্যাণ্ট ও হাওয়াই শার্ট।

প্রথমে ভদ্রলোককে কোন ভক্তিমান দক্ষিণ ভারতীয় বলেই ভেবেছিলাম, কারণ সাহেবী পোশাক পরে ঐভাবে সাষ্টাংগে দণ্ডবৎ হওয়া তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক। একটু পরেই অবশ্য বুঝতে পারলাম প্রণিপাতকারী আর কেউ নয়, আমাদেরই মংকি মিত্তির।

আমরা এগিয়ে গেলেও মিত্তির মশাইয়ের তুরীয় ভাবের কোন বিচ্যুতি ঘটল না—তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহীন। কি কারণে জানি না, আমি ঠিক তাঁর পাশেই দাঁড়ালাম, আর গৃহিণী এগিয়ে গেলেন বেদীর দিকে দরজা পর্যন্ত। সেখানেও কয়েক জন মহিলার মধ্যে একজন নতজানু হয়ে। চিনলাম তিনি মিত্রজায়া।

একটু পরেই মিত্তির সাষ্টাংগ প্রণিপাত ছেড়ে তাঁর অর্ধাংগিনীর মত নতজানু হয়ে বসে বেশ জোরে জোরেই প্রার্থনা শুরু করলেন—পাশে যে তাঁর ভাষাভাষী কোন কেউ থাকতে পারে সে-সম্বন্ধে খেয়ালই নেই। কোন বাদ্যের শব্দ না থাকায় তাঁর প্রার্থনার অধিকাংশই কানে আসতে লাগল।

মংকি মিত্তিরের প্রার্থনা শুনে অবাক হয়ে গেলাম, দেবদর্শন ভুলে গিয়ে সেই দিকেই কান খাড়া করে রইলাম।

মিত্র বলে চলেছেন : হে বিষ্ণু, হে ভগবান ! আমি আর কিছু চাই না…

আমি থাকতে থাকতে ও যেন মরে, নইলে ওকে দেখবে কে! সারা জীবনে ত সুখের মুখ দেখতে পেল না…হে ভগবান, ওই যেন আগে মরে।…

হঠাৎ একজন পাণ্ডা ইংরেজীতে শ্রীরঙ্গমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে একদল যাত্রী নিয়ে ঢোকায় মিত্তিরের সরব প্রার্থনায় ছেদ পড়ল। একবার মুখ তুলে সেদিকে তাকাতে গিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন। সংগে সংগে দাঁড়িয়ে পড়ে জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে মিত্তির বেরিয়ে গেলেন। আমিও দূর থেকে কোনরকমে দেবদর্শন সমাপ্ত করে বাইরে এলাম।

তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে মিত্তিরকে ধরলাম। যেন কিছুই দেখি নি বা শুনি নি এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, আরে আপনারা! কবে এলেন?

মিত্তির নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন, তবুও পাশ কাটাবার চেষ্টায় বললেন, আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারছি না!

—সেই যে কেপ কমোরীনে,—বলার সংগে সংগে মিত্তির স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল!

সেই আগের ভাবই অবলম্বন করে জিজ্ঞাসা করলাম, মিসেস কোথায়? দেখছি না যে।

মিত্তির উত্তর দিলেন, মন্দিরের ভেতরে। তারপর আমারও একাকিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উক্তি করলেন, আপনিও দেখছি একা। তা মিসেস?

—উনিও মন্দিরের ভেতরে,—বলে একটু থেমে আবার শুরু করলাম, হিন্দু মেয়েদের দোষই ঐ। একবার কোন মন্দিরে ঢুকলে……

শেষ করতে পারলাম না মিত্তিরের প্রতিবাদে: তা দোষ বলছেন কেন? ধর্মকর্ম কি দোষের?

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, না দোষ ঠিক বলা যায় না। হিন্দু মেয়েদের বৈশিষ্ট্যই এই। তাঁরা শুধু গৃহলক্ষ্মীই নন, আমাদের ধর্মকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

পাশ ফিরে একবার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মিত্তির বললেন, ঠিক বলেছেন কিন্তু। কিন্তু ক-জন পুরুষ একথা স্বীকার করে? আমাদের মেয়েদের তুলনাই হয় না।

হয়ত সমর্থনই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মিত্তিরের উচ্ছ্বাসে তাতে বাধা পড়ল :

কি পায় তারা ? সারা জীবন হাঁড়ি ঠেলতে আর ছেলে মানুষ করতেই কেটে যায়—রবিবার নেই, ছুটি নেই, ক্যাজুয়াল লীভ নেই, এমনকি সিক হলেও নিস্তার নেই—তারপর হঠাৎ যেন ভাষা খুঁজে না পেয়ে সমর্থনের আশায় মিত্তির প্রশ্নই করে ফেললেন, কি বলেন ?

—অতি খাঁটি কথা, বলে আমিও অকুণ্ঠ সমর্থন জানালাম।

উৎসাহিত হয়ে মিত্তির বলে চললেন, আমার কথাই ধরুন না। রেলে চাকরি করি বলেই না একটু বেড়াতে নিয়ে আসতে পারি।······

মিত্তির নিশ্চয় আরও বলতেন, আমিই থামিয়ে দিলাম উভয়ের গৃহিণীব নিষ্ক্রমণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওঁরা দু-জনে এক সংগেই বেরিয়ে আসছিলেন কথা বলতে বলতে।

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে উঠেছি। ট্যাক্সি ছেড়েছে কি না-ছেড়েছে এমন সময় অর্ধাংগিনী সম্পূর্ণ ভূমিকাবিহীন উক্তিই করলেন : যা ভেবেছিলাম তা মোটেই নয়। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে সত্যিই ভালবাসেন।—তাবপর একটু থেমে আবার মন্তব্য করলেন, স্বার্থহীন নিঃখাদ ভালবাসা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে বুঝলে ?

অর্ধাংগিনী ব্যাখ্যা করলেন : ভদ্রমহিলাব পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা হাঁটুর ওপর বসে বিড়বিড় করে বলছিলেন শুনলাম—ঠাকুর আমাকে রেখে ও যেন মরতে পারে। নইলে ওকে দেখবে কে ? ঠাকুর তাই যেন হয়। ঐ রকম স্বামী রেখে মরেও আমি শান্তি পাব না এই রকম নানা কথা বারবারই বলছিলেন।

তখন আমি মিত্তির সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। শুনে অর্ধাংগিনী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ওঁরা দু-জনেই পরস্পরকে সত্যিই ভালবাসেন। এরকম না-হলে স্বামী-স্ত্রী !

এখনও মাঝে মাঝে যখন মিত্র-দম্পতির কথা মনে হয়, তখন ভাবি : সুখ বলতে কি বোঝায়, আর কর্তব্যেরই বা সংজ্ঞা কি ? রেলের পাশে তাঁদের এঁড়িগেঁড়ি নিয়ে ঐ যে দম্পতিটি বেড়াতে বেরোন, আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত

ঐ যে মিত্তিরমশায় কনিষ্ঠ সন্তানটিকে কোলে নিয়ে স্ত্রীর পেছনে পেছনে চলেন, স্ত্রী সমুদ্রস্নানে নামলে বা দোকানে ঢুকলে ব্যাটালিয়ন সামলে রাখেন— এসব ত নিছক ভয় বা শুষ্ক কর্তব্যের প্রেরণায় নয়। এতেই ত তাঁর সুখ। নিজে দেখি নি তবে অনুমান করা কঠিন নয় যে মিত্রজায়াও স্বামীকে অনুরূপ সেবা করে নিজের সুখের ভাণ্ডার ভরিয়ে তোলেন। ভদ্রমহিলাকে পরশুরাম-কল্পিত মংকি মিত্তিরের বউ বলে কোনমতেই ভাবা যায় না।

এইসব যখনই ভাবি তখন স্বামী বিবেকানন্দের একটা বাণী অবশ্যম্ভাবীরূপে মনে পড়ে: It is only when love greases duty's wheels that it runs smoothly.

তীর্থদর্শন

—স্থানমাহাত্ম্য মশাই, স্থানমাহাত্ম্য! পড়েন নিজেই কাশীরাম দাসের মহাভারতে :

"জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
সে কারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম॥"

পার্শ্বে দণ্ডায়মান বন্ধু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, মহাভারতে রামের ব্যাপার? রামায়ণেই ত থাকবার কথা!

শুনে ভজহরিবাবু চটে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ মশাই, মহাভারতেই আছে, পড়ে দেখবেন।

অবস্থাটা সামলে নিয়ে বন্ধু বললেন, সরি। আমার ঠিক জানা ছিল না। রামায়ণ-মহাভারত আর পড়লাম কোথায়।

ভজহরিবাবুও সন্তুষ্ট হয়ে আবার শুরু করলেন : সেই যে বলছিলাম, কাশীধামের পরই এই রামেশ্বরধাম। দু-জায়গাতেই বাবা বিশ্বনাথ বাস করেন। অবিশ্যি কৈলাসেই বেশির ভাগ সময় থাকেন, তবে কৈলাসের পথ শুনেছি দুর্গম।...হ্যাঁ, রামেশ্বরধামে এসে প্রথমেই পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে হয় জানেন ত?

স্বীকার করলাম, না, তা ত জানি না।

—জানেন না?—ভজহরিবাবু আঁতকে উঠলেন, বলেন কি? যাক যা হবার হয়ে গেছে। অজান্তে পাপ নেই। তবে কাল প্রথমেই তর্পণ করে তারপর অন্য সব।...

'অন্য সব' বলতে ভদ্রলোক বোধহয় আহারাদির কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, কারণ রামেশ্বরের অন্যতম প্রধান ভোজনালয় মীণাক্ষী লজের একই টেবিলে বসে আলাপ হচ্ছিল।

ভজহরিবাবুর নির্দেশ শুনে বন্ধু বললেন, তা আর বোধহয় সম্ভব হবে না, কারণ আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমাদের মাদুরাই যাবার কথা আছে।

—আজই রাত্তিরের গাড়ীতে? তর্পণ না করে?—ভজহরিবাবু যেন পুরো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

আমি বললাম, হাঁ, ভাবছি আজ রাত্রের গাড়ীতেই। এখানে আর দেখবার কি আছে।

—দেখবার কি আছে!—মর্মাহত ভজহরিবাবুর মুখ থেকে প্রতিধ্বনি বেরুল, তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, লোকে কি সীনসিনারি দেখতে রামেশ্বরধামে আসে? তাহলে ত দিল্লী-লাহোর গেলেই হয়!

আর কিছু বলার ছিল না, দু-জনেই চুপ করে গেলাম।

দুই বন্ধুতে যখন মীনাক্ষী ভোজনালয়ে ঢুকেছিলাম তখন আহারার্থীর খুব ভিড়—অধিকাংশ যাত্রীই মন্দির থেকে ফিরতে আরম্ভ করেছে। একটা কোণে একটা টেবিল খালি পেয়ে দখল করে দুই বন্ধুতে বসেছিলাম, আর দুখানা চেয়ার খালি ছিল।

সবে আহার শুরু করেছি এমন সময় একজন বৃদ্ধ এসে হাজির। এক নজরেই বুঝলাম বাঙালী।

আমরাও যে বাঙালী তা তিনিও বুঝেছিলেন। কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, জায়গা-দুটো রাখবেন? একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করে আসি, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন, না ভেতরে এসে বসবেন।

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে দু-জনেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বৃদ্ধ ব্যাখ্যা করলেন, আমার পরিবারের কথাই বলছি, ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেকেলে লোক মশাই, দোকানে বসে খেতে চান না। যাই, তবু একবার জিজ্ঞেস করে আসি। বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্তত ভেতরে এসে বসুন, না-হয় নাই খেলেন।

ভদ্রলোক একলাই ফিরে এলেন। বললেন, না এলেন না। রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। যাকগে আমি আর কি করব!

আহার করতে করতে ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষমানা স্ত্রীর কথা ভুলেই গেলেন। অবশ্য পুরীতে প্রথম কামড় দিয়ে একবার বলেছিলেন, না পুরী ভালই করে। যাবার সময় নিয়ে যেতে হবে, ধর্মশালাতেই বসে খাবেন।

ভদ্রলোকই প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মশাইদের নাম? নামধাম জানার পর তিনি নিজেই বললেন, অধীনের নাম ভজহরি নন্দী, নিবাস খড়দহ। পরিবারকে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছি। আপনারাও নিশ্চয় তাই।

দেখলাম, ভদ্রলোকের নাম ভজহরি হলেও তিনি মাত্র হরির ভজনা করেন না—সকল দেবদেবীতেই তাঁর সমান ভক্তি। তবে তীর্থদর্শন ব্যাপারে তিনি বাছাই করে বলেন—দেখেন কোন্ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য বেশী, কোন্ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কম।

ভজহরিবাবু বলছিলেন, মশাই, দেশে বন্ধুবান্ধব বলে দিয়েছিল তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর শিবকে দেখে আসতে। গেলুম দেখতে। গিয়ে দেখি একদম ফাঁকা। মন্দিরটা অবিশ্যি পেল্লায়, কিন্তু হলে কি হয়। স্থানমাহাত্ম্য নেই – লোকে আসবে কেন? আর এই রামেশ্বরধাম দেখুন। কোথা থেকে না লোক এসেছে! স্থানমাহাত্ম্য মশাই, স্থানমাহাত্ম্য! পড়েন নি সেই কাশীরাম দাসের মহাভারতে··· ?

কলকাতায় ফেরার পথে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে ঢোকার মুখে ভজহরিবাবুর সংগে আবার দেখা। তিনি পথেই দাঁড়িয়ে টাইম্‌টেবল্ পাঠ করছিলেন। ভেবেছিলাম ভদ্রলোকরাও ঐ দিন ফিরছেন। জিজ্ঞাসা করলাম. কি ভজহরিবাবু, চিনতে পারেন?

না, চিনতে তাঁর দেরী হয় নি। জিজ্ঞাসা করামাত্রই বললেন, মনে পড়েছে, সেই যে রামেশ্বরধামে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম, আজই ফিরছেন নাকি?

যেন কোন গর্হিত প্রশ্ন করেছি এমন ভাব দেখিয়ে ভজহরিবাবু বললেন, আজই ফিরব কি মশাই! আসল তীর্থই দর্শন করা হয় নি, স্টেশনে এসেছিলুম তারই খোঁজখবর নিতে।

—আসল তীর্থ!—অবাক না হয়ে পারলাম না, কারণ তাঁর মুখেই ত শুনেছি যে রামেশ্বরধামের স্থান কাশীধামের পরই।

বন্ধু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ তীর্থের কথা বলছেন?

—কেন পক্ষীতীর্থ। জায়গাটার তিরুক্কাল্ না কি এক নাম।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে ওঠার সংগেই বন্ধুর পরবর্তী প্রশ্ন কানে এল: তাহলে পক্ষীতীর্থই হল আসল তীর্থ?

—তা ছাড়া আর কি!—ভজহরিবাবু সংক্ষেপেই উত্তর দিলেন, যেন কোন কিছু স্বতঃসিদ্ধ উক্তি করছেন।

বন্ধু তবুও তর্ক করতে ছাড়লেন না: কেন, আপনিই ত বলেছিলেন স্থানমাহাত্ম্যে রামেশ্বরধাম?

—আরে মশাই,—অসহিষ্ণুভাবে বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে ভজহরিবাবু বললেন, স্থানমাহাত্ম্য থাকলেই হল? দেবতাও জাগ্রত হওয়া চাই, বুঝলেন।

বুঝে আমরা চুপ করে থাকলেও ভজহরিবাবু বলে চললেন, রামেশ্বরধামের শিব মানুষকে আর দেখা দেন না। পক্ষীতীর্থে কিন্তু দেবতারা পক্ষীরূপ ধারণ করে আসেন মানুষের হাত থেকে নৈবিদ্যি খেতে।··

আমাদের মালপত্র নিয়ে দণ্ডায়মান কুলি তার মাতৃভাষায় অসন্তোষ প্রকাশ করাতে 'তা ত বটেই' বলে ভজহরিবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রচেষ্টা করলাম। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই ভজহরিবাবু তাঁর বক্তব্য চালিয়ে গেলেন: পক্ষিরূপী দেবতা দু-জন রোজ রোজ কোথা থেকে আসেন আর কোথায় যান জানেন? আসেন কাশীধাম থেকে আর যান রামেশ্বরধামে। স্থানমাহাত্ম্য যাবে কোথায়!

কোন মন্তব্য না করে 'আচ্ছা, এখন আসি' বলে পা বাড়ালেও ভজহরিবাবুর বক্তব্য শেষ হল না। শুনতে পেলাম তিনি বলে চলেছেন, শুনেছি এক দেবতা আর আসেন না, একজনই আসেন·· কোন ত্রুটি হয়েছিল নিশ্চয়।···

আর কিছু শুনতে পেলাম না। বোধহয় আমরা দূরে চলে গেছি লক্ষ্য করে ভজহরিবাবুই থেমে গিয়েছিলেন।

—শেষ—